ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ
এবার ঘরে ফেরার পালা
ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

লেখক পরিচিতি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা লয়ের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগের কৃতী অধ্যাপক এবং কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। পদার্থবিদ্যার গবেষক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিশেষ করে হিন্দু শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির দর্শন, হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

★ পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা—৩৫.০০

★ ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা—৫.০০

★ কল্যব্দ ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক হিন্দু কালগণনা—১৫.০০

★ মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি—৪৫.০০

★ মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা—২৫.০০

★ এক নজরে ইসলাম—২৫.০০

★ ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত—২.০০

★ স্কুলে যৌনশিক্ষা ঃ একটি গভীর চক্রান্ত—৬.০০

★ **Three Decrees of Islam**—১০.০০, ইসলামকে তিন সিদ্ধান্ত (হি) —১৫.০০

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব

এবার ঘরে ফেরার পালা

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সেভ ইন্ডিয়া মিশন

বি ই-৩০০, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

প্রাপ্তিস্থান

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ISLAMI DHARMATTVA : EBAR GHARE FERAR PALA
A BOOK OF CRITICISM, Written by Dr. Radheshyam Brahmachari
Price Rupees : One hundred only

প্রকাশক ঃ শ্রী অমিতাভ ঘোষ
সেভ ইন্ডিয়া মিশন, বি ই-৩০০, সল্টলেক,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪
দূরভাষ ঃ ২৩৩৭ ১৯০৭

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : কলকাতা বই মেলা, ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ ১৪১৩ (১৫ এপ্রিল, ২০০৭)
চতুর্থ মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ, ১৪১৫ (এপ্রিল ১৪, ২০০৮)

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

বর্ণ সংস্থাপনে : সুবোধ প্রেস
৬, ডালিমতলা লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মুদ্রণে : ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স
১১এ, গড়পার রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর চরণে
এই গ্রন্থ নিবেদিত হল :

—গ্রন্থকার

যবনরাজার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা :

তবে ওড্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা।।
দিন দুই চার তেঁহো করিলা সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ।।
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার।।
সেইকালে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর।।
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন পাশ গিয়া।।
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে।।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।।
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি।।
এতশুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল।।
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল।।

বিশ্বাস যাঞা তাহারে সকল কহিল।
হিন্দু বেশ ধরি সেই যবন আইল।।
দূর হইতে প্রভু দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হঞা।।
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় হরিনাম।।
অধম যবনকুলে কেন জন্ম হইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল।।
হিন্দু হইলে পাইতাম প্রভুর চরণ সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরান।।
গো-ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করিয়াছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার।।
তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি।।
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

ঐতিহাসিকের অভিমত

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানেরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তির অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, অস্ট্রেলিয়ার "মাওরী জাতি" এবং আমেরিকার "রেড ইণ্ডিয়ান" অর্থাৎ আদিম অধিবাসীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকরা তাহাদের দেশেই বাস করিত।

মুসলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই; ইহারা জিম্মী অর্থাৎ আশ্রিতের ন্যায় জীবন যাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে।...... (১) হিন্দুদিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথাপিছু কর দিতে হইবে—ইহার নাম জিজিয়া। (২) হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তির জন্য কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। কার্যত ইহার ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাও পুণ্যের কাজ। (৩) যদি কোন অ-মুসলমান ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয় তবে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন মুসলমানকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করে তবে তাহা হইলে যে কোন মুসলমান ঐ দুইজনকে স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে।....ইসলামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাখিতে পারিত না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানেরা হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া বহু হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি কার্য সকল সময়ে হিন্দুর প্রতি প্রীতি বা সহৃদয়তার প্রতীক নহে। কারণ যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সুলতান এই সমুদয় কার্যের জন্য প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন—জলালুদ্দিন, বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রভৃতি —তাহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্য প্রকারে হিন্দুদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খান এবং আলিবর্দীও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ... বাংলার সুলতানী আমলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা মসজিদ তৈরি করা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খাঁ গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকে মুর্শীদকুলী খাঁ হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরি করিয়াছিলেন। এইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে। ..... ঔরঙজেবের সময় ইহা চরমে ওঠে।

যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানা মতে করে অনাচার।
বামন পণ্ডিত পায় থুতু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে খোঁটা মোছে আর।।

দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন, মুসলমান রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুকী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ কত হিন্দু রমণীকে যে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার অবধি নাই।

সুলতান হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমানকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কালেই নবদ্বীপে উল্লিখিত কাজীর অত্যাচার হইয়াছিল।

যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজী বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয়া মুখে।।
হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।।

...... যশোরাজ খান নামক কবি তাহাকে 'জগৎ ভূষণ' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহাকে ''কলিযগের কৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবির দীর্ঘ দাসত্বজনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত।

নবাব মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় নাকি তাহাকে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করানো হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিহ্নস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি ঐ দেবীর মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুর্শীদকুলী খান উহার নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আর ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীচৈতন্যদেব দীক্ষার পরে চব্বিশ বৎসর (১৫১০-৩৩ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন — ইহার মধ্যে সর্বসাকুল্যে পুরা একটি বছরও তিনি হোসেন শাহী রাজ্য অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাঁহার পরম ভক্ত ও হোসেন শাহের পরম শত্রু উড়িষ্যার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রণীত বাংলাদেশের ইতিহাস
(২য় খণ্ড) ১৩শ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

"The murder of infidels (Kafir-kushi) is counted a merit in a Muslim. It is not necessary that he should tame his own passions or mortify his flesh, it is not necessary for him to grow a rich growth of spirituality. He has only to slay a certain class of is fellow beings or plunder their lands and wealth and this act in itself would raise his soul to heaven. A religion whose followers are taught to regard robbery and murder as religious duty, is incompatible with the progress of mankind or with the peace of the world."

Sir Jadu Nath Sarkar, History of Anrangzib, Vol. III

লেখকের কথা

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং গ্রামে আমার জন্ম যার নাম আজ শরীয়তপুর হয়েছে। হিন্দু হবার অপরাধে দেশ বিভাগের সময় বাস্তুচ্যুত হয়েছি এবং বর্তমানে কোলকাতার বাসিন্দা হয়েছি। আজ যদি পদ্মা সংলগ্ন সেই জন্মস্থানে যেতে হয় তবে পাসপোর্ট -ভিসা করতে হবে এবং এটা যে কতখানি মর্মবেদনার কারণ তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। ছোটবেলায় মা, ঠাকুমা ও জেঠিমার মুখে হিন্দু-নির্যাতন ও হিন্দু-বিতাড়নের অনেক গল্প শুনেছি এবং দেশ থেকে বিতাড়নের সেই সব কাহিনী শুনে শিশুমন তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। সেই সময় পরিবারের সকলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আমাকে সঙ্গে নেওয়া হবে এবং ছয়মাসের শিশু আমার ছোট বোনকে ফেলেই পালানো হবে। কারণ রাতের অন্ধকারে বনে জঙ্গলেই আশ্রয় নিতে হবে এবং সে যদি তখন কান্নাকাটি শুরু করে তবে সবাইকেই মরতে হবে। কোন্ ভয়ঙ্কর ত্রাসের পরিস্থিতিতে মানুষ এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় তা পাঠকের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

তাই যখন শুনি যে, সেই ত্রাসের রাজত্ব বাংলাদেশে আজও কায়েম আছে, আজও সেইখানে আওয়াজ তোলা হয়—"একটা দুইটা হিন্দু ধর, সকাল-বিকাল নাস্তা কর"। যখন দেখি সেই বিতাড়ন আজও সমানে চলছে এবং সেইসব বিতাড়িত হতভাগ্য মানুষেরা এদেশে এসে কোনমতে দিন গুজরান করছেন, তখন হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে, কি সেই ধর্মমত, যার দ্বারা চালিত হয়ে একদল বাঙালী তাদের ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে ও দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করছে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে ইসলাম বিষয়ক বইপত্র ঘাঁটতে শুরু করি এবং তার ফলে যেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি তাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

অনেক উদারপন্থী হিন্দু যাঁরা সচরাচর এই মন্তব্য প্রকাশ করে থাকেন যে, সব ধর্মই এক এবং সব ধর্মগ্রন্থেই ভাল ভাল জ্ঞানের কথা, প্রেম, মৈত্রী, দয়া, মায়া, ক্ষমা ও ভালবাসার কথা লেখা আছে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সেই সব ব্যক্তি ইসলামের অ, আ, ক, খ-ও জানেন না এবং কিছু না জেনেই উপরিউক্ত মন্তব্য করে থাকেন। যে ধর্মের ঈশ্বর বলেন যে, যারা মুসলমান নয় তাদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওৎ পেতে থাকবে (৯/৫),..... তাদের গ্রেপ্তার কর, যেখানে পাও হত্যা কর এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না (৪/৮৯), ... তাদের সাথে

অবিরাম যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লার রাজত্ব কায়েম হয় (৮/৩৯),....তাদের গর্দানে আঘাত কর (৪৭/৪), তাদের হাত-পা কেটে ফেল, শূলবিদ্ধ কর ও হত্যা কর (৫/৩৩) ইত্যাদি, সে ঈশ্বর পরম করুণাময় ঈশ্বর কি না সুধীজনেরা তার বিচার করবেন। এবং যে গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই এরকম কথা ছড়ানো রয়েছে, সেই গ্রন্থ মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর ধর্মগ্রন্থ কি না তাও সুধী জনেরা বিচার করবেন। সর্বোপরি, যে ধর্মের প্রচারক স্বয়ং, শত শত নিরস্ত্র মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে গেছেন, নির্বিচারে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে গেছেন, আমাদের দেশবাসী কিছু মানুষ যতদিন সেই ধর্ম ও সেই ধর্ম-প্রচারককে অনুসরণ করতে থাকবেন ততদিন তাদের সঙ্গে সত্যকার ভ্রাতৃভাব ও মৈত্রী গড়ে ওঠা সম্ভব কি না সেটাও সুধীজনের বিচার্য। লেখক হিসাবে আমার দায়িত্ব পাঠককে সেই ধর্মমতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তা যদি করতে পেরে থাকি তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

অনেক যুক্তিবাদী হিন্দু আবার এই সূক্ষ্ম যুক্তি উপস্থিত করেন যে, ইসলাম পুণ্যাত্মাদের জন্য অনন্ত স্বর্গবাস ও পাপীদের জন্য অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা করে ঠিক কাজ করেনি। কারণ পুণ্যাত্মারও কিছু পাপ করে এবং তাই তাদের কিছুকাল নরকবাস হওয়া উচিত। তেমনি পাপীরাও কিছু কিছু পুণ্যের কাজ করে, তাই তাদেরও কিছুকাল স্বর্গবাস হওয়া উচিত। এই সব ব্যক্তি একটি গোড়ায় গলদ করে ফেলেন। তাঁরা ইসলামকে আধ্যাত্মিকতার পথ নিদর্শনকারী একটি ধর্মমত বলে ভুল করে বসেন। ইসলাম কোন ধর্মমত নয়। ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদের উদ্দেশ্য হল, ইহলোকে গনিমতের মাল ও পরনারী সম্ভোগ এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের লোভ দেখিয়ে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তারপর নির্বিচারে আক্রমণ, হত্যা ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা। মহানবীর জীবিতকালে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং নবীর মৃত্যুর পর তা পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করার লক্ষ্যে পরিণত হয়। আজকের ইসলামী উম্মা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিগত ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখের টাইম (Time) পত্রিকায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী জনাব আব্দুল কাদের খান মহাশয়ের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সম্বন্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ বলেন, " I look at a Pakistani as the flesh of our flesh and the blood of our blood. We are two different nations, but one people."। প্রায় একই প্রশ্নের জবাবে জনাব আব্দুল কাদের বলেন, "There are some similarities, but we are basically different poeple. We are Muslims, they are Hindus. We eat cows. They worship cows. That we lived on the same land and spoke the same language does not make us the same people." উপরিউক্ত দুই মন্তব্যের

মধ্যেকার প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমোক্ত মন্তব্য ঐক্য বন্ধনে বাঁধার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু দ্বিতীয় মন্তব্য ঐক্য বন্ধনের সমস্ত সূত্রকে ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন হবার কাজে উৎসাহ যোগায়। এটাই ভীতিকর মুসলীম মানসিকতা। এই মানসিকতাকে লক্ষ্য করেই V. S. Naipaul তাঁর Beyond Belief গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইসলাম ধর্মান্তরিত মুসলমানদের তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ করে তোলে এবং এর ফলে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা অভাবনীয়।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে উপরিউক্ত মুসলীম মানসিকতাই দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, যা ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাতের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। তার চেয়েও ভয়ের কথা হল, বর্তমানে এই ভ্রাতৃ-বিবাদ পারমাণবিক যুদ্ধের মত এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতের ইতিহাস উপরিউক্ত সমস্ত পরিণতির জন্য মুসলীম সমাজ তথা মুসলীম সমাজের বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতাকেই দোষী সাব্যস্ত করবে।

কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা মুসলীম সমাজে মুক্তচিন্তার দ্বার আজ রুদ্ধ। মধ্যযুগের ইয়োরোপেও এই রকম একটা পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল এবং চার্চের অনুশাসনের অবসানের পরেই সেখানে মুক্তচিন্তার দ্বার খুলে যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে ইয়োরোপ অগ্রসর হতে থাকে। তাই আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে একদিন মুসলীম জগতেও মুক্ত চিন্তার দ্বার মুক্ত হবে এবং নতুন নেতৃত্ব মুসলীম সমাজকে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে চালিত করবে।

কল্পতরু উৎসব দিবস, ৫১০০ যুগাব্দ, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

৪৪/১, সাউথ রোড, কলিকাতা- ৭৫

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

আরবী শব্দ "ইসলাম"-এর অর্থ আত্মসমর্পণ এবং "মুসলমান" শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন ব্যক্তি। মুসলমানদের মতে ইসলামই হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদি ধর্ম এবং আল্লা যেদিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেদিনই এই ধর্মমত পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। এই পৃথিবীতে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই আল্লা সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তার নিজের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানুষের উচিত সব সময় আল্লার প্রশংসা করা, আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। যেহেতু ইসলামের সরল পথ বা সিরাতুল মুস্তাকিম্ এই একই কথা বলে তাই ইসলাম হল মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম। মহান আল্লাপাক, যিনি বারবুস সমাঅতে আল আরদ বা দ্যুলোক ভূলোকের প্রভু, যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, মহান আরস (স্বর্গীয় সিংহাসন)-এর অধিপতি এবং বিচারের দিনের মহাপরিচালক, যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, যা কিছু ভাল-মন্দ তিনিই সংঘটিত করেন, তিনি এক এবং অবিনশ্বর। "লা ইলাহা ইল্লাল্লা", সেই আল্লা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং তিনি "লা শরীকা" বা তাঁর কোন শরীক বা ভাগীদার নেই ; সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সকল কিছুর উপরে শক্তিমান।

কিন্তু মানুষ বার বার তার সৃজনকর্তা ও প্রতিপালক আল্লার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আল্লাকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর পরাক্রমকে অবিশ্বাস করেছে। অন্য দেবদেবীকে আল্লার সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে আল্লার অংশী সৃষ্টি করেছে। সব সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার যে সরল পথ আল্লা নির্দেশ করেছেন, মানুষ অহঙ্কার ও দম্ভের বশে অথবা শয়তানের দ্বারা চালিত হয়ে সে নির্দেশ অমান্য করেছে। কিন্তু রহমানির রহিম বা পরম দয়ালু ও দয়াময় আল্লা মানুষকে কুপথ থেকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য বার বার রসুল বা বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। আজ পর্যন্ত তিনি আট হাজার রসুল পাঠিয়েছেন। যার মধ্যে চার হাজার বনি ইস্রাইল বা ইহুদী জাতিভুক্ত এবং বাকী চার হাজার অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা মানুষের মধ্যে মহান আল্লার বাণী প্রচার করেছেন, মানুষকে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে বলেছেন, আল্লার পরাক্রমকে ভয় করতে বলেছেন এবং আল্লার শরিক সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। যে সমস্ত জাতি তাদের রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাকেই একমাত্র উপাস্য করে রসুলের পথ অনুসরণ করেছে, আল্লা তাদের অবিশ্বাস্যভাবে পুরস্কৃতকরেছেন। কিন্তু যে সমস্ত জাতি অহঙ্কারের বশে, কিংবা শয়তানের প্রভাবে

তাদের জন্য প্রেরিত রসূলকে অগ্রাহ্য করেছে, রসূলের কথামত সাবধান হয়নি, আল্লাকে ভয় করেনি; পরন্তু রসূলকে বিদ্রূপ করেছে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। সেই সব অবাধ্য জাতির প্রতি নেমে এসেছে আল্লার অভিশাপ, আল্লার ক্রোধ ও আযাব (শাস্তি)। আল্লা তাদের শাস্তি দিলেন। এমন শাস্তি দিলেন যার ফলে অনেক জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

যেমন ধরা যাক রসুল নূহ্ (বাইবেলের Noah)-র সম্প্রদায়ের কথা। তারা হজরৎ নূহ্‌কে রসুল বলে মানতে চাইল না। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল। তাই আল্লা মহাপ্লাবনে তাদের ডুবিয়ে মারলেন—পৃথিবী থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। যেমন ধরা যাক বনি ইস্রায়েল বা ইহুদী জাতির কথা। যতদিন তারা এক-আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আল্লার প্রেরিত আসমানী কেতাব তওরাৎ (Torah যা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর প্রথম পাঁচঅধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ) মান্য করে চলছিল, আল্লা ততদিন তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন, উৎকৃষ্ট জীবিকার সংস্থান করেছেন। এমন কি তাদের শত্রু ফেরাউন (মিশরের ফারাও)-এর সৈন্যদলকে জলে ডুবিয়ে মারতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যেদিন থেকে তারা তওরাৎ অমান্য করতে শুরু করল, গো-বৎসের পূজা করে আল্লার অংশী বা শ'রীক সৃষ্টি করল এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রামের দিন শনিবারেও কাজ করে আল্লার সীমা লঙ্ঘন করল, সেদিন থেকেই তারা আল্লার রোষে পতিত হল। আল্লা তাদের কিছু লোককে বানর ও শূকরে পরিণত করে দিলেন। তাঁর অভিশাপে বনি ইস্রায়েল জাতি ক্রমে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ঠিক সেই রকম, সমুদ জাতির লোকেরা যখন তাদের জন্য প্রেরিত রসুল সালেহ্‌কে অবজ্ঞা করল, মিথ্যাবাদী বলল এবং বলল, " যদি রসুল হও তবে একটা অলৌকিক কাজ করে দেখাও।" তখন আল্লা পাহাড় প্রমাণ এক উষ্ট্রী সৃষ্টি করে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিলেন। ঠিক তেমনি, যখন রসুল লুৎ (বাইবেলের Lot)-এর সম্প্রদায় বা সদুম জাতির লোকেরা সমকামিতার মত অসামাজিক কুকর্মে লিপ্ত হল এবং রসুল লুৎ-কে অমান্য করল তখন আল্লার নির্দেশে ফেরেস্তা (দেবদূত) জিব্রাইল (বাইবেল-এর Gabriel) সদুম[১] নগরীকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেললেন। আজ মরু সাগর আল্লার সেই ধ্বংসের সাক্ষ্য বহন করছে।

কিন্তু তবুও মানুষের শিক্ষা হল না। তারা আবার আগের মতই আল্লার সমকক্ষ রূপে নানান দেবদেবীর পূজা শুরু করল। আল্লার অংশী সৃষ্টি করে মহাপাপে লিপ্ত

(১) বাইবেল'এ Sodom এবং এর থেকেই ইংরাজী Sodomy শব্দ এসেছে।

হয়ে পড়ল। এই সমস্ত দেবদেবীর যে ভাল বা মন্দ, কিছুই করার ক্ষমতা নেই তা বুঝতে পারল না। তাই আল্লা মানুষকে সুপথ দেখাবার জন্য সর্বশেষ রসুল হজরৎ মহম্মদকে পৃথিবীতে পাঠালেন। এইভাবে আল্লা নবী মহম্মদের মাধ্যমে মানুষকে শেষবারের মত সাবধান ও সতর্ক করে দিলেন। তবে আল্লাতায়লা কেন যে আর কোন রসুল পাঠাবেন না বলে স্থির করলেন ইসলামী গ্রন্থে তার কোন কারণ দেখানো হয়নি। সম্ভবত মানুষ্যজাতিকে আল্লার যা বলার ছিল তা সবই নবী মহম্মদের মাধ্যমে বলা হয়ে গেছে এবং সেই কারণে ভবিষ্যতে আর কোন নবী বা রসুল পাঠাবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহম্মদের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরে মুসাইলিমা কায্যাব নামে একজন আরববাসী নিজেকে রসুল বলে দাবি করে এবং তাকে হত্যা করা হয় (বুখারী-৩৭৬৭)।

যাই হোক , আল্লা আর রসুল পাঠিয়ে মানুষকে সতর্ক করবেন না ঠিকই, তবে তার বদলে তিনি যা করবেন তা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আল্লা কেয়ামৎ বা শেষ বিচার করবেন। সেই কেয়ামতের দিন আল্লা সবাইকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত পাপ-পুণ্যের চুলচেরা বিচার করবেন। সেই কেয়ামতের দিন পৃথিবী ধ্বংস হবে। ঐ দিন বিচারে যারা পুণ্যাত্মা বিবেচিত হবে তারা অনন্ত স্বর্গে চলে যাবে আর পাপীরা অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। কাজেই যারা বর্তমানে রসুল মহম্মদের পথ অনুসরণ করে একেশ্বর আল্লার ভজনা করবে, আল্লার অংশী হিসাবে যে সমস্ত দেবদেবীকে খাড়া করেছে তাদের পরিত্যাগ করবে এবং নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করবে, আল্লা তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন। সম্মানের সঙ্গে জান্নাৎ বা স্বর্গে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে অনন্তকাল থাকার ব্যবস্থা করবেন। আর যারা তা না করবে, সেই সব কাফের বা অবাধ্যদের তিনি অনন্ত নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

কেয়ামতের আগের দিনও যদি কেউ তার কৃত পাপের জন্য তওবা বা অনুতাপ করে, মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করে এবং পাপ ক্ষমার জন্য আল্লার কাছে শফাঅৎ বা আর্জি পেশ করে তবে আল্লা তা কবুল বা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন কোন আবেদন-নিবেদনে আর ফল হবে না। অবশ্য আল্লা মানুষের প্রতি পরম করুণাময় বলেই কেয়ামতের আগের দিন পর্যন্ত তাদের তওবা ও শফাঅৎ করার সুযোগ দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে কেয়ামতের চল্লিশ বছর আগেই শয়তানের আর্জি পেশ করার সময়সীমা পার হয়ে যাবে, কারণ শয়তান আল্লার প্রত্যক্ষ শত্রু।

ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব

আল্লাহ্‌ এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর এই সৃষ্টিকার্য বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিকার্যের অনুরূপ, কিন্তু হুবহু এক বলা চলে না। বাইবেলে যেমন গড ছয়দিনে সব সৃষ্টি করেছেন, কোরান মতে আল্লাও ঐ ছয়দিনেই সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করেছেন। তবে বাইবেলে যেমন গড কোন্‌ দিন কি সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়, কোরানে সে রকম বিবরণ অনুপস্থিত। কোরানে যা পাওয়া যায় তা হল, আল্লা প্রথম দু'দিনের মধ্যেই জল, মাটি, আকাশ, বাতাস, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সব সৃষ্টি করে ফেললেন এবং বাকী চারদিনে মানুষের জন্য জীবিকার সৃষ্টি করলেন। এখানে জীবিকা বলতে যব, গম, ধান, খেজুর, ফলমূল, মাংস ইত্যাদি, যা মানুষ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে সে সব কিছুকে বোঝায়। আল্লা শূন্য থেকেই সব সৃষ্টি করেন এবং এর জন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। কি সৃষ্টি করবেন তা মনে মনে স্থির করে কুন্‌ বা হও বললেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

হজরৎ মহম্মদ মনে করতেন যে, কোন এক শনিবার আল্লা তাঁর সৃষ্টিকার্য শুরু করেন এবং ঐ দিন তিনি মাটি সৃষ্টি করেন। পরদিন রবিবার তিনি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন। তারপর সোমবার গাছপালা এবং মঙ্গলবার অন্যান্য পরিশ্রমসাধ্য সৃষ্টিকার্য করেন। বুধবার তিনি আলো এবং বৃহস্পতিবার পশু সৃষ্টি করেন। সব শেষে শুক্রবার আসরের নামাজের পর তিনি প্রথম মানব হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেন (মুসলীম-৬৭০৭)। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে মনে হয় যে, প্রথম চার দিন আল্লা অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন তাঁর "কোরআন শরীফ" গ্রন্থে "তফসীর হোসেনী" প্রভৃতি ইসলামী গ্রন্থ থেকে সৃষ্টির কিছু কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কোন মতানুযায়ী আল্লা প্রথমে বাতাস সৃষ্টি করেন এবং পরে জল সৃষ্টি করে তাকে বাতাসের উপর স্থাপন করেন এবং জলের উপর তাঁর সিংহাসন বা আরস স্থাপন করেন। বাতাসের উপর জলকে স্থাপন করার মত এমন অসম্ভব কাজ তিনি এজন্যই করলেন যাতে মানুষ তাঁর অসীম ক্ষমতার কিছুটা আঁচ করতে পারে এবং কত অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করতে পারেন এটা বুঝে নিয়ে তাঁর পরাক্রমকে ভয় করে এবং সর্বদা তাঁর অনুগত থাকে। অন্যমতে মক্কার কাবাগৃহ (সমতল) পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং আদিতে যখন শুধু জল ছিল তখন ঐ কাবা জলের উপরে একটা বুদ্বুদের মত ভাসছিল। পরে আল্লা ঐ বদ্বুদকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে মাটি সৃষ্টি করেন এবং

এভাবেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। আরেক মত অনুযায়ী আল্লা প্রথমে একটা মরকৎ মণি সৃষ্টি করেন এবং তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এতে করে সেই মরকৎ মণি গলে জল হয়ে যায় এবং সৃষ্টিকার্যের সূত্রপাত হয়।

তবে কোরান ও অন্যান্য মতামত থেকে সৃষ্টির যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল- আল্লা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন এবং তারপর মাটি সৃষ্টি করে তাকে জলের উপর স্থাপন করেন। কিন্তু দেখা গেল জলের উপর মাটি ঠিক স্থির হয়ে বসছে না, নড়বড়ে থেকে যাচ্ছে। তাই তিনি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে ঐ নড়বড়ে মাটিকে দৃঢ় করলেন। উপরন্তু লোক চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় তাই আল্লা গিরিপথেরও সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি পৃথিবীর উপর শক্ত আচ্ছাদন বা ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করলেন। পরম ক্ষমতাশালী আল্লা বলেই তিনি ছাদরূপী ঐ আকাশকে কোন স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়াই পৃথিবীর উপর স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লা নিজেই ছাদরূপী ঐ আকাশ ভেঙে ফেলবেন এবং তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়বে।

এরপর আল্লা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করে তাদের পূর্বদিকে উদয় হতে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে বাধ্য করলেন। এভাবে তারা আজও প্রতিদিন আল্লার মহিমা কীর্তন করে চলেছে। তবে কেয়ামতের দিন আল্লা সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদিত করবেন। পৃথিবীর উপরেই স্বর্গ এবং সেখানে স্বর্গবাসীরা ফানুসের আলো শিকলে বেঁধে হাতে করে ঝুলিয়ে বসে আছে এবং এই ফানুসের আলোকেই আমরা তারা বলি। স্বর্গবাসীরা যেদিন স্বর্গচ্যুত হবেন সেদিন তারাগুলোও পৃথিবীতে এসে পড়বে। এই সব সৃষ্টি করতে আল্লার দু দিন লাগল এবং বাকী চার দিন তিনি মানুষের জন্য জীবিকা সৃষ্টি করলেন।(২)

আল্লা সব সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু তাঁর এই সুন্দর সৃষ্টিকে প্রশংসা করার কেউ নেই। তাই তাঁকে এবাদৎ বা উপাসনা করার জন্য আল্লা মানুষ সৃষ্টি করবেন স্থির করলেন। একদিন তিনি সব ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন যে, পৃথিবীতে তিনি একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন। তখন ফেরেস্তারা বলল, ''আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা ঝগড়া, দাঙ্গা ও খুন-খারাপি করবে? আপনার মহিমা কীর্তন করতে এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে আমরাই তো রয়েছি।'' তখন আল্লাতায়লা বললেন, ''নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না'' (২/৩০)। আল্লা প্রথমে মাটিতে জল ঢেলে কাদা তৈরি করলেন। কিন্তু তা খুব নরম হয়ে গেল, তাই তাকে কিছুদিন ফেলে রাখলেন। মাটিটা একটু শুকনো হলে তাই দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের সমান করে ষাট হাত লম্বা হজরৎ

---

(২) কোরান-(৭/৫৪), (৭/১৭১), (১০/৩), (১১/৭), (১৩/২), (৩১/১০), (৩২/৪), (৫০/৩৮) ও (৫৭/৪)।

আদমের মূর্তি তৈরি করলেন (মুসলীম-৬৮০৯)। তারপর যেই কুন্ বললেন, অমনি তা রক্ত মাংসের মানুষে পরিণত হল (২/১১৭)। তারপর তিনি তাতে আত্মা বা রুহ্ ফুঁকে দিয়ে জীবিত করে তুললেন। এই দিনটি ছিল পবিত্র জুমআ বা শুক্রবার। মানুষ সৃষ্টি করার বহু আগেই আল্লা সমস্ত রুহ্ সৃষ্টি করে একটা বিশেষ জায়গায় সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন এবং সেখানে যেই সব আত্মার মধ্যে পরিচয় ও মিল হয়েছিল, পৃথিবীতে আসার পর তাদের মধ্যে আকর্ষণ , প্রেম ও মিলন সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে যে সব আত্মার মধ্যে গরমিল ছিল, পৃথিবীতে আসার পর তাদের মধ্যে গরমিলই স্থাপিত হয়। এই রুহ সম্বন্ধে মানুষের খুব বেশী জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় কারণ আল্লাতায়লা এ সম্বন্ধে মানুষকে খুবই সীমিত জ্ঞান দিয়েছেন (১৭/৮৫)।

যাই হোক, হজরৎ আদমই হলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং আজকের পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই এই আদি পিতা আদমের বংশধর। ভারতের হিন্দুরা আদমের দশম পুরুষ হজরৎ নূহের পুত্র হাম-এর বংশধর এবং হজরৎ মহম্মদ হলেন আদমের ৯০তম বংশধর। যে মাটি দিয়ে আল্লাতায়লা হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে লাল, হলুদ ও কালো রঙের মাটি মেশানো ছিল। তাই আজ আদমের বংশধরদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ হলুদ, কেউ কালো ইত্যাদি। একই মানুষের শরীরের খানিকটা লাল, খানিকটা কালো ও খানিকটা হলুদ হলে এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে সুবিধা হত সন্দেহ নেই। হজরৎ আদমের ষাটহাত আকৃতি হ্রাস পেতে পেতে মানুষ তার আজকের উচ্চতায় পৌছেছে। তবে কেয়ামতের পর মানুষ যখন আবার জান্নাতে ফিরে যাবে তখন পুনরায় সেই ষাটহাত আকৃতি ফিরে পাবে।

আল্লাতায়লা সর্বপ্রথম আদমকে সমবেত ফেরেস্তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করতে বললেন। তখন আদম বললেন, " আস্‌সালাম আলাইকুম্" (বা গ্রীবার নমন তোমার প্রতি)। জবাবে ফেরেস্তারা বললেন, "অ আলাইকাসসালাম অ রহমতুল্লা" (বা তোমাদের প্রতি গ্রীবার নমন, আল্লার অনুগ্রহ হোক)। এইভাবে আল্লা মানবজাতির মধ্যে সালাম বিনিময়ের প্রথা চালু করলেন, যা আজও চলে আসছে। তারপর আল্লা আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন। একদিন ফেরেস্তাদের সামনে তা প্রকাশ করে বললেন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই সব জিনিসের নাম আমাকে বলে দাও"(২/৩১)। ফেরেস্তারা তখন বলল যে, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাতায়লা তাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া তাদের তো আর কোন জ্ঞান নেই। তখন আল্লা আদমকে সব জিনিসের নাম বলতে বললেন এবং হজরৎ আদম এক এক করে সব বলে দিলেন (২/৩৩)। এতে করে আদম মহাজ্ঞানী প্রমাণিত হলেন এবং আল্লা সব ফেরেস্তাদের আদেশ করলেন, "আদমকে সিজদা কর" (২/৩৪)। (নতজানু হয়ে ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করাকে সিজদা করা বলে।) তখন একমাত্র ইবলিস (অন্য নাম আজাজিল) ছাড়া সকলেই আদমকে

সিজদা করল। ইবলিস অমান্য করল, অহঙ্কার করল এবং বলল, "আপনি শুকনো ঠনঠনে মাটির দুর্গন্ধময় কাদা দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার কাছে আমি নত হতে রাজী নই। আমি আদম আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের দ্বারা(৭/১২)।" প্রকৃতপক্ষে আল্লা সমস্ত ফেরেস্তাদেরই সৃষ্টি করেছেন আগুনের দ্বারা এবং তাই তাঁরা মানুষের কাছে অদৃশ্য থাকেন।

যাই হোক, আল্লাতায়লা ইবলিসের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আজ থেকে তুই অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত হলি। এখান থেকে তুই চলে যা। কেয়ামৎ পর্যন্ত তোর প্রতি আমার ধিক্কার ও অভিশাপ রইল"(৭/১৪)। সেইদিন থেকে ইবলিস শয়তানে পরিণত হল এবং স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হল।

আল্লা সমস্ত জীবজন্তু স্ত্রী ও পুরুষ, জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা শান্তি পায়। তাই আল্লা আদমের কুক্ষাস্থি (পাঁজরের সব থেকে নীচের হাড়) থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। একদিন আদম যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন তখন আল্লা তার এই হাড় সংগ্রহ করেন। মা হাওয়াকে আল্লা মাটির বদলে আদমের হাড় দিয়ে এই কারণে সৃষ্টি করলেন যাতে পুরুষজাতি নারীজাতিকে নিজের শরীরের অংশ জেনে তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়।

আল্লাতায়লা আদম ও মা হাওয়াকে চিরকাল স্বর্গে বসবাস করার অনুমতি দিলেন, যথা-তথা ভ্রমণ করতে বললেন এবং যা ইচ্ছা খেতে বললেন, শুধু গন্দম বৃক্ষের ধারে কাছে যেতে বা তার ফল খেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ঈর্ষাকাতর শয়তান ইবলিশ তাদের কু-পরামর্শ দিল। বলল যে, গন্দম বৃক্ষের ফল খেয়ে তাঁরা যাতে অমর ফেরেস্তা না হয়ে যান তাই আল্লা তাঁদের ঐ ফল খেতে নিষেধ করেছেন। যাই হোক, শয়তানের কুহকে পড়ে তাঁরা একদিন সেই ফল খেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভিতর থেকে স্বর্গীয় প্রভাব দূর হয়ে গেল। স্বর্গে মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। তাই যে স্বর্গীয় পোশাক আল্লা তাদের পরিয়ে দিয়েছিলেন তা এতদিন পরিবর্তন বা উম্মোচন করার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু স্বর্গীয় প্রভাব দূর হবার সাথে সাথে সেই স্বর্গীয় পোশাক অন্তর্হিত হল, পরস্পরের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং হজরৎ আদমও মা হাওয়া পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়লেন।

আল্লা যখন এ সব ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তিনি আদম ও হাওয়ার উপর খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং স্বর্গ থেকে তাদের নির্বাসিত করলেন। স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আদম আরবের মক্কায় (মতান্তরে বর্তমান শ্রীলঙ্কায়) এবং মা হাওয়া আরবের ইয়মন প্রদেশে পতিত হলেন। অনেক দিন তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটালেন এবং তারপর আল্লার ইচ্ছায় মক্কার নিকটবর্তী আরাফৎ (মিলন) প্রান্তরে পুনরায় মিলিত হলেন। তারপর তাঁরা সংসার পাতলেন, সন্তান-সন্ততি হল এবং এইভাবে পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার শুরু হল।

ইসলাম ও অংশীবাদ

আল্লা ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা বা অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করার নাম আল্লার অংশী সৃষ্টি করা। যে সব ধর্মে এক আল্লা ছাড়া অন্য দেবদেবীর উপাসনা করা হয় তাকে অংশীবাদী ধর্ম বলে। ইসলাম ভীষণভাবে একেশ্বরবাদী এবং তাই এতে অংশীবাদ গুরুতর পাপ। অংশীবাদী ধর্মে যে সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা করা হয় ইসলামী মতে তা সবই নিরর্থক। কারণ ঐ সব দেবদেবীর ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই। ভাল বা মন্দ, যা কিছু করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাই তার মালিক, প্রতিপালক, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও রূপদাতা। আল্লা কখনও মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। তিনি জনকও নন, জাতকও নন। আল্লাই সর্ব বিষয়ের নির্ভরস্থল। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তবে আল্লা নিজে মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ না করলেও তিনি মানবরূপী রসুল প্রেরণ করেন। তাই রসুল বা নবী বলতে বোঝায় আল্লার বার্তাবহনকারী মানব।

কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ঘোরতর অংশীবাদী। কারণ তারা অবতারবাদে বিশ্বাসী হয়ে সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। ইসলামের নবী বা রসুলরা অবতার নন। আর দশটা মানুষের মতই সাধারণ মানুষ। তবে তফাত শুধু এই যে, আল্ল[illegible] র্তাবাহক হবার জন্য তাদের কাছে আল্লার ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। ইসলামী মতে আল্লার অংশী থাকলে একাধিক ঈশ্বর থাকত এবং তাঁরা নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার চেষ্টা করত। ফলে মহা নৈরাজ্য ও অশান্তির সৃষ্টি হত। তাই অংশীবাদীদের সঙ্গে ইসলামের কোন আপস নেই এবং এদের প্রতি কোরানের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। স্বয়ং আল্লাও অংশীবাদীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মম।

ইসলামের চোখে খ্রীস্টান ও ইহুদীরাও অংশীবাদী কাফের এবং তাদের ধর্মও অংশীবাদী। আগে ইহুদীরা একেশ্বরবাদী ছিল এবং সেই কারণে আল্লা তাদের আসমানী কেতাব তওরাৎ দান করেছিলেন। কিন্তু পরে তারা গো-বৎসের পূজা করে আল্লার অংশী সৃষ্টি করে এবং শনিবারে কাজ করে আল্লার সীমা লঙ্ঘন করে। এইভাবে তাঁরা অংশীবাদী কাফেরে পরিণত হয়। কাফের শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবাধ্য এবং তা কুফুর ধাতু (যার অর্থ অবাধ্যতা করা) থেকে উৎপন্ন।

সেই রকম প্রধানত তিনটি কারণে খ্রীস্টানরা অংশীবাদী কাফের। প্রথমত তারা বলে যে যীশু বা ঈশা আল্লার পুত্র। কিন্তু কোরানে আল্লা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর কোন স্ত্রী নেই (৬/১০১)। কাজেই তাঁর কোন সন্তান থাকতে পারে না (৪/১৭১, ২/১১৬, ১৭/১১১, ১০/৬৮, ২৩/৯১ ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত তারা ঈশা ও মা মরিয়ম (মেরী)'র মূর্তি পূজা করে আল্লার অংশী সৃষ্টি করছে। তৃতীয়ত আল্লা তাদের যে ইঞ্জিল[৩] কেতাব দিয়েছেন তাতে বিয়ে-সাদী না করে সাধু হবার কোন নির্দেশ নেই। কিন্তু ঘর সংসার না করে সাধু হয়ে তাদের পাদ্রীরা আল্লার সীমা লঙ্ঘন করছে। উপরন্তু, তওরাৎ ও ইঞ্জিল, উভয় কেতাবেই আল্লা বলেছেন যে, আরবে সর্বশেষ নবীর অবির্ভাব হবে[৪]। কাজেই ইহুদী ও খ্রীস্টানদের উচিত আল্লার নির্দেশমত মহম্মদকে নবী বলে স্বীকার করা, প্রেরিত আসমানী কেতাব কোরানে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইসলাম কবুল করা। কিন্তু তারা তা না করে আল্লার সীমা লঙ্ঘন করছে।

---

(৩) ইংরাজী Evangel.

(৪) Deuteronomy-(18/15)

ইসলামের পাঁচস্তম্ভ

পাঁচটি মূল নীতি ও ধর্মাচরণের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে বলা হয় ইসলামের ভিত্তি বা পাঁচ স্তম্ভ। এগুলো হলো (১) কলেমা, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) জাকাৎ ও (৫) হজ।

প্রথম স্তম্ভ কলেমা ঃ

কলেমা হল ইসলামের ছয়টি মূল মন্ত্র, যথা (১) কলেমা তৈয়ব, (২) কলেমা শাহাদাৎ, (৩) কলেমা তৌহীদ, (৪) কলেমা তামজীদ, (৫) কলেমা রদ্দেকুফর এবং (৬) কলেমা তাহ্মীদ। এই ছয়টি কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। ঈমান শব্দের অর্থ হল বিশ্বাস। কাজেই কলেমায় দৃঢ় ও আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ ঈমানদার বা বিশ্বাসী মুসলমান হতে পারে না। উপরিউক্ত ছয়টি কলেমার মধ্যে প্রথম কলোমা বা কলেমা তৈয়ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায় ইসলামের প্রাণ ।

কলেমা তৈয়ব

এই কলেমার মন্ত্র হল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা", অর্থাৎ আল্লা ব্যতীত উপাস্য নেই - মহম্মদ আল্লার রসুল। কাজেই এই কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হল, একেশ্বর আল্লায় বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করা। এই কারণেই এই কলেমার গুরুত্ব এত অপরিসীম। এই কলেমাতে অবিশ্বাসী হলে কোন মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যাবে। এই কারণেই আল্লা কোরানে বলেছেন, "আল্লা ও তাঁর রসুলের অনুগত হও" (৩/৩২) এবং "যারা আল্লা ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নমের আগুন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে" (৭২/২৩)। কাজেই সেই ব্যক্তিই ঈমানদার যে আল্লাকে তার প্রভু, ইসলামকে তার ধর্ম ও মহম্মদকে রসুলরূপে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে। এই কলেমায় এটাও পরিষ্কার হচ্ছে যে, শুধু আল্লায় বিশ্বাস করলেই কেউ মুসলমান হতে পারে না। মহম্মদ যে আল্লার রসুল সেটা বিশাস করাও জরুরী।

কলেমা শাহাদাৎ ঃ

এই কলেমার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তিনি এক এবং তাঁর কোন অংশী নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই মহম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল।"

কলেমা তৌহীদ ঃ

এর বংলা অর্থ হল, "(হে আল্লা) আপনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, আপনি অদ্বিতীয় এবং আপনার কোন অংশী নেই। রসুল মহম্মদ ধর্মভীরুগণের নেতা এবং বিশ্বপালক কর্তৃক প্রেরিত।"

কলেমা তামজীদ ঃ

এই কলেমার বাংলা অর্থ হল, "(হে আল্লা) আপনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। আপনি জ্যোতির্ময় আল্লা এবং আপনি আপনার জ্যোতি দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। হজরৎ মহম্মদ-প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শেষ নবী।" প্রথম কলেমার পরেই এই চতুর্থ কলেমার গুরুত্ব। কারণ এই কলেমায় ইসলামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে আর তা হল, মহম্মদ নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। মুসলমানদের মধ্যে কেউ নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করলে এই কলেমার বলেই তাকে কাফের বলে চিহ্নিত করা হয় এবং হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে একজন দরবেশ মীর্জা আহম্মদ নিজেকে নবী বলে প্রচার করায় তাকে হত্যা করা হয় এবং সমগ্র আহম্মদী সম্প্রদায়কে কাফের বলে চিহ্নিত করা হয়। আজও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানে কাফের ও অ-মুসলমান বলে গরিগণিত ও পরিত্যক্ত। অথচ মীর্জা আহম্মদ নবী মহম্মদকে কখনই অস্বীকার করেননি, বরং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নবী বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই কলেমার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এর ফলেই কোরান এবং হাদিসের কোন সংশোধন সম্ভব নয়। আর নবী না জন্মালে কে সংশোধন করবে?

কলেমা রদ্দেকুফর

এর বাংলা অর্থ হল, "(হে আল্লা) আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন কাউকে আপনার শরীক না করি। আমার জ্ঞানের গোচর ও জ্ঞানের অগোচর সমস্ত পাপের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং অনুতাপ (তওবা) করছি। আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং বলছি যে, আল্লা ভিন্ন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল।" এই কলেমা সম্পর্কে দু একটি কথা বলার আছে। এতে বান্দা আল্লার কাছে প্রতিজ্ঞা করছে যে, সে আল্লার অংশী বা শরীক সৃষ্টি করবে না। এই কারণেই মুসলমানরা বলে যে, এক আল্লা ছাড়া আর কারও কাছে

তারা মাথা নত করে না বা সিজদা করে না। এই কলেমার জন্যই তারা দেশ-মাতৃকাকে প্রণাম করে না এবং " বন্দে মাতরম্" গাইতে অস্বীকার করে।

কলেমা তাহ্মীদ ঃ

এর বাংলা অর্থ হল, "পবিত্র ও সর্বশক্তিমান আল্লাতায়লাকে সকল প্রশংসার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি এবং আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

এর পর রয়েছে দুটো বিশ্বাসের শপথ যার মাধ্যমে বান্দা আল্লা, তাঁর রসুল, ধর্মশাস্ত্র, কেয়ামত ইত্যাদি সব কিছুর উপর বিশ্বাসের শপথ গ্রহণ করে। দুটো শপথ বাক্যের নাম (১) ঈমান মুজমাল ও (২) ঈমান মুফাচ্ছল। ঈমান মুজমালের বাংলা করলে দাঁড়ায়, "আমি সর্ববিধ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর আদেশ ও বিধানসমূহ মেনে নিলাম।" ঈমান মুফাচ্ছল এর বাংলা অর্থ, " আমি আল্লা, তাঁর ফেরেস্তাগণ, তাঁর কেতাবসকল, তাঁর প্রেরিত রসুলগণ, কেয়ামত, তকদীর (ভাগ্য) এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ - ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনলাম, বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

উপরিউক্ত কলেমাগুলি থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, শুধু আল্লায় বিশ্বাস করলেই মুসলমান হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহম্মদ আল্লার রসুল। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সে কোন আল্লায় বিশ্বাস করলে হবে না, মহম্মদ যে আল্লার রসুল সেই আল্লাতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অনেক সময় আল্লায় বিশ্বাস করার চাইতে মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাটাই বেশী জরুরী বলে মনে হয়। কারণ মহম্মদের মতে সে ব্যক্তি এখনও প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে ওঠেনি যে নাকি নিজের সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, তথা সমগ্র মানবসমাজের থেকেও মহম্মদকে বেশী ভাল না বাসে (মুসলীম -৭১)।

হিন্দু ধর্ম মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। হিন্দু ধর্মমত অনুসারে আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির মূল সোপানই হল নৈতিক চরিত্র। কিন্তু ইসলাম সে কথা বলে না। ইসলামী মতে যে কলেমা গ্রহণ করে ঈমান এনেছে বা মুসলমান হয়েছে, নৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত অধঃপতিত হলেও তার অক্ষয় স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে কলেমার গুরুত্ব অপরিসীম এবং শুধুমাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লা......." কলেমা গ্রহণ করার জন্যই কেয়ামতের দিন মহম্মদ তাঁর ৭০ হাজার উম্মত সহ সকলের আগে স্বর্গে প্রবেশ করবেন (মুসলীম-৬৬৬৮)। মহম্মদ বলতেন যে, একদিন ফেরেস্তা জিব্রাইল এসে তাঁকে বললেন, " আপনার উম্মত (শিষ্য)-দের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার কোন খোঁজ-খবর রাখে না সেও স্বর্গে প্রবেশ করবে।" একদিন তাঁর এক উম্মত আবুজার তাঁকে প্রশ্ন করল, " সে ব্যক্তি যদি চোর কিংবা ব্যভিচারী হয় তাহলেও কি সে স্বর্গে প্রবেশ করবে?" মহম্মদ

বললেন, "হ্যাঁ, তাহলেও সে স্বর্গে প্রবেশ করবে" (মুসলীম-১৭১)। এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চুরি করা ও ব্যভিচার করা ইসলামে ঘোরতর পাপ এবং তার শাস্তি হল, চোরের ডান হাত কেটে ফেলা এবং ব্যভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা।

এ সব ব্যাপারে ইসলামী সিদ্ধান্ত হল, "আল্লার দৃষ্টিতে সব থেকে গুরুতর পাপ হল আল্লার অংশী সৃষ্টি করা, তারপর গুরুতর পাপ হল আপন শিশু সন্তানকে হত্যা করা এবং তার পরের গুরুতর পাপ হল (মুসলমান) প্রতিবেশীর পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার করা" (ঐ - ১৫৬)। কাজেই একজন অংশীবাদী কাফের যত ভাল কাজই করুক না কেন, আল্লার অংশী সৃষ্টি করার পাপের জন্য তার সমস্ত পুণ্যের কাজই নিষ্ফল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে একজন মুসলমান যত পাপই করুক না কেন, অংশীবাদের পাপে লিপ্ত না হবার দরুন তার কোন পাপই পাপ বলে গ্রাহ্য হবে না। এই কারণেই মুসলমানরা বলে থাকে যে, গান্ধীর চাইতে একজন অধঃপতিত মুসলমানও শ্রেষ্ঠ।

ইসলামী মতে পথটাই আসল, ভুল পথে চলে পুণ্য করা অসম্ভব। কলেমায় বিশ্বাস করে ঈমান আনাই সঠিক পথ এবং সেই সঠিক পথের পথিক না হলে শত পুণ্যের কাজ কোন কাজে আসবে না। একদিন মহম্মদের এক পত্নী বিবি আয়েশা তাঁকে বললেন যে, তার এক পৌত্তলিক আত্মীয় আছে যে গরীব-দুঃখীদের খাওয়ায় এবং আরও অনেক ভাল ভাল কাজ করে। এইসব ভাল কাজ কেয়ামতের দিন তার কি কোন কাজে আসবে? মহম্মদ জবাব দিলেন, "না, কোন কাজে আসবে না" (ঐ - ৪১৬)। আল্লার অংশী সৃষ্টি করার পাপের জন্য মহম্মদ তাঁর বাবা, মা ও নিকট আত্মীয়দের প্রতিও ছিলেন সমান কঠোর এবং বলতেন যে, "তারা সবাই নরকের আগুনে রয়েছে" (ঐ- ৩৯৮,৪১৭)। কোন পৌত্তলিক যদি তার অংশীবাদী ধর্ম ত্যাগ করে কলেমার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পুরাণো পাপ ধুয়ে যায় কিন্তু পুণ্যটা থেকে যায় (ঐ-২২০,২২৩)। অর্থাৎ অংশীবাদী থাকার ফলে যে পুণ্যের কাজ আল্লা এতদিন কবুল করতে পারছিলেন না, কলেমা গ্রহণ করার সাথে সাথে তিনি তা কবুল করবেন। কারণ সে ব্যক্তি এখন সঠিক পথের পথিক হয়েছেন। ঠিক সেই রকম এমন অনেক কাজ আছে যা পৌত্তলিক অবস্থায় করলে পাপ হয়, কিন্তু কলেমা গ্রহণ করে মুসলমান হবার পর করলে পাপ হয় না। যেমন লুঠপাঠ করে অপরের জিনিস অংশীবাদী অবস্থায় গ্রহণ করলে তাতে পাপ হয়, কিন্তু কলেমা গ্রহণকারী মুসলমানের ক্ষেত্রে আল্লা তা পবিত্র ও বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন (৮/৬৯)।

দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ

ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোকে একত্রে শরীয়ৎ বলা হয় এবং এই

বিধিবিধানগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন (১) ফরজ, (২) ওয়াজেব, (৩) সুন্নত, (৪) নফল, (৫) মোস্তাহাব, (৬) মোবাহ্, (৭) হারাম, (৮) হালাল, (৯) মক্রুহ্ ও (১০) মোফসেদ।

ফরজ হল অবশ্য-পালনীয় বিধি-বিধান। আল্লাতায়লা কোরান শরীফের আয়াৎ অবতীর্ণ করে যে সমস্ত বিধি-বিধান নির্দেশ করেছেন সেগুলোই ফরজ। কিন্তু কোরান শরীফে আল্লাতায়লা এমন কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছেন যা সবার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। যেমন জিহাদ করা বা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করা। শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও মহিলাদের পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের ফরজের নাম ফরজে কৈফায়া। এ ছাড়া অন্যান্য ফরজ, যেমন নামাজ, রোজা, অজু, গোসল (স্নান), যা সবাই করতে পারে, তাকে বলে ফরজে আয়েন। ফরজে আয়েন পালন না করলে বা তাতে অবিশ্বাস করলে সে আর মুসলমান থাকবে না, কাফের হয়ে যাবে।

ওয়াজেব হল সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ, যা কোরান শরীফে আছে এবং করা উচিত বা করতে পারলে ভাল। কিন্তু না করতে পারলে কাফের হতে হয় না। যেমন—ঈদের নামাজে যোগ দেওয়া, ঈদের দিন ফিৎরা বা ভিক্ষা দেওয়া বা ইদুজ্জোহার দিন পশু কোরবানী দেওয়া, ইত্যাদি। সুন্নত বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বিধি-বিধান যা নবী নিজে পালন করতেন এবং অন্য বান্দাদেরও করতে পরামর্শ দিতেন। সুন্নতগুলো পালন করলে পুণ্য হবে, পালন না করলে পাপ হবে এবং তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। এর মধ্যে সে সমস্ত সুন্নত মহানবী নিয়মিত করতেন সেগুলোকে বলে সুন্নত মোয়াক্কাদা। আর যেগুলো মহানবী মাঝে মাঝে করতেন তাকে বলে সুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদা।

মুসলমানদের ছয়টি বিশেষ সুন্নত হল (১) খৎনা দেওয়া, (২) গোঁফ কামানো, (৩) বগলের চুল কামানো, (৪) মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলা বা ঘাড়ের উপর পর্যন্ত রেখে দেওয়া, (৫) হাত ও পায়ের নখ কাটা এবং (৬) নাভির নীচের কেশ কামানো বা পাকি করা। লিঙ্গাগ্রের চামড়া ছেদন করার নাম খৎনা দেওয়া। মহম্মদের অনেক আগে নবী হজরৎ ইব্রাহীম (বাইবেলের আব্রাহাম) আশি বছর বয়সে, নিজ হাতে কুঠার দিয়ে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। কালে এই প্রথা শুধু ইহুদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মদিনা বাসকালে মহম্মদ মুসলমানদের মধ্যে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, নবী মহম্মদ নিজের খৎনা করেছিলেন কি না তা রহস্যময়। মৃত্যুর পর মহম্মদের মৃতদেহকে যখন স্নান করানো হয় তখন

আকাশ থেকে দৈববাণী হয় যে, মহম্মদের নগ্ন দেহ যে দেখবে সে মারা যাবে বা তার চোখ অন্ধ হবে।[৫]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খৎনা প্রথা শুধুমাত্র পুরুষ মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কায়রো'র আল আঝর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ্ গদ আল-হক্ আলি গদ আল-হক এর ফতোয়ার জোরে মিশরে মেয়েদেরও খৎনা করা হয় এবং তাদের যৌনাঙ্গের ক্লিটোরিস অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচার করার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে প্রতি বছর বেশ কিছু বালিকা সেখানে প্রাণ হারায়। গত ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার সি এন এন (CNN)-এর টেলিভিশানে এই রকম একটি অস্ত্রোপচার সারা পৃথিবীময় প্রচার করার ফলে মিশরের পার্লামেন্টে এই নিয়ে প্রবল বাদ-বিতণ্ডার সূচনা হয়। মিশরের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু বা মুফতি ঐ প্রথা বন্ধ করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু উপরিউক্ত শেখ আলি গদ আল-হক-এর ফতোয়াকেই পার্লামেন্ট বজায় রাখে। তাই আজও এই প্রথা মিশরের মেয়েদের মধ্যে চালু রয়েছে।[৬]

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাক্ ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে একটা প্রথা চালু ছিল-দেবতার নামে উৎসর্গ করে কিছু কিছু পশু ছেড়ে দেওয়া হত এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য ঐ সব পশুর কান ফুটো করে দেওয়া হত। পরে আল্লা এই প্রথার নিন্দা করেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে বিকৃত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করেন (৪/১১৯)। কাজেই খৎনার মাধ্যমে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সৃষ্টি মানুষের এই অঙ্গ বিকৃতির প্রতি আল্লার উদাসীনতা সত্যিই বিস্ময়কর। তবে কেয়ামতের দিন আল্লা সবাইকে খৎনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করবেন।

তৎকালীন আরবের লোকেরা অন্য সকলের মতই দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখত। কিন্তু মদিনাবাসকালে মহানবী তার উম্মতদের গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে পারামর্শ দিলেন। এর ফলে সুবিধা হল এই যে, মুসলমানদের চেনা সহজ হল এবং ভুলক্রমে মুসলমানের দ্বারা মুসলমান নির্যাতিত হওয়া বন্ধ হল। নবী অবশ্য বললেন যে, এর সাহায্যে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতার প্রসার ঘটবে (মুসলীম -৫০০)। ঠিক একই কারণে মুসলমান রমণীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য পর্দার প্রচলন করা হল (৩৩/৫৯)। কাজেই বিশ্বব্যাপী মুসলমান সমাজের পুরুষরা যে গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখেন তার পিছনে কোন আধ্যাত্মিক কারণ নেই। সহজে সনাক্ত করার জন্যই এই প্রথা।

---

(৫) Life of Mahomet, Sir W. Muir, Ch. 34, P-501

(৬) The Statesman–26-8-96.

মোস্তাহাব হল সেই সমস্ত বিধি-নিয়ম যা করলে পুণ্য আছে কিন্তু না করলে পাপ নেই। যেমন দোয়া, মোনাজাত ইত্যাদি পবিত্র আরবী ভাষায় করা। মোবাহ্ হল সেই সমস্ত বিধি-নিয়ম যা করলে পুণ্য নেই এবং না করলে পাপ নেই। যেমন—সঙ্গতি অনুসারে ভাল পোশাক-আসাক করা, ভাল খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি। যে সব কাজ হারাম বলে চিহ্নিত তা ইসলামে ভীষণভাবে নিষিদ্ধ, যেমন সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, চুরি করা, ব্যভিচার করা, অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করা ইত্যাদি। আর হালাল হল সেই সমস্ত কাজ যা ইসলামে বৈধ। যেমন গনিমত বা লুঠের মাল একজন অ-মুসলমানের জন্য হারাম, কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য হালাল। সজ্ঞানে কেউ হারাম কাজ করলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে আজকাল অনেক মুসলমানই অনেক হারাম কাজ করছেন এবং সেই কারণে কাফের হচ্ছেন না। যেমন মদ্যপান, গান-বাজনা করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি।

যে সব কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম নয়, কিন্তু দোষাবহ, না করলেই ভাল, তাকে মকরুহ বলে। যেমন খালি গায়ে নামাজ পড়া, অজুর সময় কথা বলা, কাঁকড়া-চিংড়ি খাওয়া ইত্যাদি। শরীয়তের বিধান-বিরোধী কাজকে মোফসেদ বলে, যেমন নামাজের সময় কথা বলা, শব্দ করে হাসা বা কাঁদা ইত্যাদি। রোজার সময়, দিনের বেলায় সজ্ঞানে পানাহার করলে বা স্ত্রী সহবাস করলেও মোফসেদ হয়। তবে এ সব ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান।

যে সমস্ত কাজ করলে পুণ্য আছে কিন্তু না করলে পাপ নেই তাকে নফল বলে। যেমন, জীবনে একবার মক্কায় গিয়ে হজ করা ফরজ। কিন্তু কেউ যদি একাধিক বার হজ করে তবে তা নফল হজ হবে। তেমনি দিনে পাঁচ বার নামাজ আদায় করা ফরজ-এর অতিরিক্ত নামাজ নফল নামাজ হবে।

নামাজ একটি ফার্সী শব্দ এবং আরবীতে এর নাম সালাহ্। নামাজ শব্দের তিনটি অর্থ হয়, যথা—বিনয়, সিজদা ও উপাসনা। কাজেই ধর্মীয় রীতি হিসাবে নামাজকে বলা চলে সিজদা সহকারে বিনয়পূর্বক উপাসনা। পানিতে গোসল করলে যেমন শরীরের বাইরেটা পরিষ্কার হয়, তেমনি নামাজের ফলে পাপ ধুয়ে গিয়ে অন্তর সাফ হয়। নামাজের ফলে মানুষের পাপ শীতকালের গাছের পাতার মতই নিঃশব্দে ঝরে যায়। নবুয়ত বা নবীত্ব লাভের পর স্বয়ং ফেরেস্তা জিব্রাইল মহানবীকে নামাজ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এই নামাজ পালন করার কতকগুলি পূর্ব শর্ত আছে। নামাজের আগে শরীরকে পাক বা পবিত্র করার জন্য অজু অথবা গোসল অথবা তায়াম্মুম্ করা ফরজ। এ ছাড়াও আছে আজান এবং এক্কামত। অল্প পানি দিয়ে হাতের কবজি পর্যন্ত এবং মুখ, ঘাড় ও পায়ের

পাও, ধুয়ে ফেলার নাম অজু করা। নবী মহম্মদ যেভাবে অজু করতেন আজও মুসলমানরা ঠিক একইভাবে অজু করে থাকেন। প্রথমে দু হাত তিনবার ধুয়ে ফেলা। তারপর তিনবার মুখ ধোয়া, ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার এবং বাঁ হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে ফেলা। এর পর ভিজে হাতটা মাথায় বুলিয়ে নেওয়া এবং গোড়ালি পর্যন্ত প্রথমে ডান পা ও পরে বাঁ পা ধুয়ে ফেলা (মুসলীম-৪৩৬)। ইসলামের জন্মস্থান আরবে পানীর বড়ই অভাব। আজও সেখানে পেট্রলের চাইতে পানীর দাম বেশী। তাই সেখানে অল্প পানি দিয়ে অজু করার এই রীতি চালু হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আমাদের দেশের মুসলমানরাও অল্প জল দিয়ে অজু করাকে ধর্মীয় রীতি হিসাবে অনুকরণ করে চলেছেন।

যেখানে অজু করার মত সামান্য জলও পাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে মাটি দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নেওয়াকে তায়াম্মুম বলে। আরবে গোসল বা স্নান করা বিলাসিতা। তাই সপ্তাহে মাত্র একদিন, জুমআ বা শুক্রবার দুপুরের নামাজের আগে গোসল করে পাক সাফ হওয়া ফরজ। গোসল, অজু অথবা তায়াম্মুম, যা করেই হোক না, শরীরকে শুদ্ধ করে না নিলে আল্লা নামাজ কবুল করেন না। কিছু কিছু অপবিত্রতা বা জুনুব-এর পরেও গোসল করে পাক সাফ হওয়া ফরজ - যেমন স্ত্রী সহবাস বা জিমা, স্বপ্নস্খলন বা ইতিলাম, মেয়েদের ঋতুকাল বা হায়েজ এবং প্রসব বা নিফাস। ঘুম থেকে উঠে তিনবার নাক ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলাও ফরজ কারণ ঘুমালে শয়তান নাকের ভিতর আশ্রয় নেয়।

আজান কথার অর্থ হল নামাজের জন্য আহ্বান। নামাজের আগে মসজিদ থেকে এই আজান দেওয়া হয় এবং যিনি আজান দেন তাঁকে মুয়াজ্জীন বলে। আজকাল মাইকের দৌলতে এই আজান শুনতে আমরা অভ্যস্থ হয়েছি কিন্তু আরবী ভাষায় কি বলে বুঝতে পারি না। তাই আজানের কথা ও তার বাংলা অর্থ তুলে দেওয়া হল।

(১) ''আল্লাহু আকবর'' (৪বার), অর্থ আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(২) '' আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লা'' (২ বার), অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

(৩) ''আশহাদু আল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা'' (২ বার), অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহম্মদ আল্লার রসুল।

(৪) ''হাইয়া আ' লাস্‌সালাহ্‌'' (২ বার), অর্থ নামাজের জন্য এসো।

(৫) ''হাইয়া আ' লালফালা'' (২ বার), অর্থ মঙ্গলের জন্য এসো।

(৬) ''আল্লাহু আকবর'' (২ বার)।

(৭) ''লা ইলাহা ইল্লাল্লা'' (১বার), অর্থ আল্লাই একমাত্র উপাস্য।

৬২২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ যখন মদিনায় এলেন তখন সেখানে মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। তাই নামাজের জন্য তাদের আহ্বান করার প্রয়োজন হত না। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকল তখন নামাজের সময় ঘোষণা করা জরুরী হয়ে পড়ল। কেউ খ্রীস্টানদের মত ঘণ্টা বাজাবার কথা বলল, কেউ ইহুদীদের মত শিঙা বাজাবার কথা বলল, আবার কেউ বা পারস্যের অগ্নি উপাসকদের মত আগুন জ্বালাবার পরামর্শ দিল। কিন্তু নবী মহম্মদ কাউকে নকল করা পছন্দ করলেন না এবং মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ নূতন, আজান দেওয়ার প্রথা চালু করলেন। বিলাল নামে মহম্মদের একজন কাফরী অনুচর ছিল যে খুব জোরে চিৎকার করতে পারত। প্রথম জীবনে বিলাল উমাইয়া বিন খালাল নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিল। মুসলমান হবার জন্য কোরেশরা যখন তার উপর অত্যাচার শুরু করল তখন মহম্মদের ধনী বন্ধু আবু বকর তাকে কিনে মুক্ত করেন ও মদিনায় নিয়ে আসেন। মহম্মদ এই বিলালকে আজান দেবার কাজে নিযুক্ত করলেন এবং সেই হিসাবে বিলাল হলেন মুসলীম জগতের প্রথম মুয়াজ্জীন।

আজান শুনলে প্রত্যেক মুসলমানকে তার জবাব দিতে হয়। মনে মনে বলতে হয় যে, আল্লা যেন মহম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গকে স্বর্গের ওয়াসিলা নামক শ্রেষ্ঠ স্থানে জায়গা করে দেন (মুসলীম- ৭৪৭,৮০৭,৮০৮)। যে বান্দা আজান শুনে আল্লাকে তার উপাস্য, মহম্মদকে তার রসুল ও ইসলামকে তার দ্বীন (ধর্ম) ভেবে খুশী হয়, আল্লা তার সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। আজানের শব্দ কানে গেলে মসজিদের নামাজে যোগ দেওয়া সব মুসলমানের ফরজ। নামাজের জন্য লোক ডাকা ছাড়াও আজানের আরও কিছু কিছু উপকারিতা আছে। আজান শুনলে শয়তান সেখান থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যায়। মহম্মদ বলতেন যে, মদিনায় আজান দিলে শয়তান সেখান থেকে ৩৬ মাইল দূরে রহুয়ায় পালিয়ে যায়। মহম্মদের জীবিত কালে আজানের আরও একটা উপকারিতা ছিল। তিনি যখন কোন কাফের জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করতেন তখন তা খুব ভোর বেলায় করতেন। সেই সময় দূর থেকে যদি ফজরের আজান ভেসে আসত তাহলে নবী বুঝতে পারতেন যে, সেখানকার সবাই কাফের নয় এবং তাই আর আক্রমণ করতেন না (ঐ -৭৪৫)।

সবাই মসজিদে এসে গেলে এক্কামত পাঠ হয়। এক্কামত আর কিছুই নয়, আজানে যা বলা হয় এতেও তাই বলা হয়, শুধু "হাইয়া আ' লাসসালাহ্" র বদলে "কাদকা মাতিছ সালাহ্", বা নিশ্চয়ই নামাজ আরম্ভ হল, বলতে হয়। তবে আজানের মত অত উচ্চ স্বরে না বলে এক্কামত অনেক আস্তে বলা হয়।

কথিত আছে যে, ৬২১ খ্রীস্টাব্দের রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাতায়লা ফেরেস্তা জিব্রাইলকে মহম্মদের কাছে পাঠান এবং তিনি নবীকে বোরাক নামক এক দ্রুতগতি বাহনে করে সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করিয়ে আল্লার কাছে নিয়ে যান।

বোরাক হল গাধার থেকে বড় কিন্তু খচ্চরের থেকে ছোট এক স্বর্গীয় জন্তু বিশেষ। মুসলমানদের মতে সমস্ত নবীগণের মধ্যে একমাত্র মহম্মদই ফেরেস্তা জিব্রাইলকে স্বচক্ষে এবং স্বরূপে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাও একবার নয়, দুবার। প্রথম তিনি জিব্রাইলকে দেখেন যেদিন কোরান প্রথম নাযেল (অবতীর্ণ) হয় সেদিন। দ্বিতীয়বার তিনি জিব্রাইলকে দেখেন এই মেরাজ বা স্বর্গ ভ্রমণের দিন। ঐ দিন মহম্মদ, একখানি ধনুক যতখানি দীর্ঘ, আল্লার ততখানি কাছে যান (অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা স্থাপিত হয়)। মুসলমানদের মতে সেদিন তিনি আল্লার দর্শন লাভ করেন। এই দিনই আল্লা বিশ্বাসীদের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।

কথিত আছে যে, আল্লা প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন এবং স্বর্গ থেকে ফেরার পথে মহম্মদ যখন চতুর্থ স্বর্গে পূর্ববর্তী নবী হজরৎ মুসার (Moses) সঙ্গে দেখা করেন তখন মুসা বলেন যে, বিশ্বাসীদের পক্ষে দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা খুবই কঠিন কাজ হবে। তাই তিনি মহম্মদকে আল্লার কাছে ফিরে যেতে এবং নামাজের ওয়াক্ত কমাবার আর্জি পেশ করতে পরামর্শ দেন। আল্লার কাছে ফিরে গিয়ে মহম্মদ তাঁর অভিপ্রায় জানালে আল্লা প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চাইলেন না বরং বললেন যে, তাঁকে উপাসনা করাই তো মানুষের একমাত্র কাজ আর এই কাজের জন্যই তো তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি নামাজের ওয়াক্ত কিছু কম করলেন। কিন্তু হজরৎ মুসা তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করলেন এবং মহম্মদকে আবার আল্লার কাছে পাঠালেন। এইভাবে তিনবার যাতায়াতের পর আল্লাতায়লা বিরক্ত হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলেন এবং বললেন যে, এই পাঁচেই পঞ্চাশের কাজ হবে।

এই থেকে অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে, আল্লা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন না বা মানুষের অনুরোধে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের হেরফের করেন। ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়। মহম্মদের অনুরোধে আল্লা শুধু এটুকুই করলেন যে, বিশ্বাসীদের এক নামাজকে দশ নামাজের সমান করে দিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের পাঁচ নামাজ আল্লার কাছে পঞ্চাশ নামাজই থাকল। মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করার মত তাঁর এই মেরাজ বা স্বর্গভ্রমণের ঘটনাও বিশ্বাসীদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, অন্যথায় সে কাফের হয়ে যাবে। যাইহোক, আল্লাতায়লা শেষ পর্যন্ত যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলেন তা হল—(১) ফজর, (২) যোহর, (৩) আসর, (৪) মাগ্‌রিব ও (৫) এশা।

ভোরবেলা চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে, অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, কিন্তু পুবের আকাশে তখনও লাল সূর্যের উদয় হয়নি, এই সময়টা ফজরের নামাজের সময়। সূর্য উঠে গেলে আর ফজরের নামাজ পড়া যাবে না। মধ্যাহ্নের সূর্য সবে পশ্চিমে

ঢলতে শুরু করেছে, তখন যোহরের সময়। বিকালের পড়ন্ত বেলায়, যখন আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবতে শুরু করবে, তখন আসরের সময়। সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু তখনও আলো আছে, সেই সময়টা মাগ্‌রিবের সময় এবং সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যে কোন সময় এশার ওয়াক্ত। উপরিউক্ত নামাজের সময়কালে কেউ যদি ঘুমে, বা ভুল বশত বা দরকারী কাজে আটকে যাবার দরুন সঠিক সময়ের মধ্যে নামাজ আদায় করতে না পারে তাহলে নামাজ কাজা হয়ে যায়। এই কাজা নামাজ যত শীঘ্র সম্ভব আদায় করে নেওয়া কর্তব্য। যে পর্যন্ত মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান থাকে ততক্ষণ যোহরের সময় হয় না। বিকালে মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের থেকে বড় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। সূর্যের লাল রঙ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগ্‌রিবের সময় হয় না এবং মধ্যরাত্র পার হয়ে গেলে এশার সময় শেষ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সব মুসলমানেরই ফরজ। এছাড়াও নামাজ পড়া যায় এবং তাকে নফল কিংবা সুন্নত নামাজ বলে। প্রকৃতপক্ষে ফরজ বহির্ভূত সমস্ত নামাজই নফল এবং স্বয়ং রসুলুল্লা যে যে সময় নফল- নামাজ আদায় করতেন সেগুলোই হল সুন্নতনামাজ। সুন্নত নামাজগুলোর মধ্যে পড়ে গভীর রাতের নামাজ ও শেষরাতে তাহাজ্জুদ-এর নামাজ। মহানবী তাঁর উম্মতদের তাহাজ্জুদ-এর নামাজ পড়তে বিশেষ করে উপদেশ দিতেন। ফজরের নামাজের ঠিক আগেই তাহাজ্জুদের সময়।

নামাজ একা একা বাড়ীতে অথবা মহল্লার মসজিদে কিংবা বড় বড় জামে মসজিদের জামাতের নামাজে অংশগ্রহণ করেও আদায় করা যায়। তবে আজানের শব্দ কানে গেলে সব বান্দারই মসজিদের নামাজে যোগ দেওয়া ফরজ। যে ব্যক্তি আজান শুনেও একা একা ঘরে নামাজ পড়ে আল্লা তার নামাজ কবুল করেন না। শারীরিক দিক থেকে অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আজান শুনে জামাতের নামাজে যোগ দেয় না, রসূলুল্লা তার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেবার কথা বলতেন। একা একা বাড়ীতে নামাজ পড়লে যে সওয়াব বা পুণ্য হয়, মহল্লার মসজিদে পড়লে তার ২৫ গুণ সওয়াব হয়, বড় জামে মসজিদে পড়লে তার ৫০০ গুণ , জেরুজালেমের মসজিদে আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দেসে পড়লে তার হাজার গুণ, মদিনার মসজিদ নব্‌বীতে পড়লে তার পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মক্কার কাবা শরীফ বা মসজিদুল হারামে পড়লে তার লক্ষ গুণ সওয়াব হয়।

গরীব মুসলমানের কাছে জামাতের নামাজ হজ স্বরূপ। জামাতের নামাজে সুন্দরভাবে সারিবেঁধে দাঁড়ানোটাও একটা সুন্নত এবং রসুলুল্লা এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। জামাতের নামাজের পর ইমাম বা নামাজ পরিচালক যে খুৎবা বা ধর্মীয় ভাষণ দেন তা শেষ না হলে নামাজের স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। একদিন

মদিনার মসজিদ নব্বীতে রসুলুল্লা যখন খুৎবা দিচ্ছিলেন তখন সেখানে এক ফেরিওয়ালা এসে হাজির হয় এবং উম্মতরা খুৎবা ছেড়ে ফেরিওয়ালার কাছে ভীড় করে। এইজন্য আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে তাদের তিরস্কার করেন (৬২/১১)। রসুলুল্লা যখন খুৎবা দেবার জন্য মিম্বারে (খুৎবা দেবার বিশেষ আসনে) উঠতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠতো, গলা চড়ে যেত এবং ক্রোধ বেড়ে যেত- যেন শত্রুর বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করছেন (মুসলীম -১৮৮৫)।

একদিন খুৎবা দিতে উঠে রসূলুল্লা হঠাৎ চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, "তুই চলে যা, তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। তোর কাছ থেকে আমি আল্লার আশ্রয় নিচ্ছি।" পরে সবাই যখন তাঁর এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন যে, শয়তান ইবলিস আগুন নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল। তিনি তাকে একরকম ধরেই ফেলেছিলেন, কিন্তু পূর্ববর্তী নবী সুলেমান (Solomon) এসে বাধা দেওয়ায় তিনি নিজেকে সংযত করেছেন। তা না হলে তিনি অবশ্যই সেদিন শয়তানকে বন্দী করতেন এবং মদিনার বাচ্চাদের খেলার বস্তুতে পরিণত করতেন (ঐ-১১০৬)।

নামাজের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল জুমআ বা শুক্রবারের জামাতের নামাজ। ইসলামে শুক্রবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জুমআর দিনই আল্লা হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে স্বর্গে প্রবেশ করান। এই জুমআর দিনই তিনি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন এবং এই দিনই ইন্তেকাল (মৃত্যুবরণ) করেন। এই দিনই মহানবী হিজরৎ করে মদিনাতুন্নবী বা নবীর নগরী মদিনায় উপস্থিত হন। এই দিন এমন একটা মুহূর্তআছে যে সময় যে কোন বান্দা আল্লার কাছে (হারাম বস্তু ছাড়া) যা চাইবে তাই পাবে। সর্বোপরি এই জুমআর দিনই স্বর্গীয় শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং কেয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লা বনি ইস্রায়েলদের শনিবার এবং ঈশায়ীদের রবিবার দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের তিনি সবথেকে বেশী ভালবাসেন তাই তাঁর প্রিয় শুক্রবার তিনি তাদের দিয়েছেন। এইজন্য কেয়ামতের দিন মুসলমানরা সকলের আগে থাকবে এবং আল্লার কাছ থেকে বেশী করে রহমৎ বা দয়া পাবে। ঐ একই কারণে মুসলমানরা সকলের আগে জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে।

জুমআর দিন যোহরের আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। গোসল করে পাক সাফ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে, গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে জামাতের মসজিদে হাজির হতে হবে। মেয়েরা জামাতের নামাজে যোগ দিতেপারে তবে তারা সুগন্ধি লাগাতে পারবে না। ছেলেদের পিছনে তাদের দাঁড়াতে হবে এবং সিজদার পর ছেলেদের আগে মাথা তুলতে হবে, যাতে ছেলেদের মাথা তোলার আগে বেশবাস

ঠিক করে নেবার সুযোগ পায়। কুমারী ও পর্দানসীন মেয়েদের জামাতের নামাজে যোগ দেওয়া নিষেধ এবং ঋতুকালে কোন মসজিদেই তারা ঢুকতে পারবে না। মেয়েদের পক্ষে ঘরে বসে নামাজ আদায় করে নেওয়াই ভাল।

যে বান্দা জুমআর দিন পাক সাফ হয়ে সবার আগে মসজিদে হাজির হয়, সে একটা উট কোরবানীর সোয়াব পায়। তারপর যে বান্দা হাজির হয় সে একটা বকরা বা বাছুর কোরবানীর সোয়াব পায়। তারপর যে বান্দা আসে সে একটা দুম্বা ও তারপর যে আসে সে একটা মোরগ কোরবানীর সোয়াব পায়। জুমআর দিন ইমাম যখন তাঁর খুৎবা পাঠ করেন তখন আল্লার জিকির শোনার জন্য ফেরেস্তারা সেখানে হাজির হন।

জুতো পরে নামাজে যোগ দেওয়া চলতে পারে। নামাজ আদায় করার সময় আকাশের দিকে তাকালে চোখ খুবলে নেওয়া হবে। বিনা কারণে খালি মাথায় নামাজ পড়া এবং নামাজের সময় আঙুল মটকানো, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখা, কুকুরের মত বসা বা মোরগের মত ঠকাঠক করে তাড়াতাড়ি করে সিজদা করা নিষেধ। না-পাক অবস্থায় বা না-পাক জায়গায় নামাজ পড়লে নামাজ মক্রুহ্ হয়ে যায়। কাপড়ে শুক্র লেগে থাকলে রসুলুল্লা শুধু সেটুক ধুয়েই নামাজে যোগ দিতে যেতেন, কাপড়ে তখন দাগ বোঝা যেত (মুসলীম-৫৭০)। খালি পেটে অথবা প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ চেপে নামাজ করলেও নামাজ দোষযুক্ত হয়। নামাজের সময় কোরান শরীফ হাতে নিয়ে পাঠ করাও নিষেধ। নামাজে দাঁড়িয়ে সামনে থুথু ফেলা নিষেধ, কারণ সামনে আল্লা আছেন। ডানদিকেও নিষেধ কারণ ডানদিকে সব পুণ্য জমা হয়। বাঁ দিকে কিংবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলা চলতে পারে কারণ বাঁ দিকে সব পাপ জমা হয়। কেউ নামাজ পড়ছে সেই সময় তার সামনে দিয়ে কেউ যাওয়া-আসা করলে তার খুব গোনাহ্ হয়। তবে নামাজী যদি কোন একটা জিনিস, অন্ততপক্ষে তার লাঠিটা সামনে রেখেও নামাজ করে তবে তার গোনাহ্ হবে না।

বয়স সাত বছর হলেই ছেলেকে নামাজ শিক্ষা দিতে হবে এবং সতের বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ঠিকমত নামাজ আদায় না করে তবে তাকে লাঠি দিয়ে পিটতে হবে এবং একলা ঘরে শুতে দিতে হবে। নেশা করে অথবা কাঁচা পেঁয়াজ রসুন খেয়ে নামাজে যোগ দেওয়া নিষেধ, কারণ ফেরেস্তারা কাঁচা পেঁয়াজ রসুনএর গন্ধ ভালবাসেন না। মেয়েদের জন্য জুমআর নামাজ ফরজ নয় এবং তাদের পক্ষে জামাতের নামাজে যোগ দেওয়া মক্রুহ্। তসবির বা ছবিঅলা জামা গায়ে দিয়ে নামাজে যোগ দেওয়া ভীষণভাবে নিষিদ্ধ।

মুসলমানদের পক্ষে জীবজন্তু, গাছপালা বা মানুষের ছবি এঁকে আল্লার সৃষ্টির নকল করতে যাওয়া ভীষণ অন্যায়। যারা এইসব করবে কেয়ামতের দিন আল্লা ঐ

সব ছবি তাদের সামনে উপস্থিত করে আদেশ দেবেন, " রুহ্ ফুঁকে এদের জীবিত কর"। তারা নিশ্চিতভাবেই তা পারবে না। তখন আল্লা বলবেন, " আমার সৃষ্টির নকল করে আল্লা হবার দুঃসাহস করেছিলে? যাও এবার নরকের আগুনে পুড়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" আঁকা তো দূরের কথা, আল্লার সৃষ্টির নকল করা কোন ছবি ঘরে রাখা বা তা দেখা কতখানি দোষের দু একটা উদাহরণ দিলে তা ভাল বোঝা যাবে। একবার বিবি আয়েশা পাখীর ছবিঅলা বালিশের ওয়াড় তৈরি করেন। রসুলুল্লা দরজার চৌকাঠ থেকে তা দেখতে পেয়ে ঘরে ঢুকতেই অস্বীকার করলেন। আগে আয়েশা ঐসব সরিয়ে ফেললেন তবে তিনি ঘরে ঢুকলেন (মুসলীম-৫২৫৫)।

ইয়মন প্রদেশের নাজরান নামক জায়গায় খ্রীস্টানদের বাস ছিল। মহম্মদ তাদের চিঠি দিলেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা জিজিয়া দাও। তখন তারা ভয় পেয়ে তিনজন পাদ্রীকে মদিনায় পাঠালো। মহম্মদকে খুশি করার জন্য তারা যে সব উপঢৌকন এনেছিল তার মধ্যে একটা কার্পেট ছিল। কিন্তু কার্পেটে ছবি থাকার জন্য মহম্মদ তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলেন [৭]। মহম্মদের কতিপয় অনুচর ঐ কার্পেটের প্রতি লোভ করেছিল বলে আল্লা তাদের জন্য নদী, সুরা ও পবিত্র সঙ্গিনী সমন্বিত স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করেন (৩/১৫)। নাজরানবাসীরা বছরে দু হাজার হুল্লা (বস্ত্র বিশেষ) এবং দু হাজার রৌপ্যমুদ্রা জিজিয়া দেবে বলে রফা হয়। চুক্তিপত্রে এও লেখা ছিল যে, এখন থেকে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির মালিক আল্লা ও তাঁর রসুল।

যাই হোক, ছবিতেই যখন এই অবস্থা তখন মূর্তির ক্ষেত্রে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়, কারণ সকলেই স্বীকার করবেন যে ছবির থেকে মূর্তিতে আল্লার সৃষ্টিকে অনেক বেশি নকল করা হয়। তাই ইসলামে মূর্তি শুধু ভাঙবার জন্য, গড়বার জন্য নয়। এই কারণেই মক্কা দখল করার পর কাবার অভ্যন্তরস্থ ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং সমস্ত আরব জুড়ে মূর্তি ভাঙার তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। সাফা ও মারোয়া পর্বতের উপর স্থাপিত আসাফ ও নয়লার মূর্তি ভাঙা হয় এবং মহম্মদ তাঁর কিছু অনুচরকে শাবল, কোদাল ও গাঁইতি সহ তায়েফে পাঠালেন সেখানকার বিশাল রাব্বা'র মূর্তি ভেঙে ফেলার জন্য। এই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দিল্লীর মুসলমান শাসকরা ভারতের হাজার হাজার মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করে এবং এই ঐতিহ্য কাশ্মীরে আজও বজায় আছে। গত ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনার পর বাংলাদেশে ৩৫০০ মন্দির ও তার মূর্তি ধ্বংস করা হয়।[৮]

---

(৭) কাবার পথে (২য় খণ্ড), আব্দুল আজিজ আল আমান (হরফ), পৃঃ ১৬৯।

(৮) লজ্জা, শ্রীমতী তসলিমা নাসরিণ (পার্ল পাবলিকেশন), পৃঃ ৫৬।

এতেকরে আল্লার সম্মান ও মর্যাদা হয়তো রক্ষা হল, কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য উঠে গেল। তাদের জন্য থাকল শুধু অলঙ্করণ করে আরবী ভাষায় কোরানের বাণী লেখার শিল্প, যাকে ক্যালিগ্রাফী বলে। আর থাকল মসজিদ তৈরি করার স্থাপত্য। এই সব মসজিদ অলঙ্করণ করতেও যে সব চিত্রকলার ব্যবহার হয় তাতে আল্লার সৃষ্টির অনুকরণ সযত্নে এড়িয়ে চলা হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলামে গান-বাজনা করাও নিষিদ্ধ।

মহম্মদের পূর্ববর্তী নবী হজরৎ লূৎ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের অভিযুক্ত করে এক জায়গায় বলেন যে, তারা সমকামিতা ছাড়াও অন্য অনেক অবৈধ কাজে লিপ্ত রয়েছে (২৯/২৯)। মুসলমান ভাষ্যকারদের মতে ঐ সব অবৈধ কাজের মধ্যে গালি দেওয়া, শিস দেওয়া, ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করা, মদ্যপান, মানী ব্যক্তিদের উপহাস করার সাথে গান-বাজনা করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। [৯] ইসলামী মতে গান-বাজনা করা শয়তানের কাজ এবং শুধু মাত্র একটা হাদিসে নবীকে এ ব্যাপারে একটু নরম মনোভাবাপন্ন দেখা যায়। হাদিসটি বলছে, কোন এক ঈদের দিন দুটি শিশু বিবি আয়েশার ঘরে গান করছিল। এমন সময় আবু বকর ও মহম্মদ ঘরে প্রবেশ করলে আবু বকর তাদের গান থামাতে বলেন এবং শয়তানের কাজ করছে বলে ধমক দেন। তখন মহম্মদ বলেন, "ওদের যা করছে করতে দাও"। পরক্ষণেই বিবি আয়েশা চোখের ঈশারায় তাদের চলে যেতে বলেন এবং তারা চলে যায় (মুসলীম- ১৯৩৮, ১৯৪২)। কাজেই মুসলমান সমাজের মধ্যে যারা আজ সঙ্গীত চর্চা করেন, তারা শরীয়ৎ উল্লঙ্ঘন করেই তা করে থাকেন। এই সমস্ত ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানুষকে সভ্যতার পথে অগ্রসব হতে সাহায্য করে, না প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা সুধী জনের বিচার্য। এই সব বিধিকে অনুসরণ করেই আফগানিস্তানের তালিবান সরকার সমস্ত রকম চারুকলার চর্চা সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট হবার পর আওরঙ্গজের ভারতে গান-বাজনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। [১০]

যাই হোক, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যে দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেন তাকে কিবলা বলে। মক্কার কাবা গৃহ মুসলমানদের কিবলা। মক্কা ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত, তাই আমাদের দেশের মুসলমানরা পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ আদায় করেন। মুসলীম ধর্মীয় জীবনে এই কিবলার ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিবলার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ তো বটেই, এমন কি, কিবলার দিকে পিছন ফিরে মলত্যাগ করাও মুসলমানদের বারণ। কেউ মারা গেলে দাফন করার সময়

---

(৯) কোরান শরীফ, শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ৫৬।

(১০) Sri R.C. Mojumdar, Advanced History of India (Macmillan) 1980, P. 594

লাশ উত্তর দিকে মাথা, দক্ষিণ দিকে পা রেখে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। এইভাবে শোয়াবার পরই দোয়া , দরুদ ও জানাজার নামাজ আদায় করতে হবে। কোরবাণীর ঈদের সময় যে পশু কোরবাণী করবে তাকেও কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং কোরবাণী করতে হবে। তবে কবরে জিয়ারত করার সময় কিবলাকে পিছনে এবং কবরকে সামনে রেখে দোয়া পাঠ করার নিয়ম। চলন্ত ট্রেনে, জাহাজে কিংবা স্টীমারে নামাজ পড়ার সময় নামাজীর কিবলা ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে নিয়ম হল, নামাজ শেষ হবার মুখে কিবলামুখী হয়ে তা শেষ করতে হবে।

ইসলামের শৈশবে জেরুজালেমের মসজিদ আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দেশ মুসলমানদের কিবলা ছিল। পরে মদিনা বাসকালে মহম্মদ মক্কার কাবাকে কিবলা করার জন্য আদিষ্ট হন (২/১৪৪)। কথিত আছে যে, মক্কায় থাকাকালীন মহম্মদ নামাজের সময় এমন ভাবে দাঁড়াতেন যাতে কাবা ও বায়তুল মোকাদ্দেশ একই দিকে থাকে। কিন্তু মদিনায় আসার পর তা আর সম্ভব হল না, কারণ মদিনার উত্তরে বায়তুল মোকাদ্দেশ ও দক্ষিণে কাবা। হিজরীর দ্বিতীয় বছরে রজব (মতান্তরে শাবান) মাসের ১৫ তারিখে, মদিনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কোবা নামক স্থানে সালামা গোত্রের লোকজনের সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সারতে মহম্মদ সেখানে যান। ইতিমধ্যে যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং মহম্মদ স্থানীয় একটি মহল্লার মসজিদে নামাজের ইমামতি শুরু করেন। নামাজ অর্ধেক হয়েছে, এমন সময় ফেরেস্তা জিব্রাইল কিবলা পরিবর্তনের প্রত্যাদেশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন (২/১৪৪)। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ তাঁর মুখ মক্কার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি নামাজীরাও মক্কার দিকে মুখ ঘোরালো। মহম্মদের এক নিকট অনুচর ওমর অনেকদিন আগেই মহম্মদকে কিবলা পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিল, যার মধ্যে মক্কার কোরেশদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রাজনীতি জড়িত ছিল। এই রকম আরও দুটো ব্যাপারে আল্লা ওমরের সিদ্ধান্তকে আয়াত অবতীর্ণ করে সমর্থন করেন। ওমর বদর যুদ্ধের বন্দীদের কতল করতে এবং মদিনার মুসলমান রমণীদের পর্দাবৃত করতে সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর এই দুটো সুপারিশই আল্লা কোরানের আয়াৎ অবতীর্ণ করে সমর্থন করেন।

নামাজের সময় জায়নামাজ বা নামাজের জায়গায় দু হাত দুপাশে ঝুলিয়ে, দুপায়ের মধ্যে দু ইঞ্চির মত ফাঁক রেখে শুদ্ধ মনে দাঁড়াতে হবে এবং মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে আল্লা তাকে দেখছেন। দাঁড়ানোটা অবশ্যই কিবলামুখী হবে। এরপর ঐভাবে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করতে হবে -" নিশ্চয়ই আমি আসমান-জমিন সৃষ্টিকারীর দিকে মুখ করলাম এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। " তারপর সেই ওয়াক্তের নামাজের জন্য নির্ধারিত নিয়ত বা সংকল্পবাক্য

পাঠ করতে হবে। যেমন ফজরের নামাজের নিয়ত হল, আমি আল্লার উদ্দেশে কাবামুখী হয়ে ফজরের দু রাকাত নামাজের সংকল্প করছি। আল্লাহু আকবর।" তারপর আল্লাহু আকবর বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাঁ হাতের কবজির উপর খুব কষে ধরতে হবে। একে তাহ্‌রিমা বাঁধা বলে। এইভাবে নিম্নলিখিত দোয়া বা প্রার্থনা পাঠ করতে হবে " হে আল্লা, আমরা আপনারই গুণগান করছি, আপনার নামই কল্যাণপ্রদ, আপনার গৌরবই সর্বাধিক এবং আপনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করতে হে আল্লা আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

এর পর "বিসমিল্লা রহমানির রহিম" বা পরম করুণাময় আল্লার নামে আরম্ভ করছি, এই বলে কোরান শরীফের প্রথম সুরা বা সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। পবিত্র কোরান শরীফ বা কালামপাকে মোট ১১৪ টি সুরা বা অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি সুরা কতকগুলি বাক্য বা আয়াতে বিভক্ত। সুরা ফাতিহা খুবই ছোট সুরা এবং এতে মাত্র সাতটি আয়াৎ আছে যার বাংলা অর্থ —"সমস্ত প্রশংসা নিখিল জগতের প্রতিপালক আল্লাতায়লারই জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময় ও পরম দয়ালু; বিচারের দিনের প্রভু। (হে আল্লা) আমরা কেবল আপনারই উপাসনা করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করুন, তাদের পথে যারা সৎপথ ও করুণাপ্রাপ্ত; তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।" এর পর অন্য আরেকটি সুরা বা পবিত্র কোরান শরীফের কমপক্ষে তিনটি আয়াত পাঠ করতে হবে।

তারপর মাথা নত করে, দুই হাতে দুই হাঁটু কষে ধরে, আল্লাহু আকবর বলে রুকু করতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা নীচু করে প্রণাম করাকে রুকু বলে। ঐ রুকু অবস্থায় বলতে হবে, " আমার মহান প্রতিপালক অতি পবিত্র এবং আল্লার প্রশংসা করলে তিনি তা শুনতে পান।" এই বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং তারপর আল্লাহু আকবর বলে সিজদা করতে হবে। সিজদা করতে করতে বলতে হবে "আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" এইভাবে আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে এবং সিজদা শেষে আল্লাহু আকবর বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে এক রাকাত নামাজ পূর্ণ হবে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে এই রকম সতের রাকাত নামাজ ফরজ। ফজরে ২ রাকাত, যোহরে ৪ রাকাত, আসরে ৪ রাকাত, মাগ্‌রিবে ৩ রাকাত এবং এশায় ৪ রাকাত। জুমআর দিনে যোহরের ৪ রাকাতের বদলে জুমআর ২ রাকাত ফরজ এবং এই কারণে ঐ দিন ১৭ রাকাতের বদলে ১৫ রাকাত ফরজ। এর পর নামাজীরা আল্লার কাছে নিজ নিজ দোয়া ও মোনাজাত পেশ করেন। এই সব দোয়া ও মোনাজাত বান্দার মাতৃভাষাতেও করতে পারে। তবে যে পবিত্র ভাষায় কোরান শরীফ নাযেল

(অবতীর্ণ) হয়েছে, যে পবিত্র ভাষায় স্বয়ং রসুলুল্লা দোয়া মোনাজাত করতেন, সেই পবিত্র আরবী ভাষায় করাটাই মোস্তাহাব বা ভাল।

এরপর মুয়াজ্জীন খুৎবার আজান দেবেন এবং ইমাম তাঁর খুৎবা দেবেন। অনেকের ধারণা থাকতে পারে যে, যেহেতু এই খুৎবা এক ধর্মস্থান থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং তা একজন ধার্মিক ব্যক্তি বা ইমাম দিচ্ছেন, তাই তা নিশ্চয়ই প্রেম, মৈত্রী ও আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। সেই কারণে সর্বাপেক্ষা খুশির ও প্রেম মৈত্রীর উৎসব বলে পরিচিত "ঈদুল ফিৎর"-এর পবিত্র ছানি খুৎবার অংশ বিশেষ নীচে দেওয়া গেল। "........ হে আল্লা, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন, আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদের সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। হে আল্লা, যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে তার রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন। তিনি রাজার পুত্র হউন কিংবা খাকান পুত্র খাকান হউন, স্থল বা নদীভাগের অধিকর্তা হোন, কিংবা দুই সাগরের মালিক হোন - তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনার সেবক হোন, কিংবা আল্লার পথে জেহাদ ও সংগ্রামকারী হোন, তিনি যদি মুসলীম রাজা হ'ন আল্লা তাঁর রাজ্য ও অধিকৃত সাম্রাজ্যকে চির অক্ষয় রাখুন। .... তাঁরই তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী ও অবাধ্যদের (কাফেরদের) মস্তকচ্ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। .... হে আল্লা আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদাআতী মোশরেকদের। হে আল্লা, তাদের দল ও সংঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিন। হে আল্লা, তাদের ঐক্যের মধ্যে মতানৈক্য আনয়ন করুন। হে আল্লা, তাদের দেশসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন। ....." [১১]। কাজেই যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্ম সমন্বয়কারী হিন্দুরা ঈদের দিন মুসলমানদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, আশা করা যায় যে, এই খুৎবা পড়ার পর তারা আর ততখানি উৎসাহ বোধ করবেন না। খুৎবা শেষ হলে মুয়াজ্জীন আল্লাহু আকবর বলে নামাজের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে জামাতের নামাজ শেষ হবে।

কোন মহিলা কোন দিন কোন জামাতের নামাজে ইমামতি করতে পারবেন না। কোন বজ্জাৎ (জারজ) ব্যক্তি ইমামতি করার অযোগ্য। ইসলাম ধর্ম ও তার হকিকৎ, শরীয়ৎ ইত্যাদি ব্যাপারে আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তিই ইমামতি করার যোগ্য। নামাজের সময় সর্বদা ইমামকে অনুসরণ করতে হবে; সে সিজদা করলে সিজদা করতে হবে, সে রুকু করলে রুকু করতে হবে। যে ব্যক্তি ইমামের আগেই সিজদা থেকে মাথা তোলে আল্লা তার মাথা গাধার মাথা করে দেন। আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেবার সময়ও ইমামের গলার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে, তার চেয়ে জোরে চীৎকার করা যাবে না। প্রয়োজনবোধে ইমাম তাঁর পছন্দমত ব্যক্তিকে ইমামতি

---

(১১) মুসলীম পঞ্জিকা (১৪০০ বঙ্গাব্দ), হরফ, পৃঃ ১৬৯।

করতে বলতে পারেন। জীবনের শেষ কয়েকদিন রসুলুল্লা অসুস্থ হলে আবু বকর তার বদলে মদিনার মসজিদ নব্বীর নামাজে ইমামতি করেছিলেন। তিনজন ব্যক্তি নামাজের জন্য একত্র হলেই তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমামতি করতে হবে। এ ছাড়াও নামাজের আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে যা বাহুল্যবোধে বর্জিত হল।

তৃতীয় স্তম্ভ রোজা

আরবী বারমাসের নাম যথাক্রমে, মহরম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমজান, শওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ। নবম মাস রমজানে রোজা পালন করা হয়। রমজান মাস পবিত্র কারণ এ মাসে মানুষের দিশারী, সৎপথের নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী বা ফোরকান রূপে আসমানী কেতাব কোরান শরীফ নাযেল হয়েছে। আল্লাতায়লার ইচ্ছা ছিল যে, যে রাতে কোরান নাযেল হয়েছে সেই পবিত্র সবে কদর-এর রাত মানুষের কাছে গোপন থাকুক। তাই রমজান মাসের ঠিক কত তারিখে কোরান নাযেল হয়েছিল তা আল্লার রসুল ভুলে যান। তিনি শুধু এটুকু মনে করতে সক্ষম হন যে, রমজান মাসের শেষ দশদিনের কোন বেজোড় তারিখে সবে কদর হয়েছিল।

এই কারণে মুসলমানদের মধ্যে রমজান মাসের শেষ দশদিন শুদ্ধ অবস্থায় মসজিদে কাটানোর রীতি আছে। একে এতেক্কাফ বলে। আল্লার রসুল জীবনের শেষ বছর বিশদিন এতেক্কাফে কাটান। এতেক্কাফকারীর সুন্নত হল, সে জানাজা নামাজে বা মৃতের জন্য কল্যাণ কামনার নামাজে অংশ গ্রহণ করবে না, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের বাইরে যাবে না এবং কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না। রসুলুল্লা যে মস্‌জিদে এতেক্কাফ করতেন সেখান থেকে বিবি আয়েশার ঘর দেখা যেত এবং তিনি ঐ কদিন বিবি আয়েশাকে জানালা খুলে রাখতে বলতেন (মুসলীম -৫৮৪)। রোজাদার ছাড়া কেউ এতেক্কাফ করতে পারে না এবং জামে মসজিদ ছাড়া এতেক্কাফ হয় না।

রমজান মাসের পুরো একমাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, রোগী ও মুসাফির (পর্যটক) ব্যতীত সকল মুসলমানের রোজা রাখা বা পানাহার পরিত্যাগ করা ফরজ। রমজানের আক্ষরিক অর্থ হল পুড়িয়ে ফেলা। একমাস ব্যাপী উপবাসের দ্বারা মুসলমানরা তাদের পাপ ও অকল্যাণ পুড়িয়ে ফেলে। রোজা সংযম শিক্ষা দেয়, এই কারণে এর আর এক নাম সিয়াম বা সংযম। তবে এক নাগাড়ে উপবাস বা সিয়াম এ ওয়াসিলা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহম্মদ দয়া করে তাঁর উম্মতদের জন্য কষ্টকর সিয়াম এ ওয়াসিলা নিষিদ্ধ করে গেছেন। কেউ অসুস্থ হবার ফলে বা প্রবাসে যাবার ফলে রোজা বিঘ্নিত হলে অন্য সময় রোজা রেখে তা পূরণ করে

নেওয়া চলতে পারে। যার পক্ষে রোজা রাখা দুঃসাধ্য তাকে প্রতিদিন একজন দরিদ্র (মুসলমান)-কে অন্ন দান করতে হবে। স্বামীর যত্নের জন্য আল্লা স্ত্রীর রোজা মাফ করেছেন। পাছে রসুলুল্লার অযত্ন হয় এই কারণে তাঁর নয়জন পত্নী ও চারজন দাসী রক্ষিতার কেউ রোজা রাখতেন না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন রমণীর পক্ষে রোজা রাখা বা কোন মাহারাম ব্যক্তিকেও ঘরে প্রবেশ করানো উচিত নয়। খুবই নিকট আত্মীয়, যাদের সঙ্গে বিবাহ কোরান দ্বারা অবৈধ এবং যাদের সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই, সেই সব পুরুষকে মাহারাম বলে।

ইসলামের আগে, জাহেলিয়াৎ বা অন্ধকারময় অজ্ঞতার যুগেও আরবের লোকেরা রমজান মাসে রোজা পালন করতো এবং ঐ মাসে কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা রক্তপাত করতো না। নবী মহম্মদের পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব পুরো রমজান মাস হেরা পর্বতের এক গুহায় জপতপের মধ্যে কাটাতেন। তখনকার দিনে আরবের লোকেরা ঐ একমাস স্ত্রী-সংসর্গও বর্জন করতো। ইসলামের আমলে আল্লা কোরান শরীফের আয়াৎ অবতীর্ণ করে স্ত্রী-সংসর্গ বৈধ ঘোষণা করেন (২/১৮৭)। তবে দিনের বেলায় উপবাসের সময় তা অবৈধই থাকল। এই সময় দিনের বেলায় স্ত্রী-সংসর্গ করলে তার প্রায়শ্চিত্য হল, হয় একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়া, নতুবা দু মাসের রোজা রাখা, নতুবা ষাটজন গরীব (মুসলমান)-কে খাওয়ানো।

আরবে চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বছর গণনা করা হয়। তাই অমাবস্যার পরদিন, অর্থাৎ শুক্লা প্রতিপদে নতুন মাস শুরু হয়। এই কারণে রোজার নিয়ম হল, রমজান মাসে প্রথম চাঁদ দেখার আগে রোজা রাখতে নেই এবং শওয়াল মাসের প্রথম চাঁদ দেখার আগে তা বন্ধ করতে নেই। যদি শওয়াল মাসের প্রথম দিনের চাঁদ দেখা না যায় তবে আরও একদিন বেশী রোজা রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বছর গণনার ফলে আরবের মাস কখনও ২৯ দিনের কম এবং ৩০ দিনের বেশী হয় না। এবং ৩৬৫ দিনে বছর না হয়ে ১০ দিন কম বা ৩৫৫ দিনে বছর হয়। এই কারণে সমস্ত ইসলামী উৎসবই প্রতি বছর ১০ দিন করে এগিয়ে আসে এবং ৩ বছরে ১ মাস এগিয়ে আসে। ফলে কোন বছর যদি গরম কালে ঈদ হয় তবে ১০ বছর পরে তা প্রায় ৩ মাস এগিয়ে আসবে এবং শীতকালে ঈদ হবে।

লুঠপাট করে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ধনসম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকার করাকে জিহাদ বলে এবং এই জিহাদের সময় আল্লা রোজা মাফ করে দিয়েছেন। রমজান মাসে মুসলমানদের সঙ্গে পৌত্তলিক কোরেশদের বদর যুদ্ধ হয়। রোজা রাখা দুর্বল লোকজন দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই মহম্মদ প্রথমে রোজা ভাঙেন এবং উম্মতদেরও তাই করতে বলেন। তবে জিহাদের সময় যে বান্দা একদিন রোজা রাখবে আল্লা একদিনের জন্য তার কাছ থেকে নরকের আগুনকে ৭০ বছর দূরে

রাখবেন। অর্থাৎ ৭০ বছর ক্রমাগত হেঁটে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, ঠিক ততটা দূরে রাখবেন।

হিজরীর ২য় বছরের ১৮ই রমজান, মদিনা থেকে ৩০ মাইল ও মক্কা থেকে ১২০ মাইল দূরে বদর নামক প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয় তাই বদর যুদ্ধ নামে খ্যাত। ঐতিহাসিকদের মতে পলাশীর যুদ্ধ বা ওয়াটারলুর যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধ ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর কয়েকদিন আগে মহম্মদ ৩১৩ জন মুসলমান, ৭০ টি উট ও ২টি ঘোড়ার এক বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ান নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সীরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তণকারী এক বাণিজ্য কাফেলাকে মাঝপথে লুঠপাট করা। কিন্তু মহম্মদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে বাণিজ্য কাফেলা অন্যপথে মক্কায় চলে যায় এবং মক্কা থেকে ১০০০ সৈন্য, ৭০ (মতান্তরে২০০) ঘোড়া ও অসংখ্য উট সহ এক বিশাল কোরেশ বাহিনী এসে মহম্মদের গতি রোধ করে। কিন্তু মুসলমানবাহিনী আশ্চর্যজনকভাবে এই অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে। কোরেশবাহিনী জয় নিশ্চিত মনে করে তেমন গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধ না করার ফলেই তাদের পরাজয় হয়। যদি কোরেশবাহিনী বদর যুদ্ধে জয়লাভ করতো তবে সেই দিনই দুনিয়া থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অপর দিকে বদর যুদ্ধে জয়লাভ মুসলমানদের কাছে একটা চিরন্তন প্রেরণা হয়ে আছে। এই বদর যুদ্ধের আস্বাভাবিক সাফল্যকে স্মরণ করেই আমাদের দেশের মুসলমান মাঝি মাল্লারা বদর বদর বলে নৌকা ছাড়ে। ওমর এই বদর যুদ্ধের বন্দীদেরই কোৎল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা পরে আল্লা সমর্থন করেন।

ঊষার কিছু পূর্বে খেয়ে নেওয়া এবং দিনের শেষে কিছু খেয়ে নিয়ে এফতার বা উপবাস ভঙ্গ করা আল্লা পছন্দ করেন। ইহুদী ও খ্রীস্টানরা উপবাসের সময় অনেকরাত থাকতে খায় এবং আকাশে তারা দেখা না গেলে এফতার করে না। কিন্তু মুসলমানদের সে রকম করা নিষেধ। অনেক সময় নবীর এমন হত যে, স্ত্রী-সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থাতেই ভোর হয়ে যেত। তখন তিনি আর খাবার সময় পেতেন না। গোসল করেই রোজা রাখতেন। রোজার মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী-গমন অবৈধ হলেও চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি বৈধ। নবী রোজা অবস্থায় স্বীয় পত্নীদের চুম্বন করতেন। রোজার সময় থুথু গিলে ফেলাও নিষেধ, তবে ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেললে রোজা নষ্ট হয় না।

রমজান মাসে আল্লার আদেশে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখ বা নরকের সব দরজা বন্ধ রাখা হয়। এই মাসে শয়তান শৃঙ্খলিত থাকে, অর্থাৎ শয়তানের দ্বারা কুপথে চালিত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জান্নাতে আটটি দরজার মধ্যে একটির নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন ঐ দরজা শুধু রোজাদারদের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং ফেরেস্তারা ডাক দেবেন, "প্রিয়

রোজাদারেরা কোথায় ?" তখন রোজাদারেরা উঠে দাঁড়াবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না এবং রোজাদারেরা ঢুকে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা বা অন্যান্য কুকর্ম ত্যাগ না করে পানাহার ত্যাগ করে রোজা রাখে, আল্লা তার কোন খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। যে ব্যক্তি রোগ, ব্যাধি বা অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া একদিনও রোজা বন্ধ করে, সারা জীবন রোজা রাখলেও তার সে ক্ষতি পূরণ হয় না। আল্লা গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদাত্রী জননীর জন্য রোজা মাফ করেছেন এবং মুসাফির (প্রবাসী)-দের জন্য নামাজের অর্ধেক ও রোজা পুরো মাফ করেছেন। বাসস্থান থেকে কমপক্ষে ৩০ মাইল দূরে না গেলে কোন ব্যক্তি মুসাফির বলে গণ্য হবে না। আল্লা বলেন, "রোজা আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব, কারণ বান্দা আমার জন্যই তার প্রবৃত্তিকে দমন করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।" রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লার কাছে মৃগনাভির থেকেও উৎকৃষ্ট। মিশর থেকে চলে আসার পর এবং দশ প্রত্যাদেশ (Ten commandments) অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে আল্লা পূর্ববর্তী নবী হজরৎ মুসাকে ২০ দিন রোজা রাখতে বলেন এবং ২০ দিন রোজা রাখার পর মুসা মুখ ধুয়ে ফেলেন। এতে ফেরেস্তারা হায় হায় করে ওঠে এবং বলে "এ আপনি কি করলেন ? অপনার মুখে মৃগনাভির গন্ধ হয়েছিল তা নষ্ট করে ফেললেন!" এই কারণে মুসাকে আরও ১০ দিন অতিরিক্ত রোজা রাখতে হয়।

রমজানের রোজা ছাড়াও ১০ই মহরম ইহুদীদের উৎসব আসু'র দিনেও মুসলমানদের উপবাস করার রীতি আছে। ইসলামের আগে আরও কিছু কিছু দিনে উপবাস করার রেওয়াজ আরবের লোকদের মধ্যে ছিল। তবে ইসলামী মতে এই সব উপবাস করলেও চলে, না করলেও চলে। একবার আসুরের দিনে মহম্মদ বিবি আয়েশার কাছ থেকে খাবার চেয়ে খান এবং বলেন যে, এই সব উপবাস হল সদ্‌কা (ভিক্ষা)'র জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখার মত। পরে সেটা ভিক্ষা দেওয়াতেও খরচ করা চলে আবার নিজের জন্য খরচ করাও চলে (মুসলীম-২৫৭৩)। ঈদের দিন কোন মুসলমানের পক্ষেই রোজা রাখা উচিত নয়।

চতুর্থ স্তম্ভ জাকাত

আরবী জাকাত শব্দের অর্থ শুদ্ধিকরণ। আয়ের ৪০ ভাগের ১ ভাগ দরিদ্রদের জন্য জাকাত হিসাবে দান করে প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানের শুদ্ধ হওয়া ফরজ (৯২/১৮-২১)। কাজেই এটা অনেকটা আজকের আয়করের সমতুল্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য রসুলুল্লা দরিদ্র মুসলমানগণকে ধনীদের পাপ মোচন

কারী রুমাল রূপে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লার দেওয়া ধন থেকে জাকাত দেয় না, পরলোকে ঐ ধন বিষধর সাপের আকার ধারণ করে দু গাছা মালার মতন তার গলা বেষ্টন করবে। অথবা কেয়ামতের দিন ঐ অভিশপ্ত ধনসম্পদ কেশহীন সাপের আকার ধারণ করে তার মালিককে অনুসরণ করবে এবং দংশন করবে। সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার মালিক হয়েও যে ব্যক্তি ন্যায্য জাকাত দেয় না, কেয়ামতের দিন তার জন্য অগ্নি শলাকা থাকবে। ঐ শলাকা দোজখের আগুনে পুড়িয়ে তার কপালে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। বিচার যতদিন শেষ না হবে ততদিন এই শাস্তি চলতে থাকবে এবং তখনকার একদিন হবে আজকের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যে ন্যায্য জাকাত দেয় না তার ধন বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পায়।

শাক-সবজি ও তরিতরকারী, পাঁচ ওসক (২৮ মণ বা ১০৩৬ কেজি)-এর কম শস্য, ভারবাহী পশু, ঘোড়া, গাধা ও ক্রীতদাসের জন্য কোন জাকাত নেই। যে সব জমি বৃষ্টি, ঝরণা বা নদী-নালার জল দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সিঞ্চিত হয়, তার উৎপন্ন শস্যের (অবশ্যই ৫ ওসকের বেশী হলে) এক-দশমাংশ জাকাত দিতে হবে। যার আয় পাঁচ উকিয়া (সাড়ে ৫২ তোলা) রূপা, পাঁচটি উট বা পাঁচ ওসক শস্যের কম, তার কোন জাকাত নেই। এক বছর পার না হলে কারও সঞ্চিত ধনের উপর জাকাত ধার্য হবে না। জাকাত ব্যতীত আল্লা ঈমান ও নামাজ কবুল করেন না। জাকাত দেওয়ার মধ্যেই ইসলামের পরিপূর্ণতা ও পাপের পরিত্রাণ। কোন বান্দা রোজা পালন করলে বেহেস্তের পথের এক-তৃতীয়াংশ পার হয়, নামাজের দ্বারা সে বাকী এক-তৃতীয়াংশ পার হয় এবং জাকাত তাকে বাকী এক-তৃতীয়াংশ পার করে জান্নাতে পৌছে দেয়।

জাকাত সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হল তাতে এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে এটা অত্যন্ত মানবিক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য হল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে আনা। এই কারণে জাকাতের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত কিছুটা জানা আবশ্যক। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, এই জাকাত শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং দরিদ্রকে জাকাত দেওয়া বলতে শুধু দরিদ্র মুসলমানকেই দেওয়া বোঝায়। কাজেই এর মধ্যে বৃহত্তর বা উদার মানসিকতার কোন ব্যাপার নেই। এর সঙ্গে পাঠক কমিউনিস্টদের মানোভাবের মিল খুঁজে পাবেন। কারণ তাদের মতেও সব গরীবই গরীব নয়। যেই গরীব তাদের সমর্থক তারাই প্রকৃত গরীব। এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার দণ্ডকারণ্য থেকে আগত শত শত গৃহহীন উদ্বাস্তুকে মরিচঝাঁপিতে গুলি করে মেরে ফেলতে পেরেছিল।

মহম্মদ হিজরৎ করে মদিনায় আসার পর তাঁর যে সমস্ত উম্মত মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসে তাদের বলা হত মুহাজির বা উদ্বাস্তু। এদের প্রায় সকলেই ছিল

অত্যন্ত গরীব। মদিনার মুসলমানদের অনুগ্রহ ও দানের দ্বারাই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হত। মদিনার এইসব মুসলমানদের বলা হত অন্সার বা সাহায্যকারী। প্রথম দিকে এই সাহায্যের ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এবং এর জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতার ব্যাপার ছিল না। তখন এই সাহায্যের নাম ছিল সদ্কা বা দান। আজও মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই সদ্কার রীতি চালু আছে। সদ্কা হিসাবে সংগৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে সে ব্যাপারে আল্লা বলছেন, "সদ্কা (দান) কেবলমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য; যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য এবং দাসমুক্তি ও ঋণ-গ্রস্তের এবং আল্লার পথ ও পথিকের জন্য" (৯/৬০)।

অর্থাৎ সদ্কা হিসাবে সংগৃহীত অর্থের একটা অংশ ব্যয় হবে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য এবং যারা ঘুরে ঘুরে সদ্কা আদায় করে তাদের ভরণপোষণের জন্য। দ্বিতীয় অংশ ব্যয়িত হবে যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা দরকার তাদের জন্য। এই দলে দু রকমের লোক পড়ে। প্রথমতঃ, যারা এখনও মুসলমান হয়নি সেইসব গরীব লোকদের টাকার লোভ দেখিয়ে মুসলমান বানানোর জন্য। দ্বিতীয়তঃ, যারা সদ্য মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্যে যাদের ইসলাম ত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে, তাদের টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত রাখার জন্য। অনুগত মুসলমানদের না দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমানদের টাকা দেওয়ার উপর আল্লার রসুল বেশী জোর দিতেন এবং বলতেন যে, এদের একটু বেশী দেওয়া দরকার যাতে এরা আবার আগুনে (অর্থাৎ পুরাণো পৌত্তলিক ধর্মে) ফিরে না যায় (মুসলীম -২৩০০)।

উপরিউক্ত (৯/৬০) আয়াতের পরবর্তী অংশে মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা বাড়াবার পন্থা-পদ্ধতিগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ, কোন ক্রীতদাসকে তার মুক্তি পণ দিয়ে প্রভুর কাছ থেকে মুক্ত করে মুসলমান করা। দ্বিতীয়তঃ, কোন ঋণগ্রস্ত গরীব মানুষকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে মুসলমান করা। আল্লার পথে ও আল্লার পথের পথিকের জন্য সদকা ব্যয় করার অর্থ হল জিহাদ ও জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুহাজিরদের জন্য ব্যয় করা। আগেই বলা হয়েছে যে, জিহাদ বলতে বোঝায় লুঠতরাজ, দাঙ্গা, অতর্কিতে আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিধর্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করা। আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত (?) জিহাদের অর্থ ধর্মযুদ্ধ করেন এবং এ ধারণা ভুল। ইসলামের প্রসার ও সমৃদ্ধির পিছনে এই জিহাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই ঘোড়া সহ অন্যান্য উপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র, যা জিহাদের কাজে লাগে, তার পিছনে ব্যয়কেই আল্লার পথে ব্যয় বলা হয়েছে। কালে মদিনায় মহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের জোর বাড়লে এই ঐচ্ছিক সদ্কাই বাধ্যতামূলক জাকাতে রূপান্তরিত হয়।

সদ্কা সম্বন্ধে মহম্মদ বলতেন যে, যে ব্যক্তি গোপনে সদ্কা দেয়, এমনভাবে

দেয় যে ডান হাত জানে না যে বাঁ হাত কি করছে, আল্লা সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। সদ্‌কা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ কেয়ামতের আগে এমন একদিন আসবে যখন সদ্‌কা দেবার বা দান খয়রাৎ করার লোক পাওয়া যাবে না। আল্লার মহত্ত্ব কীর্তন করলেও তা সদকা বলে গণ্য করা চলে। এমন কি স্ত্রী-সহবাসকালে বীর্যপাতও এক ধরনের সদ্‌কা। মহম্মদ নিজে কখনও সদ্‌কা দিতেন না এবং বলতেন, ''সদ্‌কা আমাদের জন্য নয়'' (মুসলীম-২৩৪০)। একদিন বারিরা নামে এক মহিলাকে মহম্মদের এক স্ত্রী কিছুটা মাংস সদ্‌কা দেন। পরে বারিরা সেই মাংস মহম্মদকে উপহার দিতে চাইলে মহম্মদ জেনে বুঝেও তা গ্রহণ করলেন এবং বললেন, ''সদ্‌কা ওদের জন্য আর উপহার আমাদের জন্য'' (মুসলীম-২৩৫১)।

সদ্‌কা যখন বাধ্যতামূলক জাকাতে পরিণত হল তখন তা বেশীরভাগ আরববাসীর অসন্তোষের কারণ হল। বিশেষ করে মরুবাসী বেদুইনদের মধ্যে এই অসন্তোষ চরমে উঠল। কারণ তারা জাকাত দিত কিন্তু তার ফল ভোগ করার সুযোগ পেত না (৯/৯৮, ৯৯/১০১)। অর্থাৎ জাকাতের টাকায় যে জিহাদ হত তাতে তাদের যোগ দেবার সুযোগ না থাকায় তারা জিহাদের লুঠের মাল বা গনিমতের ভাগ পেত না। মহম্মদ মক্কাজয়ের পর জাকাত আদায়ের জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠালেন। তখন বনি তামিম গোষ্ঠীর কিছু লোক জাকাত দিতে অস্বীকার করল। মহম্মদ তখন ৫০ জন অশ্বারোহী-বিশিষ্ট একটা দলকে সেখানে পাঠালেন তাদের শায়েস্তা করার জন্য এবং তারা বনি তামিমের লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে এল। মহম্মদ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দিলেন বটে তবে এই ঘটনার ফলে জাকাত আদায় নির্বিঘ্ন হল। মহম্মদের মৃত্যুর পর জাকাতের প্রতি আরববাসীদের এই অসন্তোষ প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করল এবং তা বিদ্রোহের রূপ নিল। বহু লোক ইসলাম ত্যাগ করল। তখন খলিফা আবু বক্‌র ইয়েমেন থেকে মুসলমান নিয়ে এসে সেই বিদ্রোহ দমন করেন।

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে জাকাত দেবার জন্য মহম্মদ সবাইকে উপদেশ দিতেন, না দিলে নরকের ভয় দেখাতেন এবং বল প্রয়োগ করে তা আদায় করতেন, সেই মহম্মদ নিজে জাকাত দিতেন না এবং বলতেন যে তিনি ও তাঁর পরিবারের উপর জাকাত নেই (মুসলীম -২৩৪০)। তাঁর এই পরিবার বলতে বোঝাত চাচা আব্বাস ও হারিস এবং চাচাত ভাই আলি, আকিল ও জাফরের পরিবার ও তাদের বংশধরগণ। উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মহম্মদের চাচাতভাই আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি মহম্মদের চাচা আবু তালেব-এর পুত্র। এর সাথে মহম্মদ তাঁর কন্যা ফতেমার বিবাহ দেন। আট বছর বয়সে আলি মুসলমান হন। আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যা ইত্যাদি ব্যাপারে ইনি নবীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর ও ওসমানের পরে আলি ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলীম জগতের চতুর্থ খলিফা হন।

একবার মহম্মদ তাঁর অনুচর ওমরকে জাকাত সংগ্রহের কাজে লাগান। কিন্তু খালেদ বিন ওয়ালেদ নামে এক ব্যক্তি এবং মহম্মদের চাচা আব্বাস জাকাত দিতে অস্বীকার করলে ওমর মহম্মদকে তা জানালেন। যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে উপরিউক্ত খালেদ বিন ওয়ালেদও মহম্মদের প্রধান অনুচরদের একজন ছিলেন। পরবর্তী কালে খয়বর অভিযানের সময় ইনি দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হন এবং মক্কা বিজয়ের পর খালেদ নাখল নামক স্থানের বিখ্যাত আল উজ্জার মূর্তি ধ্বংস করেন। যাই হোক ওমরের অভিযোগ শোনার পর মহম্মদ বললেন, "খালেদের কাছে জাকাত চেয়ে তুমি অন্যায় করেছ কারণ সে আল্লার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মজুদ রাখে। আর আব্বাসের ব্যাপারটা আমি দেখছি। তবে স্মরণ রেখো যে, কোন ব্যক্তির কাছে তার চাচা পিতৃতুল্য (মুসলীম -২১৪৮)।

মহম্মদের মৃত্যুর অল্প কিছুকালের মধ্যেই জাকাত তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলল এবং গনিমত বা লুঠের মাল সে স্থান দখল করে নিল। এই লুঠের মাল কিভাবে বন্টন করা হবে আগে তার কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা কোরেশদের যে বিপুল সম্পদ দখল করল তা কিভাবে ভাগাভাগি হবে তা নিয়ে উম্মতদের মধ্যে বেশ অনিশ্চয়তা ছিল। অনেকে ভেবেছিল এবং মনে মনে আশা করেছিল যে এই লুঠের মালের যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে তারাই পাবে। এমন সময় আল্লা কোরানের বাণী (৮/১) অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে সমুদায় লুঠের মাল মালিক হলেন আল্লা ও তাঁর রসুল। এই বাণীর দ্বারা আল্লা এটাই সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, লুঠের মালের আসল মালিক হলেন আল্লার রসুল মহম্মদ। কাজেই তিনি যে ভাবে ইচ্ছা লুঠের মাল বন্টন করতে পারেন। এর পর আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন যে, লুঠের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লার রসূলের প্রাপ্য (৮/৪১) এবং সেই অনুসারে মহম্মদ এক-পঞ্চমাংশ নিজে রেখে বাকীটা উম্মতদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এই এক-পঞ্চমাংশকে বলে পবিত্র খুম। এর পর থেকে এই নিয়মই চলতে থাকল এবং লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ পবিত্র খুম হিসাবে নবী পেতে থাকলেন। এই পবিত্র খুম কিভাবে ব্যয় করবেন তা পুরোপুরি আল্লার রসুলের ইচ্ছাধীন। প্রথমতঃ তা থেকে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের খরচ খরচা চালাবেন এবং বাদবাকীটা নিম্নলিখিত চার ভাগে খরচ করবেন। (১) গরীব মুসলমানদের জাকাত দিতে, (২) অনুচরদের উপহার দিতে, (৩) বিধর্মী দরিদ্রদের টাকা দিয়ে মুসলমান করতে এবং বাকীটা আল্লার পথে। আল্লার পথে খরচ করা বলতে অস্ত্রশস্ত্র ও জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ কেনার খরচ বোঝায়। উপহার তিনি সেই সব অনুচরদের দিতেন যারা সদ্য মুসলমান হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনি বলতেন "যারা কিছুদিন আগেও অবিশ্বাসী

ছিল আমি মাঝে মাঝে তাদের উপহার দিই যাতে তারা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় (মুসলীম-২৩০৩)। অনেক সময় নবীর এই উপহার দেওয়া নিয়ে উম্মতদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হত। হুনাইন যুদ্ধের পর নবী সমস্ত ভাল ভাল ও দামী গনিমতের মাল নতুন মুসলমান হয়েছে এরকম কোরেশ নেতা ও বেদুইন দলপতিদের দিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে ছিল ইসলাম ও মহম্মদের চির শত্রু আবু সুফিয়ান। পরে মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ান মহম্মদের প্রিয় পাত্র হন এবং তাঁর মেয়ে উম্মে হাবিবাকে নবী বিবাহ করেন। যখন এদের সকলকে ১০০ টা করে উট দেওয়া হল তখন আর এক অনুচর আবদুল্লা বিন যায়েদ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করল এবং মহম্মদ তখন তাকেও ১০০টা উট দিলেন (মুসলীম - ২৩০৩, ২৩০৪)। এই শেষোক্ত আবদুল্লা বিন যায়েদ ছিলেন মহম্মদের পালিত পুত্র যায়েদের ছেলে এবং যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে নবী বিবাহ করেন।

একবার গনিমতের মাল হিসাবে আলি ইয়েমেন থেকে কিছু সোনা পাঠান এবং তার বন্টনের বেলায়ও আল্লার রসুল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। নবী তখন রেগে গিয়ে বললেন, "আমি আল্লার রসুল, সকাল বিকাল আমার কাছে আল্লার বাণী আসে, তবুও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না!" তখন খোয়ারু নামে এক ব্যক্তি বলল, "আল্লার রসুল, আল্লাকে ভয় করুন ও ন্যায় বিচার করুন।" নবীর অনুচর ওমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আল্লার রসুল, অনুমতি করুন এই কপটের মুণ্ডটা এখনই ধড় থেকে নামিয়ে দিই।" যাই হোক, মহম্মদ তাকে প্রাণে মারলেন না বটে, তবে সেই থেকে খোয়ারু ও তার বংশধরেরা ঘৃণিত কপট বলে চিহ্নিত হল (মুসলীম -২৩১৬, ২৩২৭)। উপরিউক্ত ওমর পরে মুসলীম জগতের দ্বিতীয় খলিফা হন এবং এঁর আমলে মুসলমান সাম্রাজ্য খুবই বিস্তৃতি লাভ করে। ঐ সময় বিজিত দেশগুলি থেকে এত গনিমতের মাল আসতে শুরু করে যে আরবের একটি সদ্যোজাত শিশুও তার ভাগ পেতে থাকে। ওমরের বিধবা কন্যা হাফসাকে মহম্মদ বিবাহ করেন।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। জিহাদ না করে, শুধু ভয় দেখিয়ে বিধর্মীদের ধনসম্পদ হস্তগত করাকে ফেই বলে। যেহেতু জিহাদকারীদের মধ্যে তা বিতরণের কোন প্রশ্ন নেই তাই এর পুরোটাই আল্লার রসুলের প্রাপ্য। মদিনার উপকণ্ঠে বনি নাজির, বনি কানুইকা ও বনি কুরাইজা নামে ইহুদী গোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করত। নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মকুশলতায় আরবের বেদুইনদের থেকে উন্নত হবার ফলে এরা বেশ সচ্ছল ও ধনসম্পত্তির মালিক ছিল। এইসব ধন সম্পত্তিকে লক্ষ্য করে আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, " আরও বহু সম্পদ আল্লা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই, তবে আল্লার নিকট গচ্ছিত আছে" (৪৮/২১)। মহম্মদ শুধু ভয় দেখিয়ে বনি নাজির গোষ্ঠীকে মদিনা থেকে বিতাড়িতকরলেন। তারা পরিবার পিছু এক উটের পিঠে যতটা মাল ধরে তাই

নিয়ে মদিনা ত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং মদিনার উত্তরে খয়বর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলাদেশ বা পূর্বপাকিস্তান থেকে যে হিন্দু বিতাড়ন হয়েছে বা হচ্ছে, নবী তাঁর জীবিত কালেই তার সূচনা করে গেছেন। এখানে আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, বিশ্বাসীরা যাতে শিক্ষায় দীক্ষায় নিজেদের উন্নত করে সচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে এরকম কোন প্রেরণা ইসলামে অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে বলপূর্বক ও অন্যায়ভাবে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করাতেই ইসলাম প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। যাই হোক, যেহেতু জিহাদ না করেই বনি নাজির গোষ্ঠীর জমিজায়গা, ধন সম্পত্তি হস্তগত করা সম্ভব হল তাই এই সমুদায় সম্পত্তি পবিত্র ফেই হিসাবে নবীর মালিকানায় চলে এল।

ইসলামের আগে বেদুইনদের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, দস্যুতা করে যে সম্পদ পাওয়া যেত তার চার আনা দলপতি পেত এবং বাকী বার আনা শাকরেদদের মধ্যে ভাগ হত। যে চার আনা দলপতি গ্রহণ করতো তাকে সফি বলা হত। বনি নাজির গোষ্ঠীর যে বিশাল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতে এল মুসলমানরা ভাবল তাও এইভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। কিন্তু আল্লা কোরানের বাণী (৫৯/৭) অবতীর্ণ করে সমুদায় সম্পত্তি ফেই হিসাবে আল্লার রসুলের প্রাপ্য বলে ঘোষণা করলেন। এতে করে আল্লার রসুল এক বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেন। এরই একটা অংশে একটা বাগানবাড়ী তৈরি করিয়ে নবী তাঁর মিশরীয় ও খ্রীস্টান রক্ষিতা মেরী বা মারিয়াকে রাখেন। মেরী ক্রীতদাসী ছিল। অষ্টম হিজরীতে এর গর্ভে মহম্মদের পুত্র ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করে কিন্তু ১৮ মাস বয়সে মারা যায়। মৃত্যুকালে মহম্মদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একমাত্র কন্যা ফতেমা জীবিত ছিলেন এবং তিনিও মহম্মদের মৃত্যুর ৬ মাস পরে, ১১ হিজরীতে মারা যান। মহম্মদের মৃত্যুর পর মেরীর ইতিবৃত্ত রহস্যাবৃত। অনেকের মতে সে আবার মিশরে ফিরে গিয়েছিল।

বর্তমান প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা সর্বপ্রথম গনিমতের মাল দখল করে। কিন্তু তা ভোগ করতে তাদের মধ্যে কিছুটা সঙ্কোচ দেখা দেয়। কিন্তু আল্লা অপরাধী মনোভাব দূর করে মহানন্দে তা ভোগ করতে আদেশ দেন এবং বলেন, " যে গনিমতের মাল তোমরা পেয়েছ তা বৈধ ও উত্তম জেনে ভোগ কর" (৮/৬৯)। মুসলমানদের নৈতিক উন্নতির বদলে তার অধঃপতন ঘটাতে আল্লা কতখানি উৎসাহী তা উপরিউক্ত আয়াৎটিতে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধবন্দী মানুষও ইসলামে লুঠের মাল বলে গণ্য এবং নারী যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যৌনক্রিয়া বৈধ। হুনাইন যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নারী যুদ্ধবন্দীকে গনিমতের মাল হিসাবে নিয়ে আসা হয়, প্রথম দিকে মুসলমানরা কাফের হলেও সেই সব সধবা রমণীদের ভোগ করতে সঙ্কোচ করে। তখন আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকার করেছে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী ও দাসী) তারা ব্যতীত

অন্য কোন সধবা রমণী তোমাদের জন্য বৈধ নয়"(৪/২৪)। এইভাবে আল্লা তাদের সঙ্কোচ দূর করলেন এবং বিশ্বাসীরা বৈধ কর্মে লিপ্ত হল (মুসলীম-৩৪৩২)। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন এর লজ্জা উপন্যাসের মায়াকে গনিমতের মাল হিসাবেই অপহরণ করা হয়েছিল এবং আল্লার উপরিউক্ত বাণীগুলোর জন্যই অপহরণকারীদের মনে কোন পাপ বোধ জাগ্রত হয় নি।

গনিমতের মালের প্রলোভনই মুসলমান জিহাদকারীদের সর্বপ্রধান প্রেরণা এবং আজও এই প্রেরণাই বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের মূল কারণ। লুটের মালের ভাগ পাবার লোভে অনেক সময় অনেক অ-মুসলমান কাফেরও মহম্মদের কাছে জিহাদকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রার্থনা জানাত। একবার একজন লোক মহম্মদের কাছে এসে বলল যে, সে জিহাদে যোগ দিয়ে লুটের মালের ভাগ পেতে ইচ্ছুক। মহম্মদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আল্লা ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস কর?" লোকটি জবাব দিল "না"। তখন মহম্মদ তাকে বললেন "আগে ভুল রাস্তা ঠিক কর (অর্থাৎ মুসলমান হও)" (মুসলীম-৪৪৭২)। তবে প্রয়োজন বোধ করলে আল্লার রসুল কাফেরদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কুজমান ও সাফোয়ান বিন উমায়া নামে দুই জন পৌত্তলিক কাফের ওহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল।

যাইহোক, মহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বছরের মধ্যে ইসলামের সাম্রাজ্য এত বিস্তার লাভ করল এবং সেই সব বিজিত দেশগুলো থেকে লুঠের মাল ও রাজস্ব হিসাবে এত টাকা আরবে আসতে শুরু করল যে জাকাত প্রায় উঠেই গেল। অর্থাৎ আরবের লোকদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করে রাজকোষ পূর্ণ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। বরং বিদেশ থেকে আগত টাকা পয়সা জাকাত (ভিক্ষা) হিসাবে দরিদ্র আরবদের মধ্যে বিলি হতে থাকল। মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা হন, এবং তাঁর আমলের প্রথম বছরে মক্কা ও মদিনার মুসলমানরা মথাপিছু ৯ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) করে জাকাত পেল। এর পর দ্বিতীয় বছরে তা বেড়ে ২০ দিরহামে দাঁড়ায়। ৬৩৪ সালে আবু বকর স্বেচ্ছায় খলিফার পদ ত্যাগ করলে ওমর দ্বিতীয় খলিফা হন ও মিশর ও ইরান জয় করেন। এইসকল কারণে মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় দুই দশকের মধ্যেই এই জাকাত বা বাৎসরিক ভাতা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পায়। মহম্মদের প্রত্যেক বিধবা পত্নী সর্বোচ্চ বাৎসরিক ১২০০০ দিরহাম, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল সেই সম্মানীয় বদরীরা বাৎসরিক ৫০০০ দিরহাম, বদর যুদ্ধের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা বাৎসরিক ৪০০০ দিরহাম এবং তাদের বংশধরেরা বাৎসরিক ২০০০ দিরহাম হিসাবে জাকাত পেতে থাকল। এইভাবে রাজস্ব হিসাবে যে জাকাতের উদ্ভব হয়েছিল, আরবভূমি থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেল। আজ মুসলীম সমাজে জাকাত বলতে বোঝায় ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া।

উপরিউক্ত ভাতা বন্টনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে মহম্মদের বিধবা পত্নীরা সর্বাপেক্ষা সম্মানীয়া ছিলেন এবং তার পরেই ছিল বদরীদের স্থান। এই বদরীদের এত সম্মান ছিল যে, মহম্মদের সর্বকনিষ্ঠা পত্নী বিবি আয়েশার কুৎসাকারী হয়েও আবু বকরের মাসতুতো ভাই হজরৎ মিসতা শুধু বদরী হবার জন্য রেহাই পেয়েছিলেন। মহম্মদের বিধবা পত্নীদের বাৎসরিক ভাতার পরিমাণ থেকে এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে তাঁরা সকলেই বেশ সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। অবশ্য মহম্মদের জীবিত কালেই তাঁরা একরকম বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং এর সপক্ষে একটা উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, মহম্মদ শুধু ভয় দেখিয়ে বনি নাজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন। তারা তখন মদিনার উত্তরে খয়বর নামক স্থানে চলে যায়। কিন্তু এতেও তারা রেহাই পেল না। মহম্মদ তাদের উৎপন্ন শস্যের পঞ্চাশ শতাংশ কর ধার্য করলেন। এই কর থেকে যা পাওয়া যেত তার এক পঞ্চমাংশ নবী পেতেন। নবী তাঁর এই প্রাপ্য অংশ থেকে প্রত্যেক স্ত্রীকে বাৎসরিক ৮০ ওয়াসক খেজুড় ও ২০ ওয়াসক বার্লি দিতেন (মুসলীম-৩৭৫৯)। এক ওয়াসকের পরিমাণ প্রায় ২০৭ কেজি। কাজেই সেই হিসাবে প্রত্যেক পত্নী বছরে ১৬৬ কুইন্টাল খেজুড় ও ৪১ কুইন্টাল বার্লি পেতেন।

পঞ্চম স্তম্ভ হজ

আরবী হজ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল বহির্গমন করা বা যাত্রা করা, যার সঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ হল to set out। বিশেষ অর্থে হজ বলতে বোঝায় তীর্থভ্রমণে যাত্রা। সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রধান উপাসনালয় মক্কার কাবা শরীফ এবং নবীর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত মদিনা নগরী ও সেখানকার মসজিদ নব্‌বী তীর্থ দর্শন করা ফরজ। তবে হজ শুধু তীর্থভ্রমণই নয়। মক্কা মদিনা সহ ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান দর্শন করা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কিছু ধর্মীয় রীতি নীতি পালন করাকেই একত্রে হজ বলে। সারা জীবনে একবার মাত্র হজ করা ফরজ এবং একাধিক বার করলে তা নফল হজ বলে গণ্য হবে। আর্থিক দিক দিয়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ করে না আল্লা তার খোঁজ-খবর রাখা প্রয়োজন মনে করেন না এবং সে ব্যক্তি ইহুদী হয়ে মারা গেল না খ্রীস্টান হয়ে মারা গেল তাতেও আল্লার কোন মাথাব্যথা থাকে না। বিত্তবানদের জন্য হজ ফরজ এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে রাখাই ভাল, কারণ কে যে কখন ইন্তেকাল করবে কেউ বলতে পারে না।

আরবী বছরের শেষ তিন মাস, শওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ, হজের জন্য নির্দিষ্ট, তবে আজকাল শুধু শেষ মাস জিলহজেই এই হজক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই জিলহজ মাসের ১০ তারিখেই পূর্ববর্তী নবী হজরৎ ইব্রাহীম (বাইবেলের Abraham)

তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লার কাছে কোরবানী করতে নিয়ে যান এবং সেই ঘটনার পুণ্য স্মৃতি হিসাবেই ঐ দিন বিশ্বের সমস্ত মুসলমান কোরবানীর ঈদ ঈদুজ্জোহা বা ইদ উল্ আজহা পালন করেন। যারা হজ করতে যান সেই সব হাজীরাও ঐ দিন থেকে তাদের হজের কোরবানী শুরু করেন এবং পরবর্তী তিন দিন ধরে তা চলতে থাকে। ইসলামের ওমরাও বলে আরও একটা বিশেষ পালনীয় ব্রত আছে। নিয়ম-নীতির দিক দিয়ে হজ ও ওমরাওর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শুধু হজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে করলে হজ এবং বছরের অন্য সময় করলে তা ওমরাও।

হজে যাবার আগে সমস্ত ঋণ মিটিয়ে দেওয়া উচিত, সমস্ত গচ্ছিত ধন ফেরত দেওয়া উচিত এবং হজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসা উচিত। তিন ব্যক্তি আল্লার মেহমান বা নিমন্ত্রিত—এরা হল গাজী বা জিহাদে নিহত ব্যক্তি, হাজী বা হজ পালন করেছেন এমন ব্যক্তি এবং তৃতীয় জন হলেন ওমরাও পালনকারী। এঁরা যা প্রার্থনা করেন আল্লা তা কবুল করেন এবং আহ্বান করলে আল্লা তার জবাব দেন। এঁরা যা ব্যয় করেন তার বদলে আল্লা তাদের দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেন। ইসলামে সর্ব প্রধান পুণ্যের কাজ হল আল্লা ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান রাখা। পরবর্তী পুণ্যের কাজ হল আল্লার পথে জিহাদ করা এবং তার পরের পুণ্যের কাজ হল হজ পালন করা। বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও দুর্বল ব্যক্তি, যাদের পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব নয়, তাদের কাছে হজই জিহাদ। হজের সময় স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ এবং হজ একবার শুরু করলে তা অবশ্যই শেষ করা কর্তব্য। ইসলামের আগেও আরবদের মধ্যে হজ করার প্রথা ছিল। সে সময়কার পৌত্তলিকরা অনেক সময় হজ শুরু করে তা শেষ না করেই বাড়ী ফিরে আসত এবং পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে বাড়ীতে ঢুকলে হজ শেষ না করার পাপ মাফ হয়ে যায়। পরে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে এ প্রথার নিন্দা করেন (২/১৮৯)।

হজযাত্রীদের যে সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে হয় তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল ইহরাম বন্ধন করা বা সেলাইবিহীন কাপড় পরা। দু টুকরো সাদা কাপড় থাকে, তার মধ্যে এক টুকরো পরতে হয় এবং অন্যটা গায়ে জড়াতে হয়। আমাদের দেশ বা পূর্ব দিক থেকে যারা হজ করতে যান, লোহিত সাগরের তীরে এল্‌মলম্ পর্বতে পৌছাবার আগেই তাদের ইহরাম বন্ধন করে নেবার নিয়ম। যে সব হাজীরা জাহাজে যান তারা এল্‌মলম্ পর্বতে পৌছুবার আগেই ইহরাম পরে নেন। আর যাঁরা বিমানে যান তাঁরা বিমানে ওঠার আগেই ইহরাম পরে নেন। এই রকম উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট কতকগুলি স্থান আছে যেখানে তারা ইহরাম বন্ধন করেন। ইহরাম পরিহিত হাজীকে মুহরীম বলে।

বিগত দশম হিজরীতে নবী মহম্মদ তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ সম্পন্ন করেন যা বিদায় হজ বা হজ্জাতুল বিদা নামে খ্যাত। আজকের হজের ব্যাপারে কর্তব্য, অকর্তব্য, নিয়মরীতি, সব কিছুর আদর্শ এই বিদায় হজ। ঐ সময় মহানবী মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করে জুলহুলাইয়া নামক স্থানে ইহরাম বন্ধন করেছিলেন এবং সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আজও যারা মদিনা বা উত্তর দিক থেকে হজ করতে আসেন তারা এই জুলহুলাইয়াতেই ইহরাম বন্ধন করেন। ইহরাম বন্ধন করে নেবার পর হাজীরা হজের জন্য বিশেষ নামাজ আদায় করেন এবং তালবিয়া পাঠ করেন। এই তালবিয়া হল, "লব্বাইকআল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শরীফ লব্বাইক; ইন্নাল হামদা অন্নিয়মাতা লাকা অল মুলক, লা শরীকা লাক"— অর্থাৎ, আমি হাজির, প্রভু আপনার আহ্বানে আমি হাজির, আপনার কোন অংশী নেই, সকল প্রশংসা আপনার এবং আপনি সকল কিছুর প্রভু, আপনার কোন শরীক নেই।

ইহরাম বন্ধন অবস্থায় গায়ে সুগন্ধি লাগানো নিষেধ এবং শিকার করা নিষেধ (৫/৯৪)। তবে অন্য কেউ শিকার করে দিলে তার মাংস গ্রহণ করতে বা খেতে কোন নিষেধ নেই। একবার এক ব্যক্তি একটা বন্য গাধা শিকার করে তার কিছু মাংস মহম্মদকে দেন এবং তিনি মুহরীম অবস্থায় তা গ্রহণ করেন এবং রান্না করা হলে খান। মুহরীম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ বলে মনে করার কোন কারণ নেই যে হাজীরা তখন পুরোপুরি অহিংস থাকবেন। প্রয়োজন পড়লে মুহরীম কিছু কিছু জঘন্য প্রাণী মারতে পারেন, যেমন কাক, চিল, ইঁদুর ও কুকুর। একবার এক উম্মত মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করল যে, একজন মুহরীম সাপ মারতে পারে কিনা। আল্লার রসুল বললেন, "তা মারতে পারে" (মুসলীম -২৭১৭)।

কিছু হাদিস মতে মুহরীম অবস্থায় বিয়ে করা কিংবা বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ (মুসলীম-৩২৮১)। কিন্তু হিজরীর সপ্তম বছরে মহম্মদ মুহরীম অবস্থায় বিবি মায়মুনাকে বিবাহ করেছিলেন। ঐ বছর মক্কার কোরেশরা নবীকে তিনদিন মক্কায় থেকে হজ করার অনুমতি দেয় এবং সেই সময় তিনি মুহরীম অবস্থায় হারিস নামক এক ব্যক্তির বিধবা মেয়ে মাইমুনাকে নিকা করেন। মুসলমান ভাষ্যকারদের মতে মক্কার কোরেশদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই নবী এই নিকা করেছিলেন। কিন্তু যতদূর মনে হয় নবীর এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ মহম্মদ যখন মক্কায় আর একদিন বেশী থাকার আবেদন জানালেন এবং বদলে মক্কাবাসীদের বিয়ের ভোজ খাওয়াবার লোভ দেখালেন, কোরেশরা তাতে আমল তো দিলই না এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করল।[১২]

এর পর হাজীরা মক্কার কাবা শরীফে নামাজ পড়েন এবং কাবা শরীফকে

---

(১২) Mahammad Encyclopaedia, Seerah Fomdation, London. Vol-2, P-201

তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন। সাতবার প্রদক্ষিণ করলে একবার তাওয়াফ সম্পূর্ণ হয়। আগে শুধু পায়ে হেঁটেই তাওয়াফ করার রীতি ছিল, কিন্তু একবার হজরতের এক পত্নী বিবি উম্মে সালামা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে পাল্কী করে তাওয়াফ করতে বলেন এবং সেই থেকে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শারীরিক দিক থেকে অক্ষম বা পঙ্গু ব্যক্তিদের পাল্কী করে তাওয়াফ করার রীতি চালু হয়। বিদায় হজের সময় এত লোকের ভীড় হয়েছিল যে, হেঁটে তাওয়াফ করা নবীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তিনি তাঁর প্রিয় উট আল কাসোয়ায় চড়ে তাওয়াফ করেন। মেয়েদের পক্ষে ঋতুকালে তাওয়াফ করা নিষেধ। তবে ঋতুকাল উত্তীর্ণ হলে প্রয়োজনীয় তাওয়াফ সেরে নেওয়া যায় এবং তাতেও সমান পুণ্য হয়। বিদায় হজের সময় বিবি আয়েশা ঋতুমতী হলে নবী তাকে হজের আর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যথারীতি করতে বলেন, শুধু তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন। ইসলামের আগে, জাহেলিয়াতের যুগে একমাত্র কোরেশ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বিদায় হজের ঠিক আগের বছর আল্লা কোরানের আয়াৎ অবতীর্ণ করে এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটান (৭/৩১)।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লার রসুল তাঁর উম্মতদের বীরের মত বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে, অনেকটা don't care ভাবে তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। একে তাওয়াফে রমল বলে। মক্কাবাসীদের ভয় দেখানোই এর উদ্দেশ্য ছিল। পরে সবাই মুসলমান হয়ে গেলে এ প্রথা আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। তবে রসূলুল্লা করেছিলেন সেই সুন্নত হিসাবে এখনও কেউ কেউ তাওয়াফে রমল করেন। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কাবা শরীফে তাওয়াফ কখনও বন্ধ হয় না। যখনই সেখানে যাওয়া যাবে তখনই দেখা যাবে যে কেউ না কেউ তাওয়াফ করছে। মুসলমানদের বিশ্বাস যে এমন কোন পার্থিব শক্তি নেই যা কাবা শরীফে তাওযাফ বন্ধ করতে সক্ষম। তবে কেয়ামতের কিছু পূর্বে এক স্থূলকায় কলো হাবসী কাবা ধ্বংস করবে এবং সেই দিনই তাওয়াফ বন্ধ হবে। [১৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে হজের ব্যাপারে তো বটেই, তা ছাড়া কিবলার মধ্যে দিয়ে ইসলামে কাবার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃত পক্ষে মক্কার কাবাই ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলমানদের মতে মক্কার কাবা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর ঠিক উপরেই আছে স্বর্গের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত স্বর্গীয় উপাসনাগার বায়তুল মামুর। অর্থাৎ সেই বায়তুল মামুর থেকে যদি একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তবে তা মক্কার কাবাকে স্পর্শ করবে। এমন কি, সেই দড়ি বেয়ে যদি কেউ উপরে উঠতে শুরু করে তবে সে স্বর্গের বায়তুল মামুরে পৌছে

---

(১৩) কোরান শরীফ, শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন, হরফ, পৃঃ ৪৬৭

যাবে, তবে সময় লাগবে ৫০০ বছর। তবে এই দূরত্ব আসা-যাওয়া করতে ফেরেস্তা জিব্রাইলের মাত্র একদিন সময় লাগে।

হজরৎ আদম যতদিন স্বর্গে ছিলেন ততদিন তিনি বায়তুল মামুরেই আল্লার উপসনাদি করতেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসার পর থেকে উপাসনাগারের অভাবে তাঁর খুব অসুবিধা হতে থাকল এবং এই মর্মে আল্লার কাছে আর্জি পেশ করতে থাকলেন। আল্লা তখন ফেরেস্তা জিব্রাইলকে মক্কায় পাঠালেন এবং সে তখন তার নূরের ডানা দিয়ে মাটিতে ঝাপটা মারতে লাগল। এতে করে বিশাল এক খাদের সৃষ্টি হল যার গভীরতা পৃথিবীর সপ্তম তলে গিয়ে পৌঁছালো। তারপর অন্যান্য ফেরেস্তাগণ [illegible], জুদী, তুর ও লেবাননের পর্বত থেকে পাথর এনে সেই খাদে ফেলতে থাকল। অচিরেই সেই খাদ ভর্তি হয়ে গেল এবং এই ভাবেই বর্তমান কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হল।(১৪) কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কাবার ভিত খুবই মজবুত।

ভিত অত মজবুত হল বটে, কিন্তু কাবার কাঠামো অত মজবুত হল না, কারণ হজরৎ আদম ও তাঁর তৃতীয় পুত্র শীশ শুধু কাদা দিয়ে পাথর গেঁথে প্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করলেন। এই কারণেই নূহের প্লাবনের সময় তা ভেসে গেল এবং কালক্রমে তা একটা বালির ঢিবিতে পরিণত হল। হজরৎ হূদের সময় আরবের লোকেরা এই বালির ঢিবিকেই কাবা বলে মানত এবং সেখানেই তারা আল্লার উপাসনা করতো। কিন্তু কালক্রমে কাবার সেই চিহ্নও লুপ্ত হয়ে যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে, আরবী কাবা শব্দের অর্থ ঘনক বা ইংরাজীতে কিউব (cube)। কাজেই এমন হতে পারে যে, পরবর্তীকালে এই আরবী কাবা থেকেই ইংরাজী cube শব্দ এসেছে। তবে পৃথিবী সৃষ্টি করার দু হাজার বছর আগে আল্লা কাবার একটা অনুকৃতি বা মডেল তৈরি করে স্বর্গে রেখেছিলেন এবং তার অনুকরণেই হজরৎ আদম কাবাগৃহ তৈরি করেছিলেন। প্রথম সেই কাবাগৃহের শুধু চারদিকে দেয়াল ছিল, ছাদ ছিল না।

এরপর প্রায় খ্রীঃ পূর্ব ২০০০ সালে নবী ইব্রাহীম কাবা পুনর্নির্মাণের জন্য আল্লা কতৃক আদিষ্ট হন (২/১২৬,১২৭)। ইসলামী মতে হজরৎ ইব্রাহীম হজরৎ আদমের ২০তম বংশধর এবং আনুমানিক সম্রাট হামুরাবির রাজত্বকালে ব্যাবিলনে জন্মগ্রহণ করেন (১৫)। ইব্রাহীম যখন আল্লা কর্তৃক আদিষ্ট হলেন তখন তিনি শামদেশ বা বর্তমান সীরিয়ায় ছিলেন এবং ফেরেস্তা জিব্রাইল তাঁকে বোরাক বাহনে করে মক্কায় নিয়ে আসেন। মতান্তরে শাকীনা নামে এক প্রবল বাতাস তাঁকে শামদেশ থেকে উড়িয়ে মক্কায় নিয়ে আসে। ঐ সময় আকাশে একখণ্ড মেঘ উড়ে আসে এবং তার

---

(১৪) কাবার পথে, ১ম খণ্ড, ১১তম অধ্যায়।

(১৫) H. G. Wells, A Shorts History of The World (Pelican), P -84.

ছায়া শুধু কাবার ভিতের উপর পতিত হয়। ফলে ইব্রাহীম কাবার ভিতকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। অন্য মতে ফেরেস্তা জিব্রাইল কাবার ভিতের চারিদিকে দাগ কেটে দেয় এবং তার ফলেই ইব্রাহীম তা চিনতে পারেন [১৬]।

অনতিবিলম্বে ইব্রাহীম পুত্র ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহ নির্মাণে হাত দিলেন এবং তিনিও কাদা দিয়ে পাথর গেঁথে কাবার দেয়াল তুললেন। তখনও কাবার ছাদ তৈরি করা সম্ভব হল না। যখন কাবা তৈরি শেষ হল তখন ইব্রাহীমের বয়স দাঁড়াল ১০০ বছর। তারপর আল্লা সবাইকে কাবায় হজ করতে ডাকার জন্য ইব্রাহীমকে আদেশ করলেন (২২/২৬,২৭)। কিন্তু ইব্রাহীম বললেন যে, তার ডাক তো বেশীদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে না। তখন আল্লা বললেন, "আমি তোমাকে ডাকতে বলছি, তাই তোমার কাজ হল ডাকা। বাকীটা আমি দেখছি।" ইব্রাহীম তখন আবু করিশ পাহাড়ের উপর উঠে সবাইকে হজ করার জন্য ডাকতে লাগলেন। অন্যমতে ইব্রাহীম যখন সবাইকে ডাকার জন্য একটা পাথরের উপর উঠলেন তখন এক অলৌকিক শক্তিতে তা আকাশে উঠে গেল এবং তাঁর আহ্বানে দূর-দূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে লোক আল্লাহুম্মা লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বলতে বলতে হজ করতে আসতে শুরু করল এবং এই ভাবে বর্তমান হজ ক্রিয়ার সূচনা হল।

এরপর মহম্মদের যৌবনকালে মক্কার কোরেশরা ইব্রাহীম নির্মিত কাবাগৃহ ভেঙে নতুন করে কাবা তৈরি করে যা ইব্রাহীম নির্মিত কাবার চাইতে কিছুটা ছোট আকারে করা হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর হিজরীর ৬৪ সনে আবদুল্লা বিন যুবায়ের ঐ কাবাকে ভেঙে ফেলে ইব্রাহীম-নির্মিত কাবার মাপে আবার কাবা নির্মাণ করেন এবং এর মাত্র দশ বছর বাদে, ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাশ বিন ইউসুফ সেই কাবাকে ভেঙে মহম্মদ যেই কাবা দেখে গেছেন ঠিক সেই আকারে কাবা নির্মাণ করেন। এই ইউসুফ-নির্মিত কাবাই বর্তমানে রয়েছে যার মাপ হল— দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট ও উচ্চতা ৫০ ফুট। ইব্রাহীম-নির্মিত কাবার চাইতে বর্তমান কাবা প্রস্থে কম হবার জন্য পুরাণো কাবার কিছুটা অংশ বাইরে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় ব্যাপারে তা কাবার অভ্যন্তর বলে গণ্য হয়ে থাকে। একে হাতীম বলে এবং কেউ হাতীমে নামাজ পড়লে সে কাবার ভিতরে নামাজ পড়ার ফল পায়। কাবার ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ার জন্য একটা নল আছে যার নাম মীজাবে রহমৎ। বৃষ্টির জল মীজাবে রহমৎ দিয়ে হাতীমে পতিত হয়। এই জল মুসলমানদের কাছে খুবই পবিত্র।

কাবার চারটি কোণের বিশেষ নাম আছে। সীরিয়ার দিকের কোণের নাম রুক্নে শামী, ইয়েমেনের বা দক্ষিণ দিকের কোণের নাম রুকনে ইয়ামানী, ইরাকের দিকের কোণের নাম রুকনে ইরাকী এবং কাবার যেই কোণে পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তর হাজরে

---

(১৬) কোরান শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ৫১৩।

আসোয়াদ রয়েছে সেই কোণের নাম রুকনে আসোয়াদ। কাবাগৃহ তৈরির মধ্যে কোন উন্নত স্থাপত্যের নিদর্শন বা শৈল্পিক উৎকর্ষ নেই এবং খুবই মোটা দাগের কাজ। এবড়ো খেবড়ো অমসৃণ পাথরের চাঁই ইয়েমেনী সুরকী দিয়ে গেঁথে তৈরি। একটা কালো কাপড়ের ঢাকনা বা গিলাফ দিয়ে কাবাগৃহ ঢাকা থাকে এবং গিলাফে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করা থাকে। হজের সময় বছরে একবার গিলাফ পাল্টানো হয়। কাবা শরীফে একটা মাত্র দরজা আছে। বছরের অন্য সময় এই দরজা তালাবন্ধ থাকে, শুধু হজের মরশুমে খুলে দেওয়া হয়। হজের সময় হাজীরা কাবার ভিতরে যেয়ে হাজরে আসোয়াদকে চুম্বন করেন। এই সময় ভীড়ের চাপে খুব কম হাজীই ভিতরে যেয়ে হাজরে আসোয়াদকে চুম্বন করতে সুযোগে পান এবং যারা তা পারেন না তাঁরা বাইরে থেকে সাঙ্কেতিক চুম্বন করেন। হজ্জাতুল বিদার সময় আল্লার রসুল লাঠির সাহায্যে হাজরে আসোয়াদকে প্রতীকি চুম্বন করেন।

কাবার দক্ষিণ পূর্ব কোণে, ভূমি থেকে প্রায় ৪ বা ৫ ফুট উপরে এই হাজরে আসোয়াদ রক্ষিত আছে। প্রায় ৭ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় গোলাকৃতি (oval) এই হাজরে আসোয়াদ ডজনখানেক ছোট ছোট কালো পাথরের টুকরো রক্তাভ সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে তৈরি। কথিত আছে যে, হজরৎ আদম কাবাগৃহ তৈরি করলে পর ফেরেস্তা জিব্রাইল স্বর্গ থেকে হাজরে আসোয়াদকে নিয়ে আসেন এবং সেখানে স্থাপন করেন। তখন এর রঙ দুধের মত সাদা ছিল এবং কালক্রমে মানুষের পাপ শোষণ করতে করতে এর রঙ কালো হয়ে যায়। নূহের প্লাবনের সময় কাবাগৃহ ভেঙে পড়লে ফেরেস্তাগণ হাজরে আসোয়াদকে নিকটবর্তী আবু কুবায়েশ পর্বতের কোন এক স্থানে সুরক্ষিত করে রাখেন। এর পর হজরৎ ইসমাইল যখন কাবাগৃহ নির্মাণ করছিলেন তখন একদিন বিশেষ একটি পাথরের সন্ধানে ইসমাইল আবু কুবায়েশ পর্বতে যান এবং তখন জিব্রাইল হাজরে আসোয়াদকে ইসমাইলের হাতে ফেরত দেন। ইসলাম ঘোরতর ভাবে পৌত্তলিকতা-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কাবা ও তার অভ্যন্তরস্থ হাজরে আসোয়াদকে ঘিরে মুসলমানরা যে ঘোরতর পৌত্তলিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন তা বিস্ময়কর।

যাই হোক, এর পর হাজীরা কাবার নিকটবর্তী সাফা ও মারোয়া পর্বতে যান এবং দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করেন। সাতবার সায়ী কাবার নিয়ম, চারবার যাওয়া, তিনবার আসা। কথিত আছে যে, পূর্ববর্তী রসুল ইব্রাহীমের দুই পত্নী ছিল, বিবি সারা ও বিবি হাজেরা। ইব্রাহীমের মিশর ভ্রমণকালে সেখানকার ফেরাউন বিবি সারার সেবা যত্ন করার জন্য হাজেরাকে ক্রীতদাসী হিসাবে দান করেন। বিবি সারার কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করে হাজেরার সঙ্গে ইব্রাহীমের বিবাহ দেন। কিন্তু হাজেরা গর্ভবতী হলে সারার মনে

সপত্নীসুলভ বিদ্বেষভাব দেখা দেয় এবং পুত্র ইসমাইল ভূমিষ্ঠ হলে সেই বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে। বিবি সারা তখন পুত্র ইসমাইল সহ হাজেরাকে পরিত্যাগ করার জন্য ইব্রাহীমকে প্ররোচিত করতে থাকেন। কিছুদিন পর আল্লা বিবি সারার পরামর্শকে অনুমোদন করলে ইব্রাহীম শিশুপুত্র ইসমাইল ও বিবি হাজেরাকে নির্বাসিত করলেন।[১৭] আজ যেখানে মক্কা নগরী সেই সময় তা ছিল এক জনমানবহীন মরু প্রান্তর। ইব্রাহীম ইসমাইল ও হাজেরাকে সেখানে রেখে এলেন। সঙ্গে রেখে এলেন এক মশক জল ও কিছু খেজুর।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সেই পানি ও খেজুর ফুরিয়ে গেল। পানির অভাবে হাজেরার বুকের দুধও শুকিয়ে গেল। তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় শিশু ইসমাইলকে বাঁচাবার জন্য হাজেরা তখন উন্মত্তের মত আশেপাশে জন বসতির খোঁজ করতে লাগলেন। একবার তিনি সাফা পর্বতে ওঠেন, জনবসতির খোঁজ করেন। আবার পরক্ষণেই মারোয়া পর্বতে ওঠেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এইভাবে সাতবার তিনি সাফা ও মারোয়া পর্বতের মধ্যে ছোটাছুটি করেন এবং এই ঘটনার স্মরণেই হাজীরা সাফা মারোয়ায় সায়ী করেন। এই সায়ী করার সময় হাজীরা বলেন, "আল্লা ব্যতীত উপাস্য নেই। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন, সেবক মহম্মদকে শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি একাই অসংখ্য অংশীবাদীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, সাতবার ছোটাছুটি করে মা হাজেরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন ফেরেস্তা জিব্রাইল সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পায়ের ক্ষুর দিয়ে বালি সরিয়ে এক কূপের সৃষ্টি করেন। এই কূপের নামই হল বিখ্যাত জমজম কূপ, যার পানি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র শরাবান তহুরা বা স্বর্গীয় সুধা। হাজীরা হজ শেষ করে ফেরার সময় পাত্রে করে এই পবিত্র পানি নিয়ে আসেন। হাজীরা সায়ী করে ক্লান্ত হবার পর এই পানি পান করেন। জাহেলিয়াতের যুগে মহম্মদের পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব ও তাঁর পরিবারের উপর দায়িত্ব ছিল হাজীদের জমজমের পানি পান করাবার। মক্কা বিজয়ের পর মহম্মদ তাঁর আর এক চাচা আব্বাস ও তাঁর পরিবারের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং আজও সেই বংশের লোকেরাই এই মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। জাহেলিয়াতের যুগে পৌত্তলিক কোরেশরা সাফা পর্বতের উপর দেবী আসাফ ও মারোয়া পর্বতের উপর দেবী নয়লার মূর্তি স্থাপন করেছিল যা মুসলমানরা মক্কা দখল করার পর ভেঙে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে সাফা মারোয়া পর্বতও আজ পায় কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। শুধু প্রতীক হিসাবে কিছুটা অংশ রেখে দেওয়া হয়েছে।

আরবে জলের খুবই অভাব এবং যেখানে জল পাওয়া যায় সেই জলের

(১৭) কোরান শরীফ, শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ২৫৫

উৎসকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। সেই একই ভাবে জমজম কূপকে ঘিরে জনবসতির সূত্রপাত হল এবং এইভাবে মক্কা নগরীর সৃষ্টি হল। পরবর্তীকালে এই জমজম কূপ হারিয়ে যায়। একবার মক্কায় অত্যধিক জলকষ্ট হলে আব্দুল মোত্তালেব প্রতিজ্ঞা করলেন যে, জমজম কূপ আবিষ্কার করতে পারলে তিনি তাঁর দশ (মতান্তরে বার) পুত্রের মধ্যে একজনকে আল্লার কাছে কোরবানী দেবেন। ভাগ্যক্রমে তিনি জমজম কূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন এবং কোন ছেলেকে কোরবানী দেবেন তা স্থির করার জন্য লটারী করলে ছেলে আবদুল্লার নাম উঠল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করল। এবং আবদুল্লার বদলে ১০০টা উট কোরবাণী করা হল। এই আবদুল্লা ছিলেন মহম্মদের পিতা। আবদুল কথার অর্থ দাস। আবদুল ও আল্লা, এই দুই শব্দ মিলে আবদুল্লা হয়। কাজেই আবদুল্লা বলতে বোঝায় আল্লার দাস। কাজেই যদি ইব্রাহীম দ্বারা ইসমাইলের কোরবানী সফল হতো তবে মহম্মদের বংশের উৎপত্তি হত না। আবার আবদুল মোত্তালেব দ্বারা আবদুল্লার কোরবানী সফল হলে মহম্মদের জন্ম হত না। এই কারণে মহম্মদকে অনেক সময় দুই কোরবানীর পুত্র বলা হয়।

জমজম কূপের জল স্বাভাবিক ভাবেই পবিত্র, উপরন্তু মক্কা বিজয়ের পর আল্লার রসুল ঐ জলকে তাঁর থুথুর দ্বারা চিরকালের জন্য পবিত্র করে রেখে যান। নবীর থু থু খুবই পবিত্র এবং বহুবার বহু পরিস্থিতিতে নবী তাঁর এই পবিত্র থুথুর প্রয়োগ করেন। আবু বকরের বড় মেয়ে আসমার ছেলে হলে সে তাকে নবীর কাছে নিয়ে আসে এবং নবী সেই সদ্যোজাত শিশুকে তাঁর থুথু খাইয়ে পবিত্র করেন। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর এক অনুচর চোখে আঘাত পায় এবং নবী তার চোখে থুথু দিলে তা ভালো হয়ে যায়। খয়বর অভিযানের সময় নবীর চাচাত ভাই তথা জামাতা আলির চোখে প্রদাহ হয় এবং নবীর থুথুতে তা আরোগ্য হয়। আবদুল্লা বিন উবাইয়া নামে এক অনুচর মারা গেলে নবী মৃত আবদুল্লার মুখে থুথু দিয়ে তার পরলোকের পথ প্রশস্ত করেন (মুসলীম ৬৬৭৯,৬৬৮০)।

যাইহোক, সায়ী করার ফলে ক্লান্ত হাজীরা জমজমের পানি পান করে সুস্থ হয়ে মক্কার নিকটবর্তী মিনা নামক স্থানে যান এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। আজকাল হাজীদের রাত্রিবাস করার জন্য সৌদি সরকার অসংখ্য তাঁবুর ব্যবস্থা করে থাকে এবং গত ১৯৯৭ সালে এই তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং অনেক হাজী মারা যান। হজের অঙ্গ হিসাবে এই রাত্রিবাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাতকে আরাফত-এর রাত বলে এবং মুসলমানদের কাছে এই রাত সহস্র লায়লাতুল কদর অপেক্ষাও পবিত্র। এই লায়লাতুল কদরের অন্য নাম শবে কদর। এই রাত খুবই পবিত্র কারণ এই রাতেই সৎপথের দিশারী হিসাবে আসমানী কেতাব কোরণ শরীফ নাযেল হয়েছিল।

যারা এই পবিত্র আরাফতের রাত্রে বিশেষ নামাজ, দোয়া, মোনাজাত ইত্যাদি করে আল্লা তাদের কেয়ামতের দিন পর্যন্ত জীবিত রাখেন, তাদের সব গোনাহ্ মাফ করেন এবং তাদের জন্যে দোজখ (নরক) এর আগুনকে হারাম করেন (অর্থাৎ নরকের আগুন তাদের পোড়াতে পারে না)। এই রাতে যে বান্দা চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে আল্লা তার সব প্রার্থনা কবুল করেন। এই কারণে ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানরা এই আরাফতের রাতটা বিশেষ নামাজ, দোয়া ইত্যাদি করেই কাটান এবং পরদিন সকালে তারা আরাফত নামক স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আরাফতের প্রান্তর আদি পিতা হজরৎ আদম ও মা হাওয়ার পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত। মক্কা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দয়ার পাহাড় জবলে রহমৎ এবং তার পাশেই আরাফা পর্বত। আরাফা পর্বতের গা ঘেঁষেই এই আরাফৎ প্রান্তর অবস্থিত। আরাফৎ শব্দের অর্থ মিলন। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবার পর হজরৎ আদম ও মা হাওয়া অনেক দিন বিচ্ছিন্ন ভাবে কাটান এবং তারপর আল্লার ইচ্ছায় এই আরাফৎ প্রান্তরেই তাদের মিলন সংঘটিত হয়। তাই এই প্রান্তর আরাফৎ বা মিলনের প্রান্তর। মিলিত হবার পর এই প্রান্তরে তাঁরা মিলিতভাবে যে প্রার্থনা করেছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েই আল্লাতায়লা তাদের গন্দমবৃক্ষের ফল খাবার পাপ মাফ করে দেন। এই কারণে এই প্রান্তরে যে নামাজ পড়ে সে অনেক বেশী করে আল্লার রহমৎ পায়। আরাফতের দিন সমস্ত হাজীরা যখন এই প্রান্তরে সমবেত হয়, আল্লা তখন ফেরেস্তাগণকে সঙ্গে করে আকাশের সব থেকে নীচের আকাশে নেমে আসেন এবং বান্দাদের প্রার্থনা কবুল করেন। তিনি তখন তাঁর ফেরেস্তাগণকে বলেন, " দেখ, আমার জন্যে আমার বান্দারা এখানে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এদের সব গোনাহ মাফ করে দিলাম।" এইদিন আল্লা তাঁর জাহান্নমের সব দরজা খুলে দেন এবং সর্বাধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নমের আগুন থেকে মুক্তি দেন। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, ইসলামী মতে সাত রকমের নরক আছে যার মধ্যে জাহান্নম নামক নরক শুধু মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষিত। এই নরকের আগুনের দাহিকা শক্তিও অন্য নরকের থেকে অনেক কম। আল্লা জাহান্নমের দরজা খুলে দেবেন বলতে বোঝায় যে, ঐ দিন শুধু মুসলমান নরকবাসীরাই নরক থেকে স্বর্গে যাবে।

রসুলুল্লার জীবনের শেষ বছর আরাফতের মাটি তাঁর কদম মুবারক চুম্বন করোছিল। ঐ দিন তিনি বিদায় হজ সমাপন করে লক্ষাধিক মুসলমানের এক বিশাল সমাবেশে তাঁর বিদায় ভাষণ দেন এবং এর মধ্য দিয়ে ইসলামের মূল নীতিগুলো ব্যাখ্যা করেন। এই ভাবেই তিনি "কুল্লে মুসলেমীন ইখুয়াতুন " বা বিশ্বব্যাপী মুসলীম ভ্রাতৃত্বের নীতিও ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কারণে আরাফতের

এই পবিত্র কুদুম ইলাকায় প্রবেশ করলে বা কিছুক্ষণ অবস্থান করলে মানুষ আপনা হাজী হয়ে যায়।

নবম হিজরীতে, মক্কা বিজয়ের ঠিক পরে পরেই আল্লা পবিত্র কোরানের সুরা নসর(১১০নং সুরা), অবতীর্ণ করে বললেন, "যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লার দ্বীনে (ধর্মে) প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর"। প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের পর মহম্মদ হলেন সমগ্র জাজীরা তুল আরবের একচ্ছত্র অধিপতি। দলে দলে লোক তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল এবং মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে লাগল। ঠিক এই সময় আল্লাতায়লার উপরিউক্ত বাণী অবতীর্ণ হওয়াতে আল্লার রসুল স্থির করলেন যে আরবের সমস্ত মুসলমানদের একত্র করে এক বিশাল জমায়েত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির করলেন যে, এরকম একটা বিশাল জমায়েৎ করার জন্য হজই হল সর্বোৎকৃষ্ট পথ।

কিন্তু অসুবিধা রইল একটাই, অ-মুসলমানদের জন্য তখনও কাবায় হজ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। নবীর অভিপ্রায় অনুধাবন করতে আল্লার বিলম্ব হল না এবং তিনি অংশীবাদী কাফেরদের জন্য কাবার পবিত্র এলাকায় প্রবেশ ও হজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন (৯/৩)। কাজেই এটা নিশ্চিত হল যে, হজের জন্য জমায়েত শুধু আল্লার দ্বীনে প্রবেশকারীদেরই জমায়েত হবে। আল্লা ইতিমধ্যে নগ্ন হয়ে তাওয়াফ করাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (৭/৩১)। আল্লার এই দুই নিষেধাজ্ঞা কাবায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই বছর নিজে না গিয়ে আবুবকর ও আলির নেতৃত্বে ৩০০ মুসলমানের একটি দলকে মক্কায় হজ করতে পাঠালেন এবং পরের বছর নিজে যাবেন স্থির করলেন।

পরের বছর আরবের সমস্ত গোষ্ঠীপতিদের কাছে হজে যোগ দেবার অনুরোধ জানিয়ে খবর পাঠানো হল। গোষ্ঠীপতিরাও বুঝতে পারলেন যে, এ শুধু অনুরোধ নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী এবং দলবল নিয়ে হজে যোগ না দিলে ভবিষ্যতে তার জন্য অবশ্যই খেসারত দিতে হবে। দশম হিজরীর ২৬শে জিলকদ, শনিবার প্রিয় আল কাসোয়া উষ্ট্রীতে চেপে আল্লার রসুল মদিনা ত্যাগ করলেন। মদিনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁর সঙ্গী হল প্রায় ৭০ হাজার মুসলমান। পথের দুপাশ থেকে আরও কাতারে কাতারে লোক এসে যোগ দিতে লাগল এবং মক্কায় পৌঁছে এই লোকসংখ্যা দাঁড়াল প্রায় সোয়া লক্ষ। এর সঙ্গে মক্কার মুসলমানদের যোগ করে মোট লোকসংখ্যা প্রায় দু লক্ষে পৌঁছালো। ক্রীতদাসী ও রক্ষিতা বাদে এই সময়

নবীর নয়জন বিবি ছিল এবং তাঁরা হলেন, সৌদা, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা, জয়নব, জয়েরিয়া, উম্মে হাবিবা, সফিয়া ও মায়মুনা।[১৮] এই পত্নীরাও নবীর সঙ্গে মক্কায় গিয়েছিলেন এবং নবী সঙ্গে নিয়েছিলেন কোরবানী করার জন্য ১০০ উট।

আরবে উট খুবই মূল্যবান এবং সেই কারণে কোরবানীর উটের সংখ্যা থেকে নবীর তৎকালীন আর্থিক সচ্ছলতার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এর চার বছর আগে, হুদাইবিয়ার চুক্তির বছর, তিনি কোরবানীর জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন ৭০টি উট। এই সমৃদ্ধির উৎস হল জিহাদ-লব্ধ গণিমতের মালের পবিত্র খুম এবং ফেই। এর আগে নাজির গোষ্ঠীর সমুদায় সম্পত্তি যে ফেই হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। খয়বর থেকে কর হিসাবে যা আসত তার ১/৫ অংশ যে নবী পেতেন তাও আগে বলা হয়েছে। এ ছাড়া বনি কুরাইজা, বনি কানুইকা, বনি হারিস ইত্যাদি গোষ্ঠীর ইহুদীদের কাছ থেকে যে বিপুল গণিমতের মাল পাওয়া যায় তার এক-পঞ্চমাংশও নবী খুম হিসাবে পেয়েছেন। এছাড়া ছোটখাট জিহাদের দ্বারা লব্ধ গণিমতের মাল তো ছিলই।

মহম্মদ মোট দশ বছর মদিনায় বাস করেন এবং এই সময়ের মধ্যে মুসলমানরা মোট ৮২টি আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালায় যার মধ্যে ২৬টি ছিল গাজোয়াৎ এবং বাকীগুলো ছিল সরিয়া। যে সমস্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠনে স্বয়ং নবী অংশগ্রহণ করতেন সেগুলোকে গাজোয়াৎ বলে। কাজেই এই সমস্ত অভিযান থেকে খুম হিসাবে নবী কত ধন সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা চলে। এই সব গণিমতের মালের মধ্যে যে সব যুদ্ধবন্দী থাকত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হত। যে সব নারী ও শিশুদের রেহাই দেওয়া হত তাদের মধ্যে সুন্দরী নারীরা নবী কিংবা তাঁর প্রিয় অনুচরদের হারেমে স্থান পেত এবং বাদবাকীদের ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রী করা হত। এই ক্রীতদাসী বিক্রী থেকেও ভালই আয় হত। মহানবী বনি মুস্তালেকদের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে গণিমতের মাল হিসাবে জয়েরিয়াকে লাভ করেন এবং খয়বর অভিযানকালে ইহুদী দলপতির কন্যা সফিয়াকে লাভ করেন। সফিয়ার প্রকৃত নাম ছিল জয়নব। সাধারণত গণিমতের মালের শ্রেষ্ঠ বস্তুকে সফিয়া বলে। খয়বর থেকে লব্ধ গণিমতের মালের মধ্যে জয়নব শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় যার ফলে তার নাম হয়ে যায় সফিয়া। এ প্রসঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে, গণিমতের মাল ভাগাভাগির সময় সফিয়া অংশটা আল্লার রসুলেরই প্রাপ্য হত।

যাই হোক, বিদায় হজের সময় নবী আল কাসোয়ায় চড়ে তাওয়াফ করেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসোয়াদকে প্রতীকি চুম্বন করেন। এই সময় হজক্রিয়ার

---

(১৮) Mahammad Encychopaedia, Seera Foundation (London). Vol-2, p-206

আরও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন সাফা ও মারোয়া পর্বতে আসাফ ও নয়লার মূর্তি ছিল বলে প্রথম প্রথম উম্মতরা সায়ী করতে কুন্ঠিত হচ্ছিল। তখন আল্লা কোরানের আয়াৎ অবতীর্ণ করে সায়ী করাকে হজের অন্তর্ভূক্ত করেন (২/১৫৮)। আগে হজের কালে স্ত্রী-সংসর্গ পাপ বলে বিবেচিত হত এবং এই সময় নবী তা বৈধ বলে ঘোষণা করেন (বুখারী--১৪৪৩)। আগে কাবার ভিতরে ৩৬০ রকমের মূর্তি থাকায় নবী কাবার ভিতরে নামাজ আদায় করতেন না। এই বিদায় হজের সময়ই তিনি জীবনে প্রথম কাবার অভ্যন্তরে নামাজ পড়েন। আগে কোরেশ বংশীয়রা তাদের বংশ মর্যাদার কারণে আরাফতে গিয়ে সকলের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতো না। মুজদালিফা পর্যন্ত যেয়ে ফিরে আসতো। বিদায় হজের সময় নবী তাদেরও আরাফতে যেয়ে রাত্রি যাপন করতে আদেশ দেন (২/১৯৮, ১৯৯)।

এর পর রসুলুল্লা ৯ই জিলহজ্ আরাফৎ প্রান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণ দেন। এই ভাষণের সারবস্তু তিনটি—(১) "কুল্লে মুসলেমীন ইখুয়াতুন" বা সব মুসলমান ভাই ভাই এবং এই বাণী থেকেই বর্তমান মুসলীম বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা ইসলামী উম্মা জন্ম লাভ করে। (২) তিনি মারা যাবার পর আর কোন নবী জন্মাবে না এবং (৩) মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে কোরানকে অবলম্বন করে থাকলে কেউ তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। এ ছাড়া তিনি তাদের নিয়মিত নামাজ, রোজা ইত্যাদি করে যেতে বলেন। সবশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করলেন, "আমি কি তোমাদের মধ্যে আল্লার বাণী পৌছে দিতে পেরেছি?" সমবেত জনতা তখন সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই আল্লার রসুল, নিশ্চয়ই আপনি পেরেছেন।" এবং ভাষণ শেষ হল। এই একই ভাষণ তিনি পরের দিন মিনা'য় দেন এবং ১১ই কিংবা ১২ই জিলহজ আইয়াম্'এ দেন। বিদায় ভাষণের দিন যোহরের নামাজের অনেক দেরী হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত প্রায় সমাগত হয়ে পড়ে। এই কারণে আল্লার রসুল ঐ দিন সবাইকে যোহর ও আসরের নামাজ একই সঙ্গে সেরে ফেলতে বলেন। এই সুন্নত হিসাবে হাজীরা আজও আরাফতের দিন যোহর ও আসরের নামাজ এক সঙ্গে আদায় করেন।[১৯]

এর পর হাজীরা আবার মিনাতে ফিরে আসেন এবং শয়তানের উদ্দেশে রমি করার জন্য নিকটবর্তী জুমরা নামক স্থানে যান। জুমরা শব্দের অর্থ কাঁকর বা পাথরের টুকরো এবং রমি করার অর্থ নিক্ষেপ করা। রমি করার জন্য হাজীরা আগে থেকেই মিনার মুহাস্‌সীর অঞ্চল থেকে কাঁকর-পাথর সংগ্রহ করে রাখেন। প্রথমে তাঁরা জুমরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে পাথর ছোঁড়ার জায়গায় যান এবং পাথর ছোঁড়েন। তারপর জুমরাতুল উস্তায় গিয়ে মেজো শয়তানকে পাথর

(১৯) কাবার পথে, আব্দুস আজিজ আল আমান (হরফ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪

ছোঁড়েন এবং সব শেষে জুমরাতুল উলা'য় গিয়ে ছোট শয়তানের উদ্দেশ পাথর ছোঁড়েন। এই তিনটি জায়গাই খুব কাছাকাছি এবং প্রত্যেক জায়গাতেই একটা স্তম্ভ বানিয়ে রাখা আছে এবং হাজীরা ঐ স্তম্ভগুলিকে উদ্দেশ করে রমি করেন।

কথিত আছে যে, আল্লা একদিন নবী ইব্রাহীমকে স্বপ্নাদেশ করেন তাঁর সব থেকে প্রিয় বস্তুটি আল্লার উদ্দেশে কোরবানী করতে। পরদিন ইব্রাহীম ১০০ উট কোরবানী করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন। এইভাবে তৃতীয় দিন ১০০ উট কোরবানী করা স্বত্ত্বেও যখন তিনি ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে আল্লার বিশেষ কোন অভিপ্রায় আছে। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন যে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হলেন পুত্র ইসমাইল এবং আল্লা তাকেই কোরবানী করার কথা বলছেন। এই কথা ইসমাইলকে জানালে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র হজরৎ ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন, "আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন।" ইব্রাহীম তখন ইসমাইলকে নিয়ে মিনাতে রওনা হলেন। এই শুভ কাজ থেকে বিরত করবার জন্য শয়তান তাকে তিনবার তিন জায়গায় বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং প্রতিবারই তিনি পাথর ছুঁড়ে তাকে নিরস্ত করেন। অথবা বড় শয়তান ইব্রাহীমকে, মেজো শয়তান ইসমাইলকে এবং ছোট শয়তান মা হাজেরাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং সব জায়গাতেই বিফল হয়ে সে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। যাই হোক, শয়তানের এই ঘৃণ্য আচরণকে স্মরণ করেই হাজীরা ঘৃণাভরে তার প্রতি রমি করেন।

মিনাতে পৌঁছে ইব্রাহীম নিজের চোখ বাঁধলেন এবং ইসমাইলকেও চোখ বেঁধে শুইয়ে দিলেন। তারপর ইব্রাহীম বিসমিল্লা বলে ইসমাইলের গলায় ছুরি চালালেন, কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও জবেহ্ করতে পারলেন না। এমন সময় দৈববাণী হল, "হে ইব্রাহীম, তুমি তোমার স্বপ্নকে সাকার করেছ।" চোখ খুলে ইব্রাহীম দেখেন যে একটি বেহেস্তী (স্বর্গীয়) দুম্বা জবেহ্ হয়ে পড়ে আছে আর পুত্র ইসমাইল হাসিমুখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ছিল জিলহজ মাসের দশ তারিখ। এই ঘটনাটিকে স্মরণ করেই সমগ্র মুসলীম জগৎ জিলহজ মাসের দশ তারিখে কোরবানীর ঈদ ঈদুজ্জোহা বা ঈদুল আজহা পালন করেন।

রমি করা হয়ে গেলে হাজীরা আবার মিনাতে ফিরে আসেন এবং কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী করতে যান। মিনা শব্দের অর্থ প্রবাহিত। সম্ভবত কোরবানীর দিন এখানে লক্ষ লক্ষ পশুর কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত হয় বলেই হয়তো এর নাম মিনা। কোরবানী সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল, জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ইদুজ্জোহার নামাজের পর থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোরবানী করা যাবে। যে সমস্ত বিত্তবানদের উপর জাকাত, ফিৎরা (ভিক্ষা) ইত্যাদি বাধ্যতামূলক

কর্তব্য বলে ধরা হয়েছে, তাদের অবশ্যই কোরবানী করতে হবে। উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি হালাল পশুই কোরবানী করা যাবে এবং তা সবল ও সুস্থ হওয়া চাই। কান-কাটা বা শিঙ-ভাঙা এরকম খুঁৎযুক্ত পশু কোরবানীর অযোগ্য। ছাগল, ভেড়ার এক বছর, গরুর দু বছর এবং উটের পাঁচ বছর বয়স হওয়া চাই। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা একজনের জন্য এবং গরু, মোষ বা উট সাতজনের জন্য কোরবানী করা চলে।

উটকে দাঁড় করিয়ে জবেহ্ করার নিয়ম। এ ব্যাপারে আল্লা বলছেন, "আমি উষ্ট্রকে আল্লার নিদর্শন স্বরূপ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জন্য ওতে কল্যাণ আছে, সুতরাং সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওদের জবেহ্কালে তোমরা আল্লার নাম লও, যখন ওরা কাৎ হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা উহা হতে আহার কর এবং আহার করাও" (২২/৩৬)। অবশ্য জবেহ্ করার সময় উটের পা বেঁধে নেওয়া নিয়ম। অন্য পশুদের শুইয়ে জবেহ্ করতে হবে এবং জবেহ্কারীর ডানদিকে মাথা রেখে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। তারপর জবেহ্কারী কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং ডান পা দিয়ে পশুর গর্দান চেপে ধরে "বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর" বলে ছুরি চালাবেন। ছুরি চালাবার সময় বলতে হবে, "আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহু আকবর, আল্লাহুম্মা মেন্‌কা অ অলয়কা"— অর্থাৎ "আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লা ব্যতীত উপাস্য নাই, হে আল্লা, তোমা হতে আগমন ও তোমার দিকে প্রতিগমন।" রাত্রের বেলায় কোরবানী নিষেধ এবং যার নামে কোরবানী তিনি নিজে হাতে জবেহ্ করলেই উত্তম। আগেকার দিনে হাজীরা কোরবানী রক্তে কাবার দেয়ালে মাখানো হজ্ ক্রিয়ার অঙ্গ বলে মনে করতো। পরে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ন করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন(২২/৩৭)। ছুরি দিয়ে পশুর শ্বাসনালী ছিন্ন করাকে জবেহ্ করা বলে।

বর্তমানে মিনাতে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটা নির্দিষ্ট স্থান কোরবানীর জন্য সংরক্ষিত করে রাখা আছে। পশু ব্যবসায়ীরা সেখানে লক্ষ লক্ষ উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি মজুদ করে রাখে এবং হাজীরা দামদস্তুর করে তাদের কাছ থেকে পশু কেনেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরবানী করার লোকও প্রস্তুত হয়ে আছে। কোরবানী কথার অর্থ বলিদান এবং আল্লা ইব্রাহীমকে প্রিয়বস্তু কোরবানী করার মধ্য দিয়ে সম্ভবত ত্যাগের মহান আদর্শের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই আদর্শের খুব সামান্যই আজ অবশিষ্ট আছে এবং প্রকৃতপক্ষে এটা বর্তমানে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎস যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জনাব আব্দুল আজীজ আল আমান সাহেব তাঁর "কাবার পথে" গ্রন্থে কোরবানীর বীভৎসতার যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন, তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া চলতে পারে। তিনি

লিখছেন, " কোরবানীর জায়গায় এসে অবাক হয়ে গেলাম। এতখানি দুর্লভ বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা জানা ছিল না। নির্দিষ্ট ইলাকায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার পশু জবেহ্ হয়ে পড়ে আছে, অধিকাংশই আবার একটির উপর আর একটি ! এই সব দুম্বা, বকরী তল করে, দলিত মথিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অনেকটা দূরে। যেতে যেতে দেখলাম মিনা আজ রক্তস্রোতে সত্যই "মিনা" (প্রবাহিত) হয়ে উঠেছে। যাঁরা কোরবানী করেছেন, কেউ কেউ দু-একটা রান ছাড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছেন, কেউ বা সিনহা থেকে নিয়েছেন কিছুটা গোস্ত, বাদবাকী সবটাই পড়ে আছে।"[২০]

"মরা পশুর উপর দিয়ে পদচারণা, সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। চামড়ার উপরে পা দিয়ে বহুবার পিছলে পড়তে পড়তে টাল সামলে এবং বার কয়েক আছাড় খেয়ে হাতে পায়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে অবশেষে কোরবানীর ইলাকা পার হয়ে মুক্ত মাটিতে পা রাখলাম। সম্মুখে ভীষণ জটলা, হাজার হাজার গরু, ভেড়া, দুম্বা, বকরী কেনা-বেচা হচ্ছে।... দাম-দস্তুর মিটে গেলেই কোরবানী করার লোক প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসবেন। এরা কসাই, কোরবানীর দিন কোরবানীও করেন।... দাম-দস্তুর মিটে গেলেই কোরবানীর পশুটি এইসব লোকগুলোর হাওলায় চলে যাচ্ছে। তারা কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে কখনও বা ফাঁকা জমিনে, অধিকাংশ সময় কোরবানী দেওয়া পশুর উপরই ফেলে দেয় এবং মুহূর্তমাত্র দেরী না করে গলায় ছুরি চালাতে শুরু করে। জবাই শেষ হল কি না হল, কোরবানীর পশু ছেড়ে দিয়ে তারা পারিশ্রমিকের জন্য হাত বাড়ায়। মর্মান্তিক ভাবে লক্ষ্য করলাম একটি বকরী সম্পূর্ণ জবেহ্ হয়নি, সেই অবস্থায় তাকে ফেলে দিয়ে ২ জন কসাই পারিশ্রমিকের জন্য ছুটে এসে মালিককে পাকড়াও করছে। এদিকে আধজবাই হওয়া বকরীটি তার রক্তাক্ত ঘাড় তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এ রকম পাশবিকতা, এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।[২১]

কিন্তু এই পাশবিকতা দেখার পর কি আল আমান সাহেব তাঁর কোরবানীর সঙ্কল্প ত্যাগ করে চলে এলেন? না, কারণ কোরবানী না করে চলে আসলে যে হজ করতে এত কষ্ট স্বীকার করে তিনি মক্কায় গেছেন তা সম্পূর্ণ হবে না। তাই তিনি মধ্যম আকারের দুটো বকরী কিনলেন, একটি নিজের জন্য অন্যটি তাঁর স্ত্রীর জন্য। আল আমান সাহেবের সন্দেহ হচ্ছিল যে, পয়সার বিনিময়ে যে কসাইরা কোরবানী করছিল তারা, কোরবানী নিয়ত তো দূরের কথা, বিসমিল্লা, আল্লাহু আকবর টুকুও বলছিল না। তাই তিনি নিজের হাতেই কোরবানী করবেন মনস্থ করলেন। বকরী

---

(২০) কাবার পথে, আব্দুল আজিজ আল আমান, ১ম খণ্ড (হরফ), পৃঃ ৩৬২

(২১) ঐ, পৃঃ ৩৬৩

দুটি ছাড়া একটি গরুও কিনলেন তাঁর পরিচিত সাত ব্যক্তির নামে কোরবানী করার জন্য। গরুটিকে অবশ্য একজন মৌলবীর হাতে ছেড়ে দিলেন কোরবানী করার জন্য। এর পরের অংশ তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনলেই ভাল হবে।

"আল্লার আদেশ পালনের জন্যই আমি এই পুণ্যভূমিতে হাজির হয়েছি। বকরী দুটির দিকে সস্নেহে তাকালাম, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম কয়েকবার। আর কি আশ্চর্য, সেই বধ্যভূমিতে আশ্চর্য দুটি মায়াভরা হরিণ-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। মুহূর্তে মমতায় ভালবাসায় এই অবোধ পশু দুটির কাছে বাঁধা পড়ে গেলাম আমি। এক পলক তাকিয়ে তাদের কানে কানে যেন কথা কইলাম ঃ এখনি মহান প্রভুর নামে কোরবানী করব তোমাদের, বল রাজি? অবোধ পশু দুটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, যেমন পিতার জিজ্ঞাসায় সম্মতি জানিয়েছিল ইসমাইল। ... ধীরে ধীরে অত্যন্ত আদরের সাথে তাদের সঙ্গে নিয়ে মাত্র কয়েক হাত দূরে একেবারে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। কুরবানীর পশুকে এভাবেই আনা দরকার। পশুর প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ থাকা প্রয়োজন। ... আমি নিজে হাতে কুরবানী করব এটা বুঝতে পেরে কিনারা থেকে এক হাজি সাহেব নেমে এলেন। তিনি একটি বকরীকে শুইয়ে ফেলে জবেহ্ করার উপযুক্ত করে ধরলেন, হাতে ছুরি নিয়ে বিসমিল্লা বলে নিচু হয়ে আমি প্রস্তুত। দেখলাম আমার হাত কাঁপছে, এই সুন্দর জিনিসটাকে আমি হত্যা করব?"(২২)

আল আমান সাহেব ভাতে জলে বাঙালী। কিন্তু তাঁর নাম বাংলা ভাষায় রাখা হয়নি। কোন এক কালে তাঁর কোন্ পূর্বপুরুষ বাংলা ভাষার নাম পারিত্যাগ করে আরবী নাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন তা তিনি আজ আর মনে করতে পারেন না। আজ একজন বাঙালী অ-মুসলমান মুসলমান হলেও তার বাংলা ভাষার নাম ত্যাগ করতে হবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে পিতৃপুরুষের পরিচয়। এভাবে আজ থেকে হয়তো কয়েক শ'বছর আগে কোন এক দুর্যোগের রাতে আল আমান সাহেব তাঁর পূর্বপুরুষের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন। সেই কারণে তিনি আর তাঁর এই সুজলা-সুফলা বাংলা দেশকে পুণ্যভূমি বলে মনে করতে পারছেন না। মরুময় যে আরব ভূমিতে তিনি হজ করতে গেছেন সেটাই তাঁর পুণ্যভূমি এবং আল্লার আদেশে সেই পুণ্যভূমিতেই তিনি হজ পালন করতে গেছেন।

কিন্তু সেই মরুময় পুণ্যভূমি আরব দেশের সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের তো কোন মিল নেই। আর যে মানব সমাজে তাঁর পবিত্র আল্লার দ্বীন জন্ম লাভ করেছে সেই মানব সমাজের সঙ্গেও তো বাঙালী সমাজের মিল নেই। আরব সমাজ পশু পালকের সমাজ। সেখানে পশুহত্যা করে তার মাংস খাওয়া জীবন ধারণের

(২২) কাবার পথে। আব্দুল আজিজ আল আমান, ১ম খণ্ড (হরফ), পৃঃ ৩৬৪

অঙ্গ। কিন্তু কৃষিভিত্তিক বাঙালী সমাজে তো সেই পশুহত্যার প্রয়োজন নেই। আল আমান সাহেব হয়তো স্মরণ করতে পারবেন যে, ইসমাইল ও মা হাজেরাকে পরিত্যাগ করার পর হজরৎ ইব্রাহীম যখন পুনরায় মক্কা গিয়েছিলেন তখন ইসমাইলের স্ত্রী তাঁকে কি বলেছিলেন? ইসমাইল তখন ঘরে ছিলেন না। ইব্রাহীম তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমরা কী খাও?" ইসমাইলের স্ত্রী জবাব দিল, "শুধু মাংস আর জল খেয়ে বেঁচে আছি।" সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরেও কি আল আমান সাহেব কোন এক গৃহবধূর কাছ থেকে এ সংবাদ পাবেন যে, সে শুধু মাংস আর জল খেয়ে বেঁচে আছে? আরব সমাজে পশুহত্যা করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, একটা জীবনধারণের উপায়। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি সুজলা-সুফলা এই বাংলাদেশের রীতি তো তা নয়। তাই তাঁর মনে পশুর প্রতি দয়া আছে, মায়া আছে এবং তাকে হত্যা করতে ছুরি ধরলেও হাত কাঁপে। যত সহজে একজন আরববাসী পশু জবেহ্ করতে পারে তিনি তো তা পারেন না। কিন্তু আল আমান সাহেব ধর্মের মধ্য দিয়ে সেই পশুপালক আরব্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন, তাই অন্তরের মায়া-মমতা ইত্যাদি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে রুক্ষ আরববাসীদের মতই তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে। বিবেককে হত্যা করতে হবে। তাই এবার তিনি পশুপালক সমাজের আদর্শ ও নিষ্ঠুরতার নিদর্শন খুঁজতে শুরু করলেন। পশুপালকের দৃষ্টান্ত ছাড়া নিষ্ঠুর পশু পালকের কাজ তিনি কেমন করে করবেন?

"সামান্য একটা বকরির গলায় ছুরি চালাতে যদি এত দ্বিধা, হজরৎ ইব্রাহীম কেমন করে নিজ হাতে পুত্রকে শুইয়ে খঞ্জর চালিয়েছিলেন তাঁর গলায়? দ্বিধা জাগে নি? হাত কাঁপেনি তাঁর? সামনে ছিল প্রভুর আদেশ।[২৩] সেই আদেশে সব কিছু জয় করেছিলেন তিনি। আমার উপরও তো সেই আদেশ বর্তমান। আল্লার আদেশের চেয়ে আর কোন কিছু বড় হতে পারে না। জীবন গেলেও না। ......আমার মনের দ্বিধা কেটে গেল, বকরী তো বকরী— আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য এই মুহূর্তে আমি নিজেকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। বিসমিল্লা বলে ছুরি ধরে বিনম্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম ঃ ইন্না সালাতি অ নুসকি অ মাহইয়া। .... এক দিকে ছুরি চালাচ্ছি কঠিন হাতে আর এক দিকে বিনীত কণ্ঠে নিজেকে নিবেদন করছি আল্লার কাছে। .... রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অতুলনীয় এই আত্মনিবেদন। কুরবানী তাই নিছক একটা জীবহত্যা নয়, আত্মোৎসর্গের এক মহান উদ্বোধন।"[২৪]

একটা পশুপালক সমাজকে আল্লা কখনই পশু কোরবানী করতে নিষেধ করে না খেয়ে উপবাসে মরতে বলতে পারেন না। তাই আরব্য সমাজকে তিনি পশু

---

(২৩) কোরান শরীফ-(৫/২), (২২/৩৪, ৩৬), (৩৭/১০০-১১০) ইত্যাদি

(২৪) কাবার পথে, (১ম খণ্ড), পৃঃ ৩৬৪, ৩৬৫

কোরবানী করতে বলবেনই। কিন্তু তাঁর সেই আদেশ কি কৃষিজীবী বাঙালী সমাজের উপরও সমান ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? পারে না। আরবে জলের অভাব তাই আল্লা তাদের তায়াম্মুম করে শুদ্ধ হবার বিধান দিয়েছেন। তাই বলে নদী-নালার দেশ এই বাংলাদেশেও কি তায়াম্মুমের বিধান প্রযোজ্য হবে? জলের অভাবের জন্য আল্লা আরবের লোকদের সপ্তাহে মাত্র একদিন গোসল ফরজ করেছেন? সেই হিসাবে এই বাংলার মুসলমানরাও কি শুধু শুক্রবার স্নান করবেন? আল আমান সাহেবের রসুল আরববাসী ছিলেন এবং তাই তাঁর মাতৃভাষা আরবীতে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই কারণে আল আমান সাহেবের মাতৃভাষা বাংলার চেয়ে আরবী ভাষাকি তাঁর কাছে বেশী পবিত্র হতে পারে? পারে না। কিন্তু শিশুকালে তিনি তাঁর মাকে যে ভাষায় মা বলে ডেকেছেন তার চেয়ে পবিত্র আর কোন ভাষা হতে পারে না। যে দেশের মাটিতে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন দেশের মাটি তাঁর কাছে বেশী পবিত্র হতে পারে না। যে দেশের নদী-নালার জল আকণ্ঠ পান করে তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন, এখনও জীবনধারণ করে বেঁচে আছেন, সে দেশের জল ও মাটি থেকে অন্য কোন দেশের জল-মাটি তাঁর কাছে বেশী পবিত্র হতে পারে না। তাঁর দেশের লোকজন যারা তাঁর সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষা বাঙলায় কথা বলে, তাদের থেকে আরবীভাষী বা উর্দুভাষী লোক কখনই তাঁর বেশী আপন হতে পারে না। সর্বোপরি যে গাছের কাণ্ডটা রয়েছে বাংলাদেশে, তার শিকড় যদি থাকে শুষ্ক ও বন্ধ্যা আরব দেশে, তাহলে সে গাছ কোনদিনই সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আল্লাতায়লা তাঁর দ্বীন অনুসরণকারী বিশ্বাসীদের শুধু পশু কোরবানীর আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। অ-মুসলমান বিধর্মী কাফেরদের উদ্দেশে তিনি এ আদেশও দিয়েছেন— "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস সমূহ বিগত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে। তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে ..(৯/৫)।" "যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান (বিশেষ অর্থে মক্কা) হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেই স্থান হতে তাদের বহিষ্কার করবে"(২/১৯১)। "....... তাদের গ্রেপ্তার কর এবং যেখানে পাও তাদের হত্যা কর এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না" (৪/৮৯)। "........ যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায় এবং তাদের হস্তসংবরণ না করে তবে তাদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে, গ্রেপ্তার করবে (৪/৯১)"। "অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী, তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক"(৯/১২৩)। " তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর যতক্ষণ না অশান্তি দূর হয় ও আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়(৮/৩৯)।" "অতএব

যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর(৪৭/৪)"। "যারা আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি হল এই যে, তাদের হত্যা কর কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ কর অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর (৫/৩৩)"। (হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করার অর্থ হল, হয় ডান হাত ও বাঁ পা কাটা অথবা বাঁ হাত ও ডান পা কেটে ফেলা।) "ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে (৩৩/৬১)।"

কাজেই আশা করা যায় যে, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে আল আমান সাহেব আল্লার উপরিউক্ত আদেশগুলো পালনের ব্যাপারেও সমান নিষ্ঠা ও তৎপরতা দেখাবেন, কারণ, "আল্লার আদেশের চেয়ে আর কোন কিছুই বড় হতে পারে না। " পশু কোরবানীর সময় বকরীদুটোর মায়াভরা হরিণ-চোখ দেখে তাঁর মন যেমন দুর্বল হয়েছিল, কোন কাফেরের মায়াভরা চোখ দেখেও হয়তো তাঁর মন দুর্বল হতে পারে। প্রতিবেশী বা পরিচিত কোন কাফেরের গলায় ছুরি চালাতে তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। তাঁর হাত কাঁপতে পারে। কিন্তু তাতে থেমে গেলে তো আল্লার আদেশ কার্যকর হবে না। পরক্ষণেই তিনি তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠবেন, আল্লার কথামত কঠোরতা দেখাবার জন্য প্রস্তুত হবেন এবং বিসমিল্লা বলে ছুরি হাতে তুলে নেবেন। তারপর একদিকে কঠিন হাতে সেই কাফেরের গলায় ছুরি চালাবেন আর এক দিকে বিনীত কণ্ঠে নিজেকে আল্লার কাছে নিবেদন করবেন। কাফেরের গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে আর তিনি বিনম্র চিত্তে, অশ্রুসজল চোখে আল্লার কাছে নিজকে সমর্পণ করতে থাকবেন।

প্রথমেই হয়তো কোন কাফেরের গলায় ছুরি চালাতে বিশ্বাসীদের অসুবিধা হতে পারে, তাই আল্লা হাতে খড়ি হিসাবে এই পশু কোরবানীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই প্রত্যেকটি মুসলমানের উচিত প্রাথমিক শিক্ষার এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা। প্রতিটি মুসলমানের তাই উচিত নিজে হাতে কোরবানী করা, স্বচক্ষে কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত হতে দেখা, যাতে কাজের সময় হাত না কাঁপে বা কাফেরের প্রতি দয়াপরবশ না হয়ে পড়ে। তাই আল আমান সাহেব লিখছেন, "ত্যাগ ও সমর্পণের সঙ্গে বীরের ধর্মে দীক্ষা দেয় এই কুরবানী। কখনও বা সংসার জীবনে, কখনও বা জাতীয় সঙ্কট মুহূর্তে যখন তখন যে কোন বিপর্যয় এসে যেতে পারে এবং সংঘর্ষের সেই মারাত্মক মুহূর্তে আমরা যেন ভেঙে না পড়ি, কাতর না হই। .....এ জন্য কুরবানীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা প্রতিটি মুসলমানের স্বচক্ষে দেখা উচিত। এই পবিত্র রক্তপ্রবাহ, প্রবাহিত রুধিরস্রোত মানুষের অগোচরে মানুষকে বীরোচিত ধর্মে দীক্ষা দেয়। তার দেহ থেকে ভীরুতার খোলস ছাড়িয়ে তাকে বীরের

ধর্মে সজ্জিত করে। সুতরাং কুরবানী একদিকে আত্মসমর্পণ অন্যদিকে আত্মসচ্ছন্দ. এক দিকে ভক্তিপ্লুত নিবেদন অন্যদিকে নব শক্তির বহ্নিমান উদ্বোধন। কুরবানীর মাধ্যমে তাই ইসলাম নতুন রূপে জিন্দা হয়ে ওঠে। সমর্পণ ও জাগরণের এ এক আশ্চর্য উৎসব। পৃথিবীর আর কোন ধর্মে এমনটি দেখা যায় না।" [২৫] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জাতীয় বিপর্যয় বলতে আল আমান সাহেব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাই বলতে চেয়েছেন, কোন বৈদেশিক আক্রমণ নয়, এবং সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যই কোরবানীর রক্ত প্রত্যেকটি মুসলমানের স্বচক্ষে দেখা উচিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কিছুক্ষণ আগে আল আমান সাহেব হাজার হাজার কোরবানী করা পশু দলিত-মথিত করে যাবার সময়, বা কসাইদের কোরবানী করার নিষ্ঠুরতা দেখার সময় অথবা আধাআধি জবেহ্ হওয়া বকরীটির রক্তাক্ত ঘাড় তুলে দাঁড়াতে দেখার সময় মনে যে ব্যথা ও মমতা অনুভব করেছিলেন তা কোন কাজের কথা নয়। বরঞ্চ এই হত্যা, এত রক্ত দেখার ফলে তাঁর উপকারই হয়েছে। তাঁর বীরের ধর্মে দীক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর দেহের ভীরুতার খোলস ছাড়িয়ে ফেলতে এবং তার বদলে বীরের বর্মে সজ্জিত করতে এই সব দৃশ্য তাঁকে অনেক সাহায্য করেছে। তিনি নতুন রূপে জিন্দা হয়ে উঠেছেন। অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করলে এটা নিশ্চিত যে এত পাশব হত্যা ও এত নিষ্ঠুরতা তিনি কোন মতেই দেখতে পেতেন না। কারণ পশুপালক নিষ্ঠুর আরব সমাজে একমাত্র ইসলামই জন্ম লাভ করেছে। তাই ইসলামের মত এমন বীরোচিত ধর্ম আল আমান সাহেব আর পাবেন কোথায়?

কোরবানীর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদায় হজের সময় আল্লার রসুল কোরবানীর জন্য মদিনা থেকে ১০০টা উট সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কোরবানীর দিন সেগুলোকে মিনায় আনা হয় । নবীর ইচ্ছা ছিল যে, ঐ ১০০ উট তিনি নিজে হাতে জবেহ্ করেন। কিন্তু ৬৩টা উট জবেহ্ করার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বাকীগুলিকে জামাতা ও চাচাতভাই আলির হাতে তুলে দেন এবং সে ঐগুলিকে জবেহ্ করে। নবীর এই একনাগাড়ে ৬৩টা উট জবেহ্ করার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আল আমান সাহেব লিখছেন, "এটা বিস্ময়কর হিম্মতের কাজ।"[২৬] কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আল্লার রসুল আরও যে সব হিম্মতের কাজ করেছিলেন তা তাঁর গ্রন্থেই স্থান পেল না কেন?

---

(২৫) কাবার পথে, ১ম খণ্ড, (হরফ), পৃঃ ৩৬৫

(২৬) ঐ, পৃঃ ৩৬৬

একবার উকল গোত্রের কয়েকজন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলে নবী তাদের উপর খুব সদয় হন। সংখ্যায় এরা আটজন ছিল (মুসলীম ৪১৩০ ও ৪১৩২)। কিন্তু মদিনার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং নবী তখন তাদের উটের দুধ ও প্রস্রাব খেতে পরামর্শ দিলেন। এই উদ্দেশ্যে নবী একটা উটের আস্তাবলে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে উঠল এবং এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। একদিন সেই উটের আস্তাবলের দারোয়ানকে খুন করে উটগুলো নিয়ে পালাল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ত্যাগ করল। সব শুনে নবী খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর অনুচরেরা তাদের ধরে এনে নবীর সামনে হাজির করল।

তিনটি গুরুতর অপরাধে তারা অপরাধী ছিল। ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করলে প্রাণদণ্ডের সাজা হয়। এ ছাড়া ইসলাম ত্যাগ করলে বা মোরতাদ হলে এবং নবীর বদনাম বা কুৎসা করলেও প্রাণদণ্ড হয়। প্রাণদণ্ড সব সময় শিরচ্ছেদ করে দেওয়াই বিধেয়, আগুনে পুড়িয়ে নয়। আগুনে পুড়িয়ে মারার অধিকারী একমাত্র আল্লা(বুখারী ১২১৯)। কাজেই উপরিউক্ত ব্যক্তিরা দারোয়ানকে হত্যা করার অপরাধে এবং ইসলাম ত্যাগ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের যোগ্য। উপরন্তু উট চুরি করার অপরাধে তাদের ডানহাত কেটে ফেলা উচিত। অপরাধ এত গুরুতর হওয়ায় নবী তাদেরকে এক দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেবেন স্থির করলেন এবং সেই সাজা নিজে হাতে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আল্লার রসুল প্রথমে দুটো লোহার শিক চেয়ে নিলেন এবং সেগুলোকে লাল করে গরম করে অপরাধীদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের হাত-পা কেটে আলাদা করে ফেললেন এবং ঐ অবস্থায় দুপুরের খাড়া রোদে মরুভূমির তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখলেন। তারা জল খেতে চাইলে নবী তা দিতে সবাইকে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা মারা গেল (বুখারী ৬৩৩৩-৬৩৩৬)। অনেকের মতে নবী হাত-পা কেটে পট্টী বাঁধেন নি বলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তারা মারা যায় (মুসলীম ৪১৩০-৪১৩২)। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশের লোকচরিত্র সম্পর্কেও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এইভাবে শাস্তি দিতে নবীকে অবশ্যই অনেক বেশী হিম্মতের পরিচয় দিতে হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, মদিনার উপকণ্ঠে নজির, কানুইকা, কুরাইজা ও হারিস গোষ্ঠীর ইহুদীরা বসবাস করত এবং নবী শুধু ভয় দেখিয়ে নজির গোষ্ঠীকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন এবং তারা খয়বর নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। পরে ওমর খলিফা হয়ে এদের খয়বর থেকে উৎখাৎ করে আরবের বাইরে বার করে দেন।

আল্লার রসুল বলতেন, "একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইহুদী খ্রীস্টান সবাইকে আমি আরব ছাড়া করব (মুসলীম ৪৩৬৬)।" আবু হোরায়রা বর্ণনা করছেন যে, একদিন আল্লার রসুল সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ইহুদীদের এলাকায় গিয়ে চীৎকার করে বলতে থাকলেন, "ওরে ইহুদীর দল, ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তোদের কোন বিপদ হবে না।" এ প্রস্তাবে তারা সম্মত না হলে আল্লার রসুল বললেন, " তোরা হয়তো জানিস না এই পৃথিবীর মালিক আল্লা ও তাঁর রসুল এবং আমার ইচ্ছা এই দেশ থেকে তোদের বিদায় করি (মুসলীম ৪৩৬৩)।" মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও আল্লার রসুল বলেন, "পৌত্তলিকদের আরব থেকে তাড়াও (মুসলীম ৮০১৮)।" ইহুদীরা আর্থিক দিক থেকে বলবান ছিল বলে নবী তাঁদের একসাথে উৎখাৎ করতে ভয় পেয়েছিলেন, তাই এক এক করে বিতাড়নের কাজ শুরু হয়েছিল। নাজির গোষ্ঠীর পর এল কুরাইজা গোষ্ঠীর পালা এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ শুরু হয়ে গেল।

খন্দক যুদ্ধ শেষ করে ঘরে ফিরে নবী সবেমাত্র পাকসাফ হয়েছেন, এমন সময় ফেরেস্তা জিব্রাইল দাহ্ইয়ায়ে কালবী নামক এক ব্যক্তির রূপ ধরে নবীর সামনে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "আপনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন? কিন্তু আল্লার কসম, আমি অস্ত্র ত্যাগ করিনি।" নবী তখন জিজ্ঞাসা করলেন, " কোথায় যেতে হবে?" জিব্রাইল তখন বনি কুরাইজাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এদিকে" (মুসলীম ৪৩৬৪, বুখারী ২৬০৩)। আল্লার রসুল তৎক্ষণাৎ সবাইকে অস্ত্রসস্ত্র সহ বনি কুরাইজাদের দিকে অগ্রসর হতে হুকুম জারি করলেন। কুরাইজা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, খন্দক যুদ্ধের সময় তারা মুসলমানদের সাহায্য না করে শত্রু কোরেশ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল এবং তাদের সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সব থেকে বড় অপরাধ ছিল এই যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে নবীর আনুগত্য করেনি।

মুসলমান বাহিনীকে আসতে দেখে বনি কুরাইজারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিল এবং নবী তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। দীর্ঘ একমাস (মতান্তরে ৪৫ দিন) অবরোধের পর দুর্গের ভিতরে সঞ্চিত সমস্ত খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেল এবং কি করা হবে এই নিয়ে জোর তর্ক বিতর্ক হল। এক পক্ষ মত দিল যে, আত্মসমর্পণ করলেও মুসলমানদের হাতে মরতে হবে। তার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই ভাল। অন্য পক্ষ মত দিল যে, অল্প কিছু লোক হলে মুসলমানরা তাদের মেরে ফেলতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেহেতু তারা সংখ্যায় অনেক তাই এতগুলো নিরস্ত্র মানুষকে মুসলমানরা কখনও মারবে না, কারণ মুসলমান হলেও তারা তো মানুষ। হয়তো তাদের ধনসম্পদই শুধু কেড়ে নেবে, প্রাণে মারবে না। যাই হোক, এই শেষোক্ত

মতই গৃহীত হল এবং পরদিন সকালে কুরাইজারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল। সক্ষম পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র করে বন্দী করা হল এবং দুর্গ থেকে সমস্ত ধন-সম্পদ বাইরে এনে স্তূপীকৃত করে সাজানো হল।

মহানবী এর পর কাব ইবনে মুয়াজ নামে এক ব্যক্তির উপর কুরাইজাদের উপর আরোপিত অভিযোগের বিচারের ভার ন্যস্ত করলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, কাব ইবনে মুয়াজ কুরাইজা গোত্রের মিত্র আউস গোত্রের দলপতি ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন। ইনি একজন বদরী ছিলেন এবং খন্দক যুদ্ধে যে আঘাত পেয়েছিলেন তাতেই পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, একজন আল্লার বান্দা ও রসুলের অনুগত ব্যক্তির উপর বিচারের ভার দিলে সেই বিচারের রায় কাদের পক্ষে যাবে। তবুও বিচারের প্রহসন হল এবং বিচারক রায় দিলেন, "সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হবে এবং গণিমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" এই বিচার সম্পর্কে বলা যায় যে, আওরঙজেব যেমন দারাকে নিজে হাতে খুন করেননি, কাজীর বিচার অনুসারেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল অথবা জিয়া উল হক্ যেমন নিজের হাতে ভুট্টোকে খুন করেননি, বিচারকের রায় অনুসারেই তাকে ফাঁসীতে ঝোলানো হয়েছিল, তেমনি বিচারকের বিচার অনুসারেই কুরাইজাদের হত্যা করা হয়েছিল। বিচারের পর একটা বড় গুদাম ঘরে কুরাইজাদের বন্দী করে রাখা হল।

সেইদিন রাত্রেই মদিনার বাজারে ৮০০ লোককে মাটি চাপা দেবার মত এক বিশাল গর্ত খোঁড়া হল এবং পরদিন ফজরের নামাজের পরই কোতল পর্ব শুরু হয়ে গেল। পিছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় ৫ থেকে ৬ জন করে বন্দীকে সেই গুদাম ঘর থেকে আনা হতে থাকল এবং আলি ও নবীর আর এক চাচাত ভাই যুবায়ের(২৭) তাদের গলা কেটে পরিখার মধ্যে ফেলতে থাকল। গুদাম ঘরে বন্দীরা প্রথম দিকে বুঝতে পারেনি যে, কয়েকজন করে ডেকে ডেকে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল, একজন বৃদ্ধ ইহুদী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ডেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" তখন সে বলল, "এখনও মাথায় ঢোকেনি? যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা কি আর ফিরে আসছে? তারা তখন বুঝতে পারল এবং এক অসহায় করুণ ক্রন্দনে সে গুদাম ঘর ভরে গেল। এরা সংখ্যায় কতজন ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬০০ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৯০০

---

(২৭) প্রথম জীবনে যুবায়ের খুব গরীব ছিলেন এবং আবু বকরের বড় মেয়ে আসমাকে বিবাহ করেন। পরে গণিমতের মালের দৌলতে আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং ১০০০ ক্রীতদাসের মালিক হন।

হিসাবে বর্ণিত আছে। তবে বেশীর ভাগ বর্ণনায় ৮০০ সংখ্যা থাকাতে W. Muir সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ৮০০-কেই সঠিক সংখ্যা বলে ধরে নিয়েছেন। নারী ও শিশু মিলে ১০০০ সংখ্যা ছিল এবং নিতান্ত শিশুদের আলাদা করে সংখ্যা ধরা হয়নি, মায়ের সঙ্গেই গোনা হয়েছিল। মেয়ে বন্দীদের মধ্যে রিহানা নামে এক সুন্দরীকে নবী নিজের জন্য পছন্দ করে রাখলেন। বাকীদের মধ্যে কিছুকে নবী তাঁর সঙ্গী সাথীদের হারেমে পাঠিয়ে দিলেন এবং অবশিষ্টদের বিক্রীর জন্য নেজদ্ এ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এই হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে Sir W.Muir লিখেছেন – "The butchery began in the morning, lasted all day, and continued by torch light till the evening. Having thus drenched the market place with the blood of seven to eight hundred victims and having given command for the earth to be smoothed over their remains, Mohammad returned from the horried spectacle to solace himself with the charms of Rihana, whose husband and all her male relatives had just perished in the massacre." [২৮]

কথিত আছে যে, রিহানা ইসলাম গ্রহণ করতে বা মহম্মদের বিবাহিত পত্নী হতে অস্বীকার করেন এবং সেই কারণে নবীর রক্ষিতা হিসাবে থাকতেই বাধ্য হন এবং নবীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মারা যান। অনেকের মতে মৃত্যুর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, সকলেই স্বীকার করবেন যে, ঠাণ্ডা মাথায় ৮০০ নিরস্ত্র মানুষের বীভৎস শিরচ্ছেদ ক্রিয়া সারাদিন ধরে সামনে বসে পর্যবেক্ষণ করতে নবীকে আরো অনেক বেশী হিম্মতের পরিচয় দিতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আল আমান সাহেব তাঁর গ্রন্থে উপরিউক্ত হত্যাকাণ্ডকে নবীর হিম্মতের কাজ না বলে, মদিনার সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, ভারতীয় ধর্মগুরুদের মধ্যে এরকম হিম্মতের কাজ একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। এবং এটা খুবই সত্যি কথা যে, আল আমান সাহেব তাঁর নিজের মাতৃভূমির ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এরকম হিম্মতের অনুসন্ধান করলে খুবই হতাশ হবেন। তাঁদের মধ্যে জিহাদ্ করে পরের ধন সম্পত্তি লুটপাট করা, লুট করা গণিমতের মাল ভাগবাঁটোয়ারা করে নিজের অংশ বুঝে নেওয়া, বন্দী করে আনা মাতৃজাতিকে কলুষিত করা বা ক্রীতদাসী হিসাবে তাদের বিক্রী

(২৮) W. Muir, Life of Mahmet, Voice of India, P-319.

করে দেওয়া ইত্যাদি হিম্মতের কাজ একেবারেই অনুপস্থিত। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁদের আরাধ্য ঈশ্বরও এই সমস্ত হিম্মতের কাজে উৎসাহ দেন না।

যাই হোক, কোরবানী পর্ব শেষ হলে প্রত্যেকটা উটের শরীর থেকে কিছুটা করে গোস্ত কেটে নিয়ে নবী তা রান্না করতে হুকুম দিলেন। রান্না হয়ে গেলে তিনি, আলি ও অন্যান্য অনুচরেরা সেই মাংস ও ঝোল খেলেন। এর পর নবী ইহরাম খুলে ফেললেন, গায়ে সুগন্ধি লাগালেন[২৯] এবং নাপিতের কাছে মস্তক মুণ্ডন করতে বসলেন। প্রথমে মাথার ডানদিকের চুল কামানো হল এবং তারপর যথারীতি বাঁ দিকের চুল কামানো হল। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাজিরা আজও ডানদিকের চুল আগে কামান পরে বাঁ দিকের।

নবীই হলেন ইসলামের আদর্শ স্থল। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য পবিত্র, অপবিত্র সব কিছুরই দৃষ্টান্ত স্থল হলেন নবী। নবী গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে বলেছেন, তাই গোঁফ কামিয়ে দাঁড়ি রাখতে হবে। জমজমের পানি ছাড়া নবী দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন, তাই দাঁড়িয়ে পানি পান করা যাবে না। খাওয়ার পর নবী হাত চেটে পরিষ্কার করতেন তাই হাত চেটে পরিষ্কার করতে হবে। পাজামার ঝুল গোড়ালী ঢেকে ফেললে নবী তাকে অহমিকার প্রকাশ বলে মনে করতেন, তাই খাটো ঝুলের পাজামা পরতে হবে। নবী বলতেন যে, যে দাবা খেলে তার হাত শূয়োরের রক্তে মাখামাখি হয়, তাই দাবা খেলা যাবে না। কেউ মারা গেলে কান্নাকাটি করা নবী পছন্দ করতেন না, তাই তা করা যাবে না, শুধু নীরবে চোখের জল ফেলা যাবে। তাও মেয়েরা একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে তিনদিনের বেশী পারবে না।[৩০] নবী শুধু বিনা প্রতিবাদে বিশ্বাস পছন্দ করতেন, তর্ক পছন্দ করতেন না , তাই তর্ক করা চলবে না। নবী কুকুর পছন্দ করতেন না, তাই কুকুর পোষা চলবে না।[৩১] সেই রকম নবী মনে করতেন যে, মানুষের পুণ্য ডানদিকে জমা হয় আর পাপ বাঁদিকে জমা হয়, তাই সব শুভ কাজ ডানহাতে করতে হবে বা ডানদিক থেকে শুরু করতে হবে। এর অবশ্য অন্য আরেকটা কারণও আছে। ফেরেস্তারা সব কাজ ডানহাতে করে কিন্তু শয়তান বাঁহাতে করে। তাই শুধু ডানহাতেই খাওয়া

---

(২৯) আয়েষা বলতেন নবী তিনটি জিনিস পছন্দ করেন, নারী, সগন্ধি ও ভাল খাবার (W. Muir, ibid, P-528).

(৩০) নবীর পত্নী উম্মে হাব্বিার পিতা আবু সুফিয়ান মারা গেলে তিন দিন পর তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গালে সুগন্ধি লাগিয়ে শোকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন (মুসলীম-৩৫৩৯, ৩৫৫২)।

(৩১) নবীর আদেশে মদিনার সব কুকুর মেরে ফেলা হয় (মুসলীম-৩৮১০, ৩৮১১)। নবী বলতেন যে, যে সব কুকুরের চোখের উপরে দাগ আছে তারা শয়তানের প্রতিমূর্তি (মু-৩৮১৩)।

দাওয়া করতে হবে। যে বাঁহাতে খায় সে শয়তানকে অনুসরণ করে।[৩২] তাই প্রস্রাব করার সময় পুরুষাঙ্গ ডানহাতে ধরা যাবে না, বাঁহাতে ধরতে হবে।

আমাদের মত বিধর্মীর কাছে নবীর অনেক কাজ অপবিত্র, নিষ্ঠুর বা অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমানের দেখার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর কাছে নবীই হলেন পাপ-পুণ্য, পবিত্র-অপবিত্র, ন্যায়-অন্যায়, সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই নবী যা করেছেন তাই পবিত্র, তাই ন্যায় এবং তাতেই পুণ্য। নবী যা করেননি বা করতে নিষেধ করেছেন তাই পাপ, অপবিত্র ও অন্যায়। যিনি আল্লার রসুল, যার কাছে দিনে-রাত্রে আল্লার বাণী অবতীর্ণ হয়, তিনি পাপ, অপবিত্র বা অন্যায় কাজ কখনই করতে পারেন না। যেমন আল্লা কোরানে বলেছেন, "ঋতুর সময় মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাক (২/২২২)।" কিন্তু আল্লার রসূল ঋতুমতী আয়েশার সঙ্গে এক বিছানায় শুতেন এবং তাঁর কোলে মাথা রেখে কোরান আবৃত্তি করতেন। মুসলমান ভাষ্যকারদের মতে নবী এক বিছানায় শুলেও মাঝখানে একটা চাদর রাখতেন (মুসলীম ৫৮০,৫৯১)। তাছাড়া অন্যান্য ঋতুমতী স্ত্রীদের তিনি চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি করতেন (মুসলীম ৫৭৭)।

ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। নবীর জীবিতাবস্থায় এই অপরাধের সাজা ছিল ৪০ ঘা বেত এবং ওমর খলিফা হবার পর তিনি তা ৮০ঘা বেত করেন। কিন্তু কাঁচা-পাকা খেজুর গেঁজিয়ে তৈরি নাবিজ নামে একপ্রকার পানীয় নবী নিয়মিত পান করতেন। সকালের তৈরি নাবিজ রাত্রে বা তার পরদিন অথবা রাত্রের তৈরি নাবিজ পরদিন পান করতেন। বিদায় হজের সময় জমজমের পবিত্র পানি পান করার পর নবী নাবিজ পান করেন।[৩৩] ইসলামী আইন অনুসারে কোন একজনের পক্ষে অন্য কারও লজ্জাস্থান দেখা নিষেধ। কিন্তু সহবাসের পর নবী যখন স্ত্রীদের সঙ্গে এক সঙ্গে গোসল করতেন তখন হয়তো এই নিষেধের উল্লঙ্ঘন হত।[৩৪] যেমন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে অপবিত্র বা জুনুব অবস্থায় মসজিদে গেলে পাপ হয়, কিন্তু নবী বলতেন যে, তিনি এবং আলি জুনুব অবস্থায় মসজিদে গেলে পাপ হয় না (তিরমিজি (২) ১৫৮৪)। যেমন নবী বলতেন যে তিনি অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হন নি, বরং শুধু দয়া প্রকাশের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি অভিশাপ দিয়ে বলতেন, "হে আল্লা, ইউসুফের (বাইবেলের জোসেফ) সময় যেমন করেছিলেন তেমনি ওদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) জন্য সাতবার দুর্ভিক্ষ আনয়ন

(৩২) বাঁ হাতি মুসলমানদের জন্য কি ব্যবস্থা?

(৩৩) মুসলীম-৪৯৭১, ৪৯৭৭, ৬৬৭

(৩৪) মুসলমান ভাষ্যকারদের মতে গাঢ় অন্ধকারে এই গোসলপর্ব সম্পন্ন হত।

করুন যাতে ওরা ক্ষুধার জ্বালায় মরা পশুর মাংস, চামড়া খেতে বাধ্য হয় (মুসলীম ৬৭১৯, ১৪২৮, ১০৮২ এবং কোরান ৩৩/৬৮)।

প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হল আল্লার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করা, বিচার করা নয়। কারণ আল্লা বার বার বলেছেন, "আল্লা ও তাঁর রসুলকে অনুসরণ কর (৪/৮০, ৮/২০, ৮/২৭, ৮/৪৬) এবং তা না হলে নরকের মর্মন্তুদ শাস্তি অপেক্ষা করে আছে (৯/৬৩)। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আল্লার রসুলকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় এবং সেই ক্ষেত্রে মুসলীম সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার আশঙ্কা আছে। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে মুহরীম অবস্থায় নবী বিবি মাইমুনাকে বিবাহ করেছিলেন। নবীর এই সুন্নত অনুসরণ করে আজকের লক্ষ লক্ষ হাজীরা মক্কায় হজ করার সময় যদি একটা করে বিবাহ করবেন স্থির করেন তাহলে কি ধরনের গোলমাল শুরু হবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। এই রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া চলতে পারে, যে সব কাজ নবী করে গেছেন উম্মতরা তা সুন্নত হিসাবে অনুকরণ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

তেমনি এমন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা নবী করেননি কিন্তু মুসলমানদের জন্য ফরজ করে গেছেন, যেমন জাকাত। এমন কি যে খৎনা প্রথা তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র ছয়টি সুন্নতের মধ্যে একটি বলে নির্ধারিত করে গেছেন, সেই খৎনা সম্ভবত নিজে করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কর্তব্য অকর্তব্য নিয়ে বিচার করতে গেলে পথ হারিয়ে ফেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কাজেই ইসলামে বিচার-বিবেচনা, যুক্তি-তর্ক নিষিদ্ধ। যা কিছু বিচার বিবেচনা সবই তো স্বয়ং নবী করে গিয়েছেন। তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানী কে হতে পারে? তার উপরে রয়েছে কোরান শরীফ, স্বয়ং আল্লার বাণী। তাকে প্রশ্ন করবে কে ? কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তব্ধ করে রাখতে হবে। আরবের একজন বেদুইন যতখানি মস্তিষ্ক চালনা করতে পারে তার বেশী মস্তিষ্ক চালনা করা যাবে না। আর কতদিন ভারতের মুসলীম সমাজ বুদ্ধিবৃত্তির এই দাসত্ব করবে?

উপরিউক্ত বিশ্বাসের ব্যাপারে বর্তমান লেখকের ধারণা হল এই যে, ঐ বিশ্বাসের প্রেরণা বা প্রয়োজনীয়তা লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। একটা আঙুরের গুচ্ছ যতই সুদৃশ্য হোক না কেন, ঝুলে থাকে ক্ষীণ একটা বোঁটার উপর নির্ভর করে। সেই রকম ইসলামের পুরো কাঠামোটা ঝুলে আছে একটা বিশ্বাসের ওপর। কলেমা তৈয়ব বা লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লার ওপর। যদি এই বিশ্বাসে চিড় ধরে তবে সমগ্র ইসলাম মুখ থুবড়ে পড়বে এবং সেই কারণে এই বিশ্বাসকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেমন সৌখিন এবং ভঙ্গুর একটা কাঁচের জিনিসকে অতি

সাবধানে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যে সমস্ত কারণে এই বিশ্বাসে চীড় ধরতে পারে তাকে দূরে রাখতে হবে। যে সমস্ত বই পড়লে এই বিশ্বাসে চীড় ধরতে পারে সে সমস্ত পুস্তককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যে সমস্ত লোকের কথা শুনলে বিশ্বাসে চীড় ধরতে পারে তাদের হত্যা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল আমান সাহেবের একটা মন্তব্য স্মরণ করা চলতে পারে। তিনি তাঁর "কাবার পথে" গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, "আমাদের আছে এক আল্লা, এক নবী, এক কোরান এক কাবা.....।" অর্থাৎ এর যে কোন একটার উপর বিশ্বাস নষ্ট হলে ইসলামের পক্ষে যে টিকে থাকা মুশকিল হবে, তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে এই নির্মম সত্যটাই বেরিয়ে আসে।

যাই হোক, মস্তক মুণ্ডন শেষ হলে নবী তাঁর কেশ মুবারকের প্রধান অংশ উপহার হিসাবে আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইমাকে দান করলেন। কিছু অংশ তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। Sir W. Muir-এর মতে এই কেশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। কাশ্মীরের হজরৎবাল দরগায় নবীর যে পবিত্র কেশ রক্ষিত আছে তা মাথার চুল নয়, দাড়ি (বর্তমান ১৭/১১/৯৩)। এরপর নবী আরও তিনদিন মক্কায় অবস্থান করলেন, শয়তানের উদ্দেশে রমি করলেন, সাফা মারোয়ায় সায়ী করলেন, কাবা শরীফে তাওয়াফ নামাজ করলেন এবং এইভাবে আজকের হাজীরাও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে রমি, সায়ী, তাওয়াফ ইত্যাদির পর জমজমের পানি পান করার মধ্য দিয়ে হজ ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। এরপর অনেকে মদিনায় নবীর পুণ্য স্মৃতি বহনকারী কিছু কিছু স্থান দর্শন করতে যান, তবে তা হজ ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা হল, হজ ক্রিয়া সহ অন্যান্য ধর্মাচরণের মধ্যে মুসলমান সমাজ কাবাকে যে প্রাধান্য দেন তা কি পৌত্তলিকতা নয়? আগের ৩৬০টি প্রতিমার বদলে কাবার কাঠামোটাই কি প্রতিমার রূপ নেয়নি? শুধু মানব-মানবীর আকৃতিবিশিষ্ট প্রতিমা একটা চৌকো ঘরের আকার নিয়েছে এইমাত্র। একটা হিন্দুর ঘরের দক্ষিণেশ্বর বা কালীঘাটের মন্দিরের ছবি আর মুসলমানের ঘরের কাবা বা মসজিদ নববীর ছবির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? ইসলামের নবীদের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নবীরা সেই অতীত কাল থেকে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসছেন এবং এটাই তাদের একমাত্র কাজ। বহুবার বহু নবী মূর্তিপূজা বন্ধ করেছেন কিন্তু মানুষ আবার মূর্তিপূজা শুরু করেছে। এই কারণে বারে বারে নবী পাঠাবার প্রয়োজন হয়েছে।

এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মূর্তিপূজা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং একে

দমন করা সম্ভব নয়। খ্রীস্টধর্মে মূর্তিপূজা করা নিষেধ, কিন্তু খ্রীস্টানরা ঈশা ও মা মেরীর মূর্তিপূজা করছেন। নবী মহম্মদ মূর্তিপূজা বন্ধ করেছেন তাই মুসলমানরা মানব মানবীর মূর্তির বদলে কাবাগৃহের পূজা করছেন। মানুষের মূর্তিপূজার প্রবৃত্তি উচুঁতে রাখা জলের মত, কোন না কোন ভাবে, চুঁইয়ে হোক, গড়িয়ে হোক, নীচে নেমে আসবেই। একে রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। প্রিয়জনের ফটো ঘরে রাখা কি কেউ বন্ধ করতে পারবে? তাহলে ফটোগ্রাফী শিল্পকেই বিদায় জানাতে হবে। কিন্তু প্রিয়জনের ছবি রাখার এবং মূর্তিপূজার প্রেরণা একই। তাই একে রোধ করা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে হাজীদের হাজরে আসোয়াদ পূজন ও হিন্দুর শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা পূজনের মধ্যেকার সাদৃশ্যও লক্ষ্য করার বিষয়।

উপরিউক্ত হজ ক্রিয়া সম্পর্কে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। যে হজ ক্রিয়া আজ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তা ইসলামের অবদান নয়। মক্কা দখলের আগে হুদাই বিয়ার চুক্তির মাধ্যমে প্রাক্-ইসলামী হজ ক্রিয়াকে অটুট রাখা হয়েছে। শুধু হাজরে আসোয়াদ বাদে অন্য ৩৬০টি মূর্তিকেধ্বংস করা হয়েছে। যে কেউ এই হজ ক্রিয়াকে একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে কিছু ভারতীয় বা হিন্দু প্রথার অস্তিত্ব দেখতে পাবেন। হাজরে আসোয়াদের মধ্য দিয়ে শিবলিঙ্গ পূজন ছাড়াও, সেলাই বিহীন কাপড় পরা (হইরাম বন্ধন), মস্তক মুণ্ডন করা এক কাবাকে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করা ইত্যাদি প্রথাগুলি প্রাক্-ইসলামী আরবে হিন্দু সংস্কৃতির অস্তিত্বের কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং যে সব ভারতীয় মুসলমানরা দিন-রাত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নিন্দা করেন, তাঁরা সেই হিন্দু রীতি পালন করতেই মক্কায় হজ করতে যান এতে কোন সন্দেহ নেই।

জান্নাত বা স্বর্গ

আরবীতে স্বর্গ ও নরকের নাম যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নম। কিন্তু এই নাম থেকে ফার্সী বেহেস্ত ও দোজখ'ই বর্তমানে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামী মতে মক্কার কাবা গৃহ পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবীর ঠিক উপরেই যেহেতু স্বর্গের অবস্থান, তাই কাবার ঠিক উপরেই স্বর্গের কেন্দ্র। পৃথিবীর থেকে স্বর্গের দূরত্ব ৫০০ বছরের পথ[৩৫]। কিন্তু ৬০০ (মতান্তরে ৬ লক্ষ) ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তা জিব্রাইল ঐ দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করেন। কথিত আছে যে কোরানের কোন বাণী পৃথিবীতে অবতীর্ন করার ইচ্ছা হলে আল্লা তা প্রথমে হজরৎ জিব্রাইলকে বলতেন এবং তিনি সেই বাণী নিয়ে সকালবেলা স্বর্গ থেকে রওনা দিতেন। বিকাল নাগাদ পৃথিবীতে পৌঁছে সে বাণী আল্লার রসুলকে পৌছে দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আবার রওনা দিতেন এবং পরদিন ভোরবেলা স্বর্গে পৌছে যেতেন। নবীর মদিনা বাস কালে এত বাণী অবতীর্ণ হত যে জিব্রাইলকে প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াত করতে হত। নবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য জিব্রাইল বিশেষ ভাবে মসজিদ নব্বীর বাবে জিব্রাইল নামক তোরণ ব্যবহার করতেন এবং অত্যধিক ব্যবহারের ফলে ঐ তোরণের সামনে জিব্রাইলের পায়ের চিহ্ন পড়ে পড়ে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে কেয়ামতের দিন স্বর্গ আর অতদূরে থাকবে না । ঐ দিন আল্লা স্বর্গ ও নরককে পৃথিবীর নিকটবর্তী করবেন।

স্বর্গের আটটি দ্বার বা আট শ্রেণীর স্বর্গ আছে এবং এদের নাম যথাক্রমে (১) খেল্দ, (২) দারস্ সালাম, (৩) দারুল, (৪) অদন, (৫) নঈম, (৬) মাওয়া, (৭) অলঅইন ও (৮) ফেরদৌস। নবীদের জন্য উচ্চতর স্বর্গের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এবং নিম্নতর স্বর্গের স্বর্গবাসীরা উচ্চতর স্বর্গের স্বর্গবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখবে যেমন করে লোকে আকাশের তারা দেখে। মহম্মদ ও তাঁর প্রিয় উম্মতরা যে স্বর্গে থাকবেন তা পূর্ণচন্দ্রের মত হবে, তার পরের লোকেরা ক্ষুদ্র তারকার মত স্বর্গে থাকবে এবং এইভাবে স্বর্গের জ্যোতি কমতে থাকবে। পৃথিবীতে আল্লা যা যা নিষিদ্ধ করেছেন স্বর্গে তিনি তা সবই বৈধ করবেন —যেমন, রেশমের জামাপরা, মদ্যপান ইত্যাদি।

আল্লা বলেন যে, তিনি সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন জিনিস (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছেন যা মানুষ কোনদিন চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, এমন কি মনে কল্পনাও করেনি। বেহেস্তের বুনিয়াদ্ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সারের উপর, চুন

(৩৫) কোরান শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ৪৬৭

অত্যন্ত সুগন্ধি কস্তুরী এবং সুরকি হল মুক্তা ও পদ্মরাগ মণি। যে ব্যক্তি ওতে প্রবেশ করবে সে সব সময় সুখে থাকবে এবং অমর হবে। তার বস্ত্র জীর্ণ হবে না এবং যৌবন লুপ্ত হবে না। সেখানে আছে নির্মল পানির নহর (খাল), অপরিবর্তনীয় স্বাদসম্পন্ন দুধের নহর, সুস্বাদু সুরার নহর, পরিশোধিত মধুর নহর, আর আছে বিবিধ ফলমূল। সেই সব ফল-মূল পার্থিব ফল-মূলের মত দেখতে হলেও স্বাদ স্বর্গীয়। স্বর্গীয় সুরা স্বর্গবাসীরা যতই পান করুক না কেন, কখনই মাতাল হবে না। স্বর্গের নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীতল জলের নদী। স্বর্গে আর থাকবে গাছের সুশীতল ছায়া। স্বর্গে একটা গাছ আছে, সেই গাছ এত বিশাল ছায়া দেবে যে তা অতিক্রম করতে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর ১০০ বছর লাগবে। স্বর্গে মৃদুমন্দ উত্তুরে বাতাস বইবে এবং সেই হাওয়ার সুগন্ধ স্বর্গবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদকেও সুগন্ধিত করবে। এমন সুন্দর স্বর্গে প্রবেশ করে স্বর্গবাসীরা যার পর নাই খুশী হবে এবং আল্লা তাদের ছাড়া আর কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেননি বলে তাঁর প্রশংসা করবে। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে স্বর্গ স্বর্গবাসীদের সংকীর্ণ মনকে উদার করতে পারবে না।

আল্লা জান্নাতের বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর সমান করেছেন এবং তাঁর দৈর্ঘ্য একমাত্র আল্লাই জানেন। কেয়ামতের দিন আল্লা তাকে আরও বিস্তৃত করবেন যাতে পৃথিবীর সকল মানুষ (এখানে মানুষ বলতে মুসলমান কারণ পরে দেখা যাবে যে আল্লা সব অ-মুসলমানকেই নরকে নিক্ষেপ করবেন।) সেখানে বাস করতে পারে। প্রত্যেক বেহেস্তের ১০০ করে দরজা থাকবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব হবে ৫০০ বছরের পথ, আর তার মধ্যে সদা প্রবাহিত নির্ঝরিণী থাকবে এবং সেখানকার ফল যে যখন চাইবে তখনই পাবে।

সেখানে অপ্সরা-সদৃশ পুণ্যময়ী রমণীরা রয়েছে। আল্লা তাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তারা দেখতে মরকৎ প্রবালের মত। আনত নয়না সেই সব নারীরা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। জীন বা মানবের মধ্যে কেউ তাদের ইতিপূর্বে স্পর্শ করেনি। তাদের স্বামীরা যখনই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে তখনই তাদের কুমারী দেখতে পাবে। তাদের গলায় থাকবে ৭০টি করে নানা রঙের হার, কিন্তু সেগুলো তাদের কাছে একটা কেশের মত হাল্কা মনে হবে। তাদের মাথার চুল মুক্ত ও পদ্মরাগমণি দ্বারা সুশোভিত থাকবে। বেহেস্তের নারী বা হুরীদের মধ্যে কাউকে যদি পৃথিবীতে নিয়ে আসা যেত তবে তার দেহভরা মৃগনাভির গন্ধে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেত। তার সৌন্দর্যে সূর্য-চন্দ্র ম্লান হয়ে যেত। স্বর্গে এমন তাঁবু থাকবে যা একটা মুক্তো খোদাই করে তৈরি এবং তার ব্যাস হবে ৬০ মাইল। ঐ তাঁবুর প্রত্যেক কোনায় একজন করে হুরী থাকবে।[৩৬]

---

(৩৬) হুরীদের সম্পর্কে আরও বিপদ বিবরণের জন্য কোরান-(২/২৫), (৪৭/১৫), (৫২/১৯-২৮), (৫৫/৫৮-৭৮), (৫৬/২২-২৮) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

একজন স্বর্গবাসী কতজন করে হুরী ভাগে পাবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে তা পৃথিবীর গনিমতের মালের চেয়ে যে বেশী হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আবদুল্লা বিন ওমরের মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসীর ৫০০ হুরী, ৪০০ কুমারী এবং পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছে এমন আরও ৬০০০ অন্যান্য রমণী থাকবে।[৩৭] আবু হোরায়রার মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমানের একটা করে মুক্তার প্রাসাদ থাকবে। সেই প্রাসাদে ৭০টা চুনীর বাড়ি থাকবে। প্রত্যেক বাড়িতে ৭০টা করে মরকতের ঘর থাকবে। প্রত্যেক ঘরে ৭০টা করে আরাম কেদারা থাকেব। প্রত্যেক আরাম কেদারায় ৭০টা করে বিভিন্ন রঙের কার্পেট থাকবে এবং প্রত্যেক কার্পেটে একজন করে হুরী বসে থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক ঘরে ৭০ জন করে দাসী থাকবে। এই সব হুরী এবং দাসীরা যে সমস্ত জামা কাপড় পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে এবং ঐ স্বর্গবাসী মুসলমান এদের সকলের সঙ্গে যৌন মিলন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া স্বর্গে থাকবে নারী কেনা বেচার হাট যেখানে স্বর্গবাসীরা ইচ্ছামত পছন্দসই নারী কিনতে পারবে। অনেকের মতে এই সব হুরীদের সঙ্গে স্বর্গবাসীর সঙ্গমকাল ৬০০ বছর স্থায়ী হবে।[৩৮] প্রত্যেক স্বর্গবাসী কতজন করে দাস পাবে সে ব্যাপারেও মতভেদ আছে। তবে তা ১০০০ এর কম নয়, এবং ৮০,০০০ এর বেশী নয়। এরা সবাই কিশোর বয়সের হবে এবং বয়স বাড়বেও না, কমবেও না, চিরকাল কিশোর থাকবে (৭৬/১৯)।

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং পরবর্তী দল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্তি মান। স্বর্গবাসীদের মল মূত্র ত্যাগের কোন প্রয়োজন হবে না এবং তাদের মুখে থুতু ও নাকে শ্লেষ্মার উৎপত্তি হবে না। তাদের চিরুনীখানা পর্যন্ত সোনার হবে। তাদের গায়ের ঘাম মৃগনাভির মত সুগন্ধি যুক্ত হবে। তারা সবাই আদমের আকৃতি বিশিষ্ট হবে (অর্থাৎ ষাট হাত দীর্ঘ হবে)। তারা মিহি পুরু রেশমের পোষাক পরে মুখোমুখি হয়ে বসবে। অনেকের মতে স্বর্গে ছেলে মেয়ে সকলের বয়সই তেত্রিশ হবে। আবার অনেকের মতে ছেলেদের বয়স তেত্রিশ কিন্তু মেয়েদের বয়স ষোল হবে এবং এই বয়স বাড়বেও না কমবে না। স্বর্গে কেউ কারও পিছন দেখতে পাবে না, যে ভাবেই দেখুক না কেন সব সময় অপর জনের মুখ দেখতে পাবে। পৃথিবীর মতো স্বর্গে কোন ভ্রাতৃবিদ্বেষ থাকবে না এবং স্বর্গবাসীরা যখন চলবে তখন তাদের বসবার আসনও চলবে। স্বর্গে প্রবেশের আগে সবাইকে সরাৎ নামক এক সংকীর্ণ সেতু পার হতে হবে এবং তখন ভয়ানক অন্ধকার থাকবে। যেহেতু সমস্ত পুণ্য ডান দিকে সঞ্চিত হয় তাই তখন ডান দিক থেকে স্বর্গীয় আলো বিচ্ছুরিত

(৩৭) এদের সকলের সঙ্গে তার মিলিত হবার ক্ষমতা থাকবে।

(৩৮) Moksa, A. Huxley, P 112, (As Quoted in Understandning, Islam Through Hadis, Ram Swarup, P 205)

হবে। স্বর্গে প্রবেশ করার পর স্বর্গবাসীদের সর্বপ্রথম মাছের কলজে ভাজা দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে।

হিজরতের সময় মহম্মদের মদিনায় পদার্পনের সংবাদ পাওয়া মাত্র আবদুল্লা ইবনে সালাম নামে ইহুদী আলিম (পণ্ডিত) সেখানে উপস্থিত হল এবং মহম্মদ সত্যি সত্যিই আল্লার রসুল কি না বাজিয়ে দেখে নেবার জন্য নবীকে তিনটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন প্রশ্ন করে বসল। সে আরও বলল যে , এই প্রশ্ন তিনটির সন্তোষজনক জবাব পেলেই তারা তাঁকে আল্লার রসুল বলে স্বীকার করে নেবে। সেই জটিল প্রশ্ন তিনটি হল, (১) কেয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত কি ? (২) জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম কি খাদ্য গ্রহণ করবে এবং (৩) কি কারণে সন্তান কখনও বাবার মত আবার কখনও মায়ের মত হয়? প্রকৃত পক্ষে প্রশ্নগুলির জবাব নবীর জানা ছিল না।

অকস্মাৎ ফেরেস্তা জিব্রাইল সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নবীর কানে কানে জবাবগুলো বলে দিলেন। নবী তখন বললেন, (১) কেয়ামতের প্রথম আলামত হল আগুন যা মানুষকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সমবেত করবে। (২) জান্নাতে প্রবেশ করার পর স্বর্গবাসীদের প্রথম খেতে দেওয়া হবে মাছের কলিজা এবং এই কলিজা এত বড় হবে যে, একটা কলিজা ৭০,০০০ লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। (৩) স্ত্রী ও পুরুষের মিলন কালে যদি স্ত্রীর আগে পুরুষের বীর্যপাত হয় তাহলে সন্তান বাপের মত হয়। উল্টোটা হলে মায়ের মত হয় (বুখারী ৩৬৪৮)। এই জবাব পাবার পর সেই ইহুদী আলিম বুঝতে পারল যে মহম্মদের পাণ্ডিত্য একজন নবী হবার পক্ষে যথেষ্টই বটে। জবাব শুনে সে যার পর নাই আহ্লাদিত হল এবং তৎক্ষণাৎ মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করে ইসলাম কবুল করল। এই প্রশ্নোত্তর থেকে সেমিটিক ধর্মমতগুলির তাত্ত্বিক গভীরতা কোন পর্যায়ের তাও পাঠক কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন।

যাইহোক, স্বর্গে জিহাদকারীরা বিশেষ ভাবে সম্মানিত হবে এবং আল্লা ফেরেস্তাদের আদেশ দেবেন স্বর্গের দরজায় তাদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য। তারপর তাদের সৌরভময়, স্বর্ণময়, সর্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে। এ ছাড়া আল্লা এক দিনের জিহাদকে এক হাজার দিন নামাজ পড়ার সমান করে দিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লার এই সমস্ত সিদ্ধান্তই ধর্মান্ধ মৌলবাদী মুসলীম সন্ত্রাসবাদীদের পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসাত্মক কাজ কর্মে প্রেরণা যোগাচ্ছে। আফগানিস্তানের তালিবান মিলিশিয়া, কাশ্মীরের জঙ্গীরা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জঙ্গী মুসলীম গোষ্ঠীগুলো এই অনুপ্রেরণাতেই তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সৌদি আরবের এবং বর্তমানে সুদানে নির্বাসিত জঙ্গীবাদী নেতা ওসামা বিন লাদেন এর কাজ কর্ম কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীকে উক্ত ওসামা বিন লাদেন আরবের টাকা সরবরাহ করে থাকে।

ওসামা বিন লাদেনের বাবা সৌদি আরবের ধনী স্থপতি ছিল এবং মরার সময় প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের সম্পত্তি রেখে যায়। ওসামা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রায় ৩০ কোটি ডলারের মালিক হয়। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বিধর্মী আমেরিকান বাহিনীকে আরবের পবিত্র ভূমি থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেবার জন্য ওসামা সৌদির রাজা ফাদ এর সমালোচনা করে। এ জন্য ওসামা সৌদি থেকে নির্বাসিত হয়। ফলে সে সুদানে গিয়ে আশ্রয় নেয় নানা রকম ব্যবসার দ্বারা অনেক টাকার মালিক হয় এবং বিশ্বব্যাপী মুসলীম জঙ্গী গোষ্ঠীগুলিকে টাকা সরবরাহ করতে শুরু করে। এর লোকজন ১৯৯৫ সালে আরবের রিয়াদে অবস্থিত আমেরিকান যুদ্ধ ঘাঁটিতে বিস্ফোরণ ঘটায়। যার ফলে বহু লোক হতাহত হয়।

১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সময় থেকেই জিহাদকারী হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, ওসামা আরবের বা উপসাগরীয় অঞ্চলের কোন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে পবিত্র জিহাদের জন্য চাঁদা চাইলে তাকে ১০ লক্ষ ডলারের কম চাঁদা দেওয়া যায় না। তার টাকায় উত্তর সুদানে তিনটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির চলে যাতে মিশরের জঙ্গীরা সামরিক শিক্ষা পায় । পাকিস্তান আফগানিস্তানের সীমান্তেও ওসামার টাকায় বেশ কয়েকটি ঐ রকম সামরিক প্রশিক্ষাকেন্দ্র চলে যেখানে তালিবান জঙ্গীরা এবং কাশ্মীরের জঙ্গীরা প্রশিক্ষণ লাভ করে। মিশরের দৃষ্টিহীন জঙ্গী ধর্মান্ধ ওমর আব্দুল রহমান ওসামার অর্থ সাহায্যেই ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিস্ফোরণ ঘটায়। উক্ত ওমর আব্দুল রহমান ও আরও ২২ জন জঙ্গী নিউইয়র্ক শহরের লিঙ্কন টানেল, হল্যান্ড টানেল, জর্জ ওয়াশিংটন সেতু এবং আরও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটাবার এক ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করে। কিন্তু আমেরিকার ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন তা ধরে ফেলে এবং ১৯৯৫-এর সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার আদালত ওমর ও তার ২২ জন সঙ্গীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। উক্ত পরিকল্পনার সমস্ত অর্থ ওসামা বিন লাদেনই সরবরাহ করে বলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। আজ ভারতের মাটিতে যে সব মুসলীম জঙ্গী গোষ্ঠীরা বোম্বাইয়ের বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারীতে কোয়েম্বাটুর শহরে যে সব ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তার পিছনে ওসামা বিন লাদেনের অর্থ সাহায্য ছিল না ও কথা জোর দিয়ে অস্বীকার করা যায় না। গত ১৯৯৮ সালের ৭ই আগস্ট নাইরোবি ও দার এস সালাম শহরের মার্কিন দুতাবাসগুলিতে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতেও ওসামা বিন লাদেনের হাত ছিল।

স্বর্গে মোট ১২০ টি শ্রেণী আছে এবং যেহেতু একমাত্র মুসলমানরাই অংশীবাদী নয় এবং নামাজ, রোজা ইত্যাদির দ্বারা পূণ্য সঞ্চয় করেছে, তাই তার মধ্যে অর্ধেক, অর্থাৎ ৬০টি শ্রেণী শুধু তাদের জন্যই সংরক্ষিত করে রাখা

আছে। অন্য ৬০টি শ্রেণী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করা হবে। (কিন্তু পরে দেখা যাবে যে কলেমা গ্রহণকারী মুসলমানরাই সমস্ত স্বর্গ অধিকার করে বসবে।) স্বর্গে বৃহদাকার দুটো উদ্যান আছে, একটার নাম অদন এবং অন্যটার নাম নঈম। দুই উদ্যানের দৈর্ঘ প্রস্থ ১০০ বছরের পথ। দুই উদ্যানেই সুরম্য আবাস, স্বর্গীয় ফল আর স্বর্গীয় হুরী আছে। অদন ঈশ্বরভীরু মানুষ অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য এবং নঈম ঈশ্বরভীরু জীনদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা আছে।

কোন বালিকা স্বর্গবাসী হলে স্বর্গের নির্ধারিত বয়স (১৬ বা মতান্তরে ৩৩ বছর) না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপর তাকে তার স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোন বৃদ্ধা স্বর্গবাসী হলে তারও বযস কমিয়ে ১৬ (বা ৩৩) করা হবে এবং তার স্বর্গবাসী পার্থিব স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। পৃথিবীতে তার কোন স্বামী না থেকে থাকলে তাকে অন্য কোন স্বর্গবাসীর পত্নী করা হবে। কিন্তু মানুষের জীবন বিচিত্র। এই দুই রকমের নারী ব্যতীত আরও অনেক জটিল সমস্যাযুক্ত নারী স্বর্গবাসী হতে পারে। তাদের জন্য কি ব্যবস্থা? ব্যবস্থা আছে। যেমন ধরা যাক সেই রমনীর স্বামী ছিল কিন্তু পাপ কাজের জন্য নরকে পড়ে আছে, স্বর্গে আসতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে সেই রমনীকে অস্থায়ীভাবে কোন স্বর্গবাসীর পত্নী করা হবে। কিন্তু কোন দিন সেই পার্থিব স্বামী স্বর্গবাসী হলে আবার তার হাতেই তাকে তুলে দেওয়া হবে। এমন হতে পারে যে কোন স্বর্গবাসী রমনীর একাধিক পার্থিব স্বামী ছিল, সে ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা? সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হল, সর্বশেষ পার্থিব স্বামীই স্বর্গে স্বামী বলে গণ্য হবে। তবে এক দিক দিয়ে রক্ষা এই যে, এই রকম জটিল অবস্থার খুব বেশী সৃষ্টি হবে না কারণ মেয়েরা বেশীরভাগই নরকগামী হবে।

কোন শোকাবহ ঘটনা ঘটলে স্বর্গ কাঁদে এবং স্বর্গ কাঁদলে আকাশ রক্তবর্ণ হয়। কারবালার প্রান্তরে হজরৎ হোসেনের মৃত্যু হলে স্বর্গ কেঁদেছিল। পূর্ববর্তী নবী হজরৎ মুসা ইন্তেকাল করলে স্বর্গ এক নাগাড়ে ৪০ দিন কেঁদেছিল। স্বর্গে গিয়েও বিশ্বাসীদের নিয়মিত নামাজ, রোজা, খৎনা ইত্যাদি করতে হবে কি না তার কোথাও উল্লেখ নেই। তবে মনে হয় তার আর প্রয়োজন হবে না কারণ স্বর্গে যাবার জন্যই তো নামাজ, রোজা ইত্যাদি।

কেয়ামত ও নরক

পবিত্র কোরানে কেয়ামত ৩০০ বার, নরক ২৯৭ বার এবং স্বর্গ ৬৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী কিয়ামাহ্ শব্দের অর্থ দাঁড়ানো, তাই কেয়ামত এর আক্ষরিক অর্থ করা যায় দাঁড়ানোর দিন। এর অবশ্য অন্য নাম আছে যেমন শেষ বিচারের দিন বা ইয়ামুল আখির অথবা বিচ্ছেদের দিন বা ফজল ইত্যাদি। প্রাক ইসলামী আমলের জাহেলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরা মনে করতো মৃত্যুই জীবনের শেষ [৩৯] কিন্তু ইসলাম বলল যে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর পরে পরলোক এবং পুনর্জীবন আছে। আল্লা একদিন কেয়ামত বা শেষ বিচার করবেন। সেই দিন সকলে কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। আল্লা ঐদিন তাদের পার্থিব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করবেন এবং সেই বিচার অনুযায়ী পাপীরা অনন্ত নরকে এবং পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গে স্থান পাবে। তবে বিশ্বাসীদের, যেহেতু তারা অংশীবাদী নয়, অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। পাপ কাজের জন্য নির্দিষ্টকাল নরক ভোগ করার পর তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্ত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ করবে।

কেয়ামতের দিন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে এবং স্বর্গীয় শিঙায় ফুঁ দেবার সাথে সাথে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। সে দিন আল্লার পরাক্রম দেখে কারও মুখে কথা ফুটবে না। তিনি সে দিন এক হাতে পৃথিবী ও অন্য হাতে আকাশকে তুলে ধরে বলবেন, "আমিই দুনিয়ার মালিক, কোথায় আর সব প্রভুরা।" তখন সমস্ত পাহাড় পর্বত ধূলোর মত গুড়ো গুড়ো হয়ে বাতাসে ভাসতে থাকবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং গুড়ো গুড়ো হয়ে ভেঙে পড়বে। (আকাশকে ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। স্বর্গ যেহেতু আকাশের উপরে অবস্থিত তাই পৃথিবীর কঠিন ছাদরূপী আকাশকে না ভেঙে স্বর্গকে পৃথিবীর নিকটস্থ করা সম্ভব নয়।) ভূকম্পনে সে দিন পৃথিবী কেঁপে উঠবে এবং সমুদ্র স্ফীত হয়ে গর্জন করতে থাকবে। পৃথিবী চৌচির হয়ে ভিতরের জিনিস সব বাইরে বেরিয়ে আসবে।

মাটির ভিতর থেকে সোনা রূপা সব বাইরে বেরিয়ে আসবে কিন্তু নেবার লোক থাকবে না। মাটির তল থেকে বিশেষ এক ধরনের পশু বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং তারা মানুষের মত কথা বলবে। ওই দিনই হবে শেষদিন, তারপর আর দিন জম্মাবে না।

---

(৩৯) হাদিস শরীফ, রফিক উল্লাহ (হরফ), পৃঃ ৩০০

কেয়ামতের আগের দিন রাত খুব দীর্ঘ হবে এবং পরদিন এত অকস্মাৎ মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে যে, যে কাপড় বিক্রেতা কাপড়ের ভাঁজ খুলেছিল সে আর তা পুনরায় ভাঁজ করার সময় পাবে না। যে দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দুইছিল সে আর তা পান করার অবকাশ পাবে না। যে পানির চৌবাচ্চা বানিয়েছিল সে আর তা থেকে পানি পান করার অবকাশ পাবে না। যে ব্যক্তি খাবারের গ্রাস মুখে তুলেছিল সে আর তা মুখে দেবার বা খাবার অবকাশ পাবে না। তবে পৃথিবীতে যতদিন আল্লা আল্লা বুলি থাকবে ততদিন কেয়ামত হবে না। মুশাফিরের মত, যে দৈন্য অবস্থার মধ্য দিয়ে অল্প কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে ইসলাম যাত্রা শুরু করেছিল, যত দিন না ইসলাম আবার সে পুরনো দৈন্য দশায় ফিরে আসবে, ততদিন কেয়ামত হবে না। যতদিন না লোকেরা আগেকার মত লাত মানতের মূর্তি পূজা শুরু করছে, ততদিন কেয়ামত হবে না। সঙ্কুচিত হতে হতে ইসলাম যখন আবার মক্কা মদিনার দুই মসজিদে ফিরে আসবে, যেমন করে একটা সাপ ঘুরে ফিরে আবার তার গর্তে ফিরে আসে, তখন বোঝা যাবে যে কেয়ামতের দিন আগতপ্রায় হয়েছে। যতদিন না ঈমান আবার মদিনাকে ঘিরে লুটিয়ে পড়বে ততদিন কেয়ামত হবে না। (কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে কেয়ামতের আগে মক্কা থেকেও ইসলাম লুপ্ত হবে।) কেয়ামতের ঠিক আগে আবিসীনিয়ার এক ব্যক্তি কাবা ধ্বংস করবে (মুসলীম-৬৯৫১)। মহম্মদের ধারণা ছিল যে তাঁর জীবদ্দশাতেই কেয়ামত শুরু হয়ে যেতে পারে। একদিন মদিনার পথে এক বালককে দেখে আল্লার রসুল বলে ওঠেন যে সে বড় হবার আগেই কেয়ামত হবে (মুসলীম-৭০৫২)।

যতদিন না মোমেনদের ধন সম্পত্তি এত বেশি হবে যে দান খয়রাত করার লোক পাওয়া যাবে না, ততদিন কেয়ামত হবে না। যেদিন ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস) নদীর কুল শুকিয়ে পাহাড় প্রমাণ এক সোনার খনি বেরিয়ে পড়বে এবং সেই খনির অধিকার নিয়ে মোমেনদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে এবং তাতে শতকরা ৯৯ জন মোমেন প্রাণ হারাবে, তখন বোঝা যাবে যে কেয়ামতের দিন আগতপ্রায় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে মহম্মদ তাঁর উম্মতদের জন্য আল্লার কাছে তিনটি প্রার্থনা করেন—(১) তাঁর উম্মতরা যেন দুর্ভিক্ষে মারা না যায়, (২) তাঁর উম্মতরা যেন জল প্লাবনে ডুবে মারা না যায় এবং (৩) তাঁর উম্মতরা যেন নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি, হানাহানি করে মারা না যায়। আল্লা প্রথম দুটি আরজি কবুল করেন এবং তৃতীয় আরজি কবুল করতে অস্বীকার করেন (মুসলীম-৬৯০৪, ৬৯০৬)।

কেয়ামতের আগে মানুষের মনের মধ্যে ফিৎনা ফাসাদ (ঝগড়া বিবাদ)

ক্রমাগত এমনভাবে আসতে থাকবে যেমন চাটাই বোনার পাতা একের উপর এক ভাঁজ হয়। তারপর শিরা উপশিরা এমন কি রক্ত কণিকা পর্যন্ত এই ফিৎনা ফাসাদ দানা বাঁধবে। তখন শিক্ষা ও জ্ঞান লুপ্ত হবে, মদ্যপান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার এত বৃদ্ধি পাবে যে তা প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। তখন পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস পাবে যে ৫০ জন নারী একজন পুরুষের আশ্রিতা হয়ে বাস করবে। তখন অজ্ঞান ও মূর্খ ব্যক্তিরা নেতা নিযুক্ত হবে এবং তারা কিছু না জেনেই ফতোয়া জারী করবে,যার ফলে নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হবেই, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। তখন ক্রীতদাসী তার কর্ত্রীর জন্ম দেবে, নগ্নপদ দরিদ্র মেষপালক গর্বভরে আমীর বাদশাহের প্রাসাদে ঘুরে বেড়াবে এবং অযোগ্য লোকের উপর কাজের ভার দেওয়া হবে। যতদিন না পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী অথচ মূর্খ ব্যক্তির পুত্র মূর্খ না হবে ততদিন কেয়ামত হবে না।

কেয়ামতের আগে বিভিন্ন সময় এমন সব জালিয়াতের জন্ম হবে যে তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লার রসুল বলে দাবী করতে থাকবে এবং এরকম নকল রসুলের সংখ্যা প্রায় তিরিশে দাঁড়াবে। ধর্মীয় জ্ঞান এবং শিক্ষা তখন বিলুপ্ত হবে, ভূমিকম্পের আধিক্য হবে এবং সময় দ্রুতগামী মনে হবে। বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপকতর হবে। ধন গড়াগড়ি ছড়াছড়ি যাবে। মানুষ গগণচুম্বী অট্টালিকা তৈরী করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে। মানুষের মন থেকে ঈমান উঠে যাবে, শুধু ফোস্কার আকারে তার চিহ্নটুকুই বিদ্যমান থাকবে।

কেয়ামতের আগে দজ্জাল বলে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে এবং সে নিজেকে আল্লা বলে দাবী করবে। তার একটা চোখ এমন ত্রুটিপূর্ণ হবে যে দেখলে মনে হবে যেন আঙুর গুচ্ছ থেকে একটা আঙুর বেরিয়ে এসেছে, অথবা তার চক্ষুকোটর থেকে মাংসপিণ্ড বেরিয়ে একটা চোখকে এমনভাবে ঢেকে দেবে যে বাইরে থেকে লেপা পোছা মনে হবে। যেহেতু আল্লা সব রকমের ত্রুটিমুক্ত তাই দজ্জালের এই শারীরিক ত্রুটি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করবে যে সে আল্লা নয়। তার আকৃতি হবে মোটা, গায়ের রঙ হবে লাল এবং চুল হবে কোকড়ানো। দেখতে অনেকটা খোজায়া গোত্রের ইবনে কাতান-নামক ব্যক্তির মত। তার কপালে আরবী ভাষায় কাফের লেখা থাকবে এবং প্রকৃত মুসলমানরা তা পড়তে পারবে।

মদিনা নিবাসী ইবনে সঈদ নামে এক ব্যক্তিকে মহম্মদ ও তাঁর অনুচরেরা দজ্জাল বলে মনে করত। মহম্মদ ও উপরিউক্ত ব্যক্তির মধ্যে খুবই রেষারেষি ছিল। মহম্মদ তাকে বলতেন, 'জান না আমি আল্লার রসুল"। সেও সমানে গলা চড়িয়ে বলত, 'তুমি মূর্খদের রসুল'। 'একদিন ইবনে সঈদ বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প

গুজব করছিলেন এমন সময় মহম্মদ সেখানে উপস্থিত হলেন। ইবনে সঈদ ছাড়া আর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালো। মহম্মদ রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার নাকে মুখে ধুলো ছোঁড়া উচিত।' সেও সমানে গলা চড়িয়ে বলল, 'আমিই আল্লার রসুল, আমাকে সম্মান দেখাও।' তখন ওমর বলল, 'আজ্ঞা করুন, এই বেয়াদপের মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দিই।' মহম্মদ বললেন, 'এ যদি সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দজ্জাল) হয় তা হলে একে তোমরা মারতে পারবে না।' মহম্মদ ইবনে সঈদকে ভয় করতেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সে তাঁর মনের কথা বুঝতে পারে। একদিন মহম্মদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতো আমি কি ভাবছি?' সে বলে উঠল, 'ধুক্'। মহম্মদ তখন সত্যিসত্যিই ধোঁয়ার কথা ভাবছিলেন যার আরবী প্রতিশব্দ হল ধুকন (মুসলীম-৬৯৯০)।

কেয়ামতের দিন মানুষ তার মা বাবা স্ত্রী পুত্র সবাইকে পরিহার করবে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পুণ্যাত্মাদের মুখ সেদিন উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের (অর্থাৎ অ-মুসলমানদের) ও দুষ্কৃতকারীদের মুখ ধূলিধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন হবে, কেন না, তাদের কৃতকর্ম সেদিন তাদের দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে। অংশীবাদীরা যে সমস্ত প্রতিমার পূজা করে তাদেরও উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। সেদিন অংশীবাদীরা তাদের মূর্তিপূজার কথা অস্বীকার করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। আল্লা সব প্রতিমার প্রাণ সঞ্চার করে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদের পূজা করতো?' প্রতিমারা বলবে, 'হ্যা'। তাই মিথ্যাবাদীরা হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে। কেয়ামতের দিন সূর্যের কোন জ্যোতি থাকবে না, তাকে ম্লান দেখাবে। লোকে আসন্ন প্রসবা উস্ট্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে। আরবে উট খুবই মূল্যবান, তাই আসন্নপ্রসবা উস্ট্রী খুবই আদরের।

সেদিন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকে কবর থেকে তোলা হবে এবং প্রাণসঞ্চার করা হবে। সবাইকে নগ্ন ও খৎনাবিহীন অবস্থায় তোলা হবে। জেরুজালেমের অদূরে রিহা পর্বতের পাদদেশে সাহেরা নামক স্থানে যে প্রান্তর আছে সেদিন সবাইকে সেখানে সমবেত করানো হবে। আল্লা সেদিন ওই প্রান্তরকে চল্লিশটা পৃথিবীর সমান করবেন এবং স্বর্গ ও নরককে তার নিকটবর্তী করবেন। এখানে উপরিউক্ত পুনরুত্থান ও সমবেত করানো সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলার আছে। যেহেতু আল্লা বলছেন যে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন, সেই কারণে কিছু কিছু স্বল্পজ্ঞানী হিন্দু মনে করতে পারেন যে এই আইনের ফাঁক দিয়ে তাঁরা রেহাই পেয়ে যাবেন। তাঁরা যেহেতু মৃতদেহ কবর না দিয়ে দাহ করেন তাই

হয়তো ভাবছেন যে তাঁরা আল্লার আওতার বাইরে। এই সব হিন্দুকে মূর্খ ছাড়া আর কিছু বলার ভাষা নেই। তাঁরা মূর্খ এই কারণে যে, আল্লার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা কোন খোঁজ খবর রাখেন না। মৃতদেহ দাহ করলে যে ছাই ভস্ম হয় তাকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করা আল্লার পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়। শুধু কুন বলার অপেক্ষা। এই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে আল্লা সবাইকে খৎনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত করার কথা বলছেন। এটা সকলেরই জানা আছে যে, শৈশবেই বিশ্বাসীদের খৎনা করা হয়। কাজেই শৈশবের সেই খৎনা পরিত্যক্ত অংশ এতদিন পরে যদি আল্লা আবার জোড়া লাগিয়ে কেয়ামতের দিন তাদের খৎনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করতে পারেন তবে চিতার ছাই ভস্ম থেকেও তিনি পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকা উচিত নয়।

আল্লা আরও বলছেন যে তিনি সবাইকে নগ্ন অবস্থায় উত্থিত ও সমবেত করবেন। এই সমবেত করার ব্যাপারে বিবি আয়েশা একদিন নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রসুল, স্ত্রী পুরুষ সবাইকেই কি নগ্নভাবে পুনরুত্থিত করা হবে?' আল্লার রসুল বললেন, 'হ্যাঁ'। আয়েশা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রী পুরুষ সবাইকে কি একই জায়গায় সমবেত করানো হবে?' রসুল বললেন, 'হ্যাঁ'। আয়েশা তখন বললেন, 'তখন যদি একে অন্যের দিকে তাকায়?' প্রশ্ন শুনে আল্লার রসুল একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তখন পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর থাকবে যে দেখা দেখি করার কথা তাদের মনে আসবে না।' (মুসলীম-৬৮৪৪)।

যাই হোক, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার আকাশে যেমন চাঁদকে দেখতে অসুবিধা হয় না, বা মেঘমুক্ত আকাশে যেমন সূর্যকে দেখতে অসুবিধা হয় না, সেদিন সবাই সেইরকম পরিষ্কার ভাবে আল্লাকে দেখতে পাবে। সাধারণভাবে চারজন ফেরেস্তা আল্লার আরস বহন করে থাকে। কিন্তু কেয়ামতের দিন ছাগশিশুর আকৃতিবিশিষ্ট আটজন ফেরেস্তা ওই আরস বহন করবে এবং সেই ফেরেস্তাদের পায়ের ক্ষুর থেকে হাটুর দূরত্ব হবে দুই স্বর্গের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেদিন আল্লার মহিমা ও প্রতাপ দেখে কাফেররা হায় হায় করবে আর বলবে, 'কেন যে আমরা আগে থাকতে প্রেরিত রসুল মহম্মদ ও আসমানী কেতাব কোরানে বিশ্বাস স্থাপন করিনি।' সেদিন তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সফাআৎ পেশ করতে চাইবে, কিন্তু তা গ্রাহ্য হবে না।

সেদিন আকাশের নক্ষত্র খসে পড়বে। বন্য জন্তুরা একত্রিত হবে। সমুদ্র স্ফীত হবে এবং আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে সেদিন নরকের আগুন তেমনভাবে পাপীদের আকর্ষণ করবে।

পাপীদের আগুনের পোষাক পরানো হবে, মাথায় ফুটন্ত জল ঢালা হবে এবং তাতে তাদের চামড়া ও উদরে যা কিছু আছে সব গলে যাবে। সেদিন তাদের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত এবং তাদের গায়ের চামড়াকে তিন রাত্রি পথের সমান মোটা করা হবে যাতে তারা নরকের আগুনের দহন অনেক দিন ধরে সহ্য করতে পারে। কেয়ামতের একদিন পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে এবং ঐদিন নরকের কর্মচারীদের খুব খাটুনী হবে।

বিচারের দিন মানুষের মণ্ডলীকে তাদের নেতার নাম অনুসারে ডাকা হবে— বলা হবে, 'হে মুসার মণ্ডলী, হে ঈশার মণ্ডলী' ইত্যাদি। অথবা তারা ধর্মাচরণে যাদের অনুসরণ করে তাদের নাম ধরে ডাকা হবে, যেমন, 'হে হানিফী, হে সাফী' ইত্যাদি। অথবা তাদের যে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করে ডাকা হবে, যেমন, 'হে কোরানী, হে ইঞ্জিলী' ইত্যাদি। অথবা ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম ধরে ডাকা হবে, যেমন, 'হে মুসলমান, হে ইহুদী' ইত্যাদি। স্বর্গীয় লিপিকার কেরামিন কারতিন প্রত্যেক মানুষের পার্থিব জীবনের সমস্ত পাপপূণ্যের হিসাব তার হিসাবের খাতা আমল নামায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন ওই আমল নামা সকলের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। মানুষের পাপ বাঁ দিকে এবং পূণ্য ডান দিকে সঞ্চিত হয়, তাই কেয়ামতের দিন সকলে সমবেত হলে ওই আমল নামা পাপীদের বাঁ দিক থেকে বাঁ হাতে এবং পূণ্যাত্মাদের ডানদিক থেকে ডান হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ঐ একই কারণে বিচারের সময় পাপীদের বাঁ দিকে ও পূণ্যাত্মাদের ডান দিকে সমবেত করানো হবে। তখন পাপীদের জন্য অবরুদ্ধ আগুনের ব্যবস্থা থাকবে। কাফেররা দীর্ঘকাল ধরে কবরে যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, কেয়ামতের ক্লেশ ও শাস্তির তুলনায় তা এক ঘণ্টা মাত্র। উপরিউক্ত সমস্ত আলোচনায় পাপী বলতে অ-মুসলমান এবং পূণ্যাত্মা বলতে মুসলমান বুঝতে হবে কারণ আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমান বাদে আর সবাই অংশীবাদী এবং ইসলামী মতে অংশীবাদী হওয়া সব থেকে জঘন্য পাপ। কিন্তু মুসলমান পাপী নরকে অবশ্যই যাবে, তবে সে নরকবাস অনেক কম যন্ত্রণাদায়ক ও ক্ষণস্থায়ী হবে।

স্বর্গের বাঁ পাশে নরকের অবস্থান, মাঝে মাত্র আরাফ পাঁচিলের ব্যবধান। নরকের সাতটা দরজা বা সাত রকমের নরক আছে। সাত রকমের পাপীদের জন্য এই ব্যবস্থা। যেমন একেশ্বরবাদী বা মুসলমান পাপীদের জন্য জাহান্নম, ঈশায়ীদের জন্য নতি, ইহুদীদের জন্য হোতমা, সাবী সম্প্রদায়ের জন্য সয়ির, অগ্নিপূজকদের জন্য সফর, অংশীবাদীদের জন্য জহিম এবং কপটদের জন্য হাভিয়া। এই সব নরকের আগুনের তারতম্য আছে। জাহান্নমের আগুন মাত্র পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত এবং তার দাহিকা শক্তিও কম। এর পর থেকে আগুনের

উচ্চতা ও দাহিকা শক্তি বাড়তে থাকবে, যেমন হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত, বুক পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত হাভিয়াতে তা মাথা পর্যন্ত হবে। কাজেই ইসলামী মতে অংশীবাদী হিন্দুদের জন্য জহিম নরক নির্ধারিত করা আছে। অংশীবাদীদের সঙ্গে তাদের প্রতিমাও নরকে যাবে। নরকে মোট ১৯ জন কার্যকর্তা (অফিসার) আছে।

কেয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে যখন পাপীদের জন্য সুপারিশকারীর খোঁজ করা হবে তখন সকলে বলবে যে, আদি পিতা হজরৎ আদমই এ কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। সবাই তখন আদমের কাছে গিয়ে বলবে, 'আপনি মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাতায়লা আপনাকে বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং ওই ভাবেই আপনার মধ্যে রুহ্ প্রদান করেছিলেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে আল্লা আদমকে মাটি দিয়ে, মা হাওয়াকে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে এবং ঈশাকে মেরীর গর্ভে বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এই তিন জন ব্যতীত আর সবাইকে আল্লা জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করছেন (৯৬/২)। যাই হোক, আদমের কাছে সমবেত পাপীরা আরও বলবে, 'আল্লা আপনার প্রতি ফেরেস্তাগণকে সিজদা করতে বলে আপনাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। আপনি আল্লাতায়লার কাছে আমাদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা জানিয়ে রহমতের জন্য সুপারিশ করুন।' কিন্তু হজরৎ আদম গন্দম বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে নিজের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আতঙ্কিত হবেন এবং সকলকে পরবর্তী রসুল হজরৎ নূহ-এর কাছে যেতে পরামর্শ দেবেন।

আদমের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে লোকেরা হজরৎ নূহের কাছে গিয়ে একই অনুরোধ করবে। তখন হজরৎ নূহ বলবেন যে তিনি তাঁর কাফের পুত্র কেনানের প্রাণ ভিক্ষা করে অন্যায় করেছিলেন। উপরন্তু, 'পৃথিবীতে একজন কাফেরকেও জীবিত রাখবেন না', আল্লার কাছে এই প্রার্থনা করে অন্যায় করেছিলেন। উপরিউক্ত কথা বার্তার সঙ্গে জড়িত কাহিনী হল এই যে, আদমের দশম পুরুষ নূহ (বাইবেলের Noah)-এর আমলে আল্লা মহাপ্লাবন ঘটান। উদ্দেশ্য ছিল নূহের উপদেশ প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের জলে ডুবিয়ে মারা। আল্লার নির্দেশেই তখন নূহ বিশাল এক নৌকার সাহায্যে আল্লার সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। নূহের এক পুত্র কেনান কাফের ছিল তাই তার জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইতে আল্লা নূহকে নিষেধ করেন। কিন্তু প্লাবনে কেনানকে ডুবে যেতে দেখে নূহ স্নেহে কাতর হয়ে আল্লার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। হজরৎ নূহের অন্য দুই ছেলের নাম সাম এবং হাম। এই সাম থেকেই বর্তমান সেমিটিক শব্দের উৎপত্তি এবং সামের বংশধরেরা সেমাইট নামে পরিচিত। ভারতের

হিন্দুরা অপর পুত্র হাম্-এর বংশধর। যাই হোক, হজরৎ নূহ আশঙ্কা প্রকাশ করবেন যে তাঁর উপরিউক্ত অন্যায় কাজের জন্য আল্লা তাঁর প্রতি সদয় হবেন না এবং সমবেত লোকদের পরামর্শ দিয়ে বললেন, "তোমরা এই কাজের জন্য ইব্রাহীম খলিলুল্লার কাছে যাও"। খলিল মানে বন্ধু এবং খলিলুল্লা মানে আল্লার বন্ধু।

তারপর তারা হজরৎ ইব্রাহীমের কাছে গিয়ে একই আর্জি পেশ করবে এবং হজরৎ ইব্রাহীম তখন বলবেন, " মেলায় না যাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলে এবং মিশরে গিয়ে পত্নী সারাকে ভগ্নী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তিনি অন্যায় করেছিলেন।" ইব্রাহীমের সময় বাবেল বা ব্যাবিলনের মন্দিরে ৯০টি প্রতিমা ছিল। একদিন বাবেলবাসীরা তাদের বাৎসরিক উৎসব ও মেলায় গেলে ইব্রাহীম মন্দিরের প্রধান মূর্তিটি বাদে সব মূর্তি একটা কুড়ুল দিয়ে ভেঙে ফেলেন এবং কুড়ুলটি প্রধান মূর্তিটির গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। মেলায় না যাওয়ার জন্য তিনি সবাইকে মিথ্যা করে বলেছিলেন যে, তাঁর তাউন নামক এক সংক্রামক রোগ হয়েছে। এই অপকর্মের জন্য রাজা নামরুদ (সম্ভবত হামুরাবি) তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন, কিন্তু অলৌকিকভাবে আল্লা তাকে রক্ষা করেন। যাই হোক, উপরিউক্ত অন্যায় কাজের জন্য ইব্রাহীম আল্লার অসন্তোষ আশঙ্কা করে সকলকে পরবর্তী নবী হজরৎ মুসার কাছে যেতে বলবেন।

হজরৎ মুসা (বাইবেলের Moses) ইহুদী ছিলেন কিন্তু শিশুকাল থেকে মিশরের রাজা ফেরাউন (ফারাও)-এর প্রাসাদে মানুষ হন। সেই সময় ইহুদীরা মিশরে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছিল। যুবক মুসা একদিন রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে দেখেন যে একজন মিশরীয় একজন ইহুদীর মাথায় বিশাল এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এবং ইহুদীটি তা বইতে না পারার দরুন তাকে নির্মমভাবে চাবুক মারছে। মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মিশরীয়কে একটা ঘুঁসি মারেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। মুসা সম্ভবত অত্যন্ত উগ্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন এবং সেই কারণে নবী মহম্মদ তাঁকে জিব্রাইলের সঙ্গে তুলনা করতেন। পক্ষান্তরে ইব্রাহীম ও ঈশাকে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বভাবসম্পন্ন ফেরেস্তা মিকাইল (বাইবেলের মাইকেল)-এর সঙ্গে তুলনা করতেন [৪০]। যাই হোক, উপরিউক্ত অন্যায় কাজের জন্য আল্লার বিরাগভাজন হবার ভয়ে হজরৎ মুসা সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন এবং সকলকে পরবর্তী নবী হজরৎ ঈশা (যীশু)র কাছে যেতে পরামর্শ দেবেন।

হজরৎ মুসার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে মানুষেরা যখন হজরৎ ঈশার কাছে যাবে তখন তিনি বলবেন যে তিনি নিজেকে আল্লার পুত্র বলে গর্হিত কাজ

---

(৪০) কাবার পথে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮

করেছেন। কোরানে আল্লা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর কোন স্ত্রী নেই (৬/১০১)। স্ত্রী না থাকার ফলে আল্লা পুত্র উৎপাদন করবেন কোথায়? কাজেই আল্লার কোন পুত্রও থাকতে পারে না (৪/১৭১, ২/১১৬, ১৭/১১১, ১০/৬৮, ২৩/৯১)। সুতরাং এটা ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে, বেদ ও উপনিষদের ঋষিরা সমগ্র মানব জাতিকে ঈশ্বরের পুত্র বলে কত গর্হিত কাজই না করেছেন। যাইহোক, নিজের উপরিউক্ত অন্যায় কাজের কথা স্মরণ করে হজরৎ ঈশা সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মহম্মদের কাছে যেতে তাদের পরামর্শ দেবেন। কাজেই সেই মহা বিপদের দিনে মানুষ্য জাতি তাদের হয়ে সুপারিশ করার জন্য নবী মহম্মদ ছাড়া আর কাউকেই কাছে পাবে না।

অতএব শেষ বিচারের সেই ভয়ঙ্কর দিনে অন্য সব নবীগণের চাইতে নবী মহম্মদই সব থেকে ক্ষমতাশালী হবেন। এর আরও একটা কারণ আছে। আগেকার নবীরা আল্লা তায়লার কাছে যা চাইবার তা তাদের জীবিতকালেই চেয়ে নিয়েছেন এবং একমাত্র নবী মহম্মদই সব চাওয়া কেয়ামতের দিনের জন্য তুলে রেখেছেন। তাই ঐ দিন তিনি আল্লার কাছে যা চাইবেন তাই পাবেন (মুসলীম ৩৮৯)। এই কারণে নবী মহম্মদ কেয়ামতের দিন তাঁর ৭০ হাজার উম্মতসহ সকলের আগে স্বর্গে প্রবেশ করবেন। সেদিন হাসরের ময়দানে মহম্মদের উম্মতদের সংখ্যাই সব থেকে বেশী হবে এবং তারাই স্বর্গের অর্ধেক জায়গা দখল করবে (মুসলীম ৪১৮)।

অবিশ্বাসী কাফেররা সেদিন হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। আল্লা সেদিন দুই ভাবে বিচার করবেন— বিশ্বাসীদের হিসাব যেমন তেমন করে নিয়ে নেবেন, কিন্তু কাফেরদের বেলায় চুলচেরা হিসাব করবেন। আল্লা খৃষ্টানদের জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা কি পূজা কর?" তারা বলবে, "আল্লার পুত্র ঈশাকে।" আল্লা বলবেন, "মিথ্যা কথা বলছ, আমার স্ত্রীও নেই পুত্রও নেই।" তারপর আল্লা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা এখন কি চাও?" তারা বলবে, "হুজুর আমরা খুবই তৃষ্ণার্ত, একটু পানি চাই।" আল্লা দূরের মরিচীকা দেখিয়ে বলবেন, ঐ দিকে চলে যাও পানি পাবে। তারা ঐ দিকে চলতে থাকবে, পানি পাবে না এবং চলতে চলতে নরকের আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়বে (মুসলীম ২৯৬৭, ৬৬৬৮)। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মহম্মদকে নবী বলে স্বীকার না করবে এবং মুসলমান না হবে তাদের সকলের জন্য আছে ঐ নরকের আগুন। সেদিন কোন মুসলমান যদি পর্বতপ্রমাণ পাপ নিয়েও আল্লার কাছে হাজির হয় এবং আল্লার ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের নরকের আগুনে ঠেলে দেবেন (মুসলীম ২৮৯)।

নরকের উপর দিয়ে সেদিন পুল সেরাৎ বা সরাৎ নামক সংকীর্ণ সেতু পাতা হবে। সর্বপ্রথম মহম্মদ রসুলুল্লা ঐ সেতু পার হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবেন। তখন ভয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না। শুধু রসুলগণই কথা বললেন এবং সে কথা হবে কেবল "হে আল্লা রক্ষা করুন, হে আল্লা রক্ষা করুন।" নরকের মধ্যে বড়শীর মত বাঁকানো অসংখ্য সাংঘাতিক আঁকড়া থাকবে। দেখতে হবে অনেকটা আরবের বন্য সাদান কাঁটার মত। ঐ আঁকড়াগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাতায়লাই জানেন। বিচার পর্ব শেষ হবার পর সবাই যখন ঐ পুলসেরাৎ অতিক্রম করতে থাকবে তখন ঐ আঁকড়াগুলো পাপীদের টেনে টেনে নরকের মধ্যে ফেলতে থাকবে আর পুন্যাত্মারা পুলসেরাৎ পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে। অবশ্য আল্লা কারও প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে নরক থেকে তুলে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারেন।

সৎ এবং ঈমানদার মুসলমানরা কেউ বা চোখের পলকে, কেউ বা বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বা বাতাসের মত আবার কেউ বা দ্রুতগামী অশ্ব বা উটের মত সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদভাবে ঐ পুলসেরাৎ পার হয়ে যাবে। বাদবাকী সবাইকে নরকের মধ্যেই ফেলে দেওয়া হবে। দোজখের বেশীর ভাগ জায়গা নারীরাই দখল করবে কারণ তারা বেশী অভিশাপ দেয় এবং তাদের স্বামীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে (মুসলীম ৬৫৯৬, ৬৬০০)। কিছু মুসলমান অক্ষত অবস্থায়, কিছু আঁকড়ার খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে রেহাই পেয়ে যাবে।

যে সব পূণ্যবান মুসলমানরা পরিত্রাণ পেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে, কিছুদিন পরেই তারা তাদের পাপী মুসলমান ভাইদের জন্য আল্লার কাছে জোরদার দাবী পেশ করতে থাকবে। সে রকম জোরদার দাবী এর আগে কেউ আল্লার কাছে পেশ করেনি। তারা বলবে, "হে আল্লা আমরা ওদের সঙ্গে নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি এবং আরও কত কাজ করেছি। আমরা ওদের মুক্তির জন্য আপনার কাছে সুপারিশ করছি।" এদের দাবীতে অস্থির হয়ে আল্লা তখন ফেরেস্তাদের ডেকে বলবেন, " যারা আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করে নি, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমা গ্রহণ করেছিল, জাহান্নমে গিয়ে সেই সব মোমেনদের খুঁজে বের কর এবং যাদের মধ্যে অন্তত এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদের বার করে নিয়ে এসো।

ফেরেস্তারা তখন দোজখে যাবে, কিন্তু পাপীরা যেহেতু দোজখের আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে তাই প্রকৃত মোমেনদের চিনে বের করতে মুশকিলে পড়তে পারে। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লা তারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ঈমানদারদের সিজদাস্থানগুলো দোজখের আগুনের জন্য হারাম করে রেখেছেন। সিজদা

করার সময় দেহের যে সাতটি জায়গা ভূমি স্পর্শ করে, যথা কপাল, দুই কনুই. দুই হাটু ও দুই পায়ের পাতা, তাকে সিজদাস্থান বলে। যাই হোক, ফেরেস্তারা অক্ষত সিজদাস্থল দেখে দেখে বান্দাদের দোজখ থেকে বার করে আনবে। আল্লা তখন তাদের মাউল হায়াৎ নামক খালে ফেলে দেবেন এবং সেই খালের জীবনীশক্তি-যুক্ত পানির স্পর্শে বান্দারা আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠবে। আল্লা তখন তাদের জান্নাতে থাকার অনুমতি দেবেন।

কিছু দিন পরে প্রকৃত মোমেনরা আল্লার কাছে আবার জোরদার দাবী পেশ করতে শুরু করবে এবং বলবে, "আমাদের ভাইরা, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমা গ্রহণ করেছিল, তারা এখনও দোজখের আগুনে কষ্ট পাচ্ছে। তাদের মুক্তির জন্য আমরা আপনার কাছে আবার সুপারশি করছি।" আল্লা তখন ফেরেস্তাদের বলবেন, "যাও যাদের মধ্যে আধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাও তাদের দোজখ থেকে বার করে নিয়ে এসো।" ফেরেস্তারা আগের মতই অক্ষত সিজদা স্থান দেখে বান্দাদের দোজখ থেকে বার করে নিয়ে আসবে এবং আল্লা যথারীতি তাদের মাউল হায়াতে ফেলে সুস্থ সবল করে জান্নাতে থাকার অনুমতি দেবেন। কিছুদিন পরে মোমেনরা আবার জোরদার দাবী পেশ করতে থাকবে এবং আল্লা তখন ফেরেস্তাদের বলবেন, যাও যাদের মধ্যে অণুপরিমাণ ঈমান দেখতে পাও তাদের দোজখ থেকে বের করে নিয়ে এসো।" ফেরেস্তারা তাদের নিয়ে এলে তারাও ঠিক আগের মতই জান্নাতে থাকার অনুমতি পাবে। এই সব নিম্ন পদস্থ স্বর্গবাসীরাও কম করে ৭২টা স্ত্রী বা হুরী এবং ৮০ হাজার দাস পাবে। এই ভাবে তৃতীয় দল স্বর্গে প্রবেশ করার পর মাত্র একজন বান্দা দোজখে পড়ে থাকবে এবং সেই হবে স্বর্গে প্রবেশকারী শেষ মুসলমান।

মোমেনরা যখন দোজখে পড়ে থাকা সেই একজন বান্দার জন্য দাবী পেশ করবে তখন আল্লাপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন না কারণ তার মধ্যে অণু মাত্রও ঈমান নেই। কিন্তু মোমেনদের সুপারিশের চাপে তাকে দোজখ থেকে বার করে দোজখের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখবেন। কিছু দিন ঐ ভাবে থাকার পর বান্দা আল্লাকে বলবে, 'হে আল্লা, দোজখের দুর্গন্ধ আর সহ্য করতে পারছি না, দয়া করে আমার মুখটা অন্তত অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিন।" আল্লা প্রথমে রাজী হবেন না, কিন্তু বান্দা এমন কাকুতি মিনতি শুরু করবে যে শেষ পর্যন্ত তিনি বলবেন, "এ প্রার্থনা কবুল করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কিছু চাইতে পারবে না।" এই বলে আল্লা তার মুখটা বেহেস্তের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। কিছু দিন পরে সে আবার আল্লার কাছে আর্জি পেশ করতে শুরু করবে এবং বলবে, "হে আল্লা, জান্নাতের ভিতরটা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, তাই আমাকে বেহেস্তের দরজায় থাকতে দিন।" প্রথমে আল্লা রাজী হবেন না.

কিন্তু বান্দা এমন কাকুতি মিনতি শুরু করবে যে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাজী হবেন এবং বলবেন "ভবিষ্যতে আর কিছু চাইতে পারবে না।"

কিছু দিন পরে সে বেহেস্তের ভিতরে ঢোকার জন্য আর্জি পেশ করতে শুরু করবে। আল্লা প্রথমে কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু বান্দা এত অনুনয় বিনয় করতে থাকবে যে বিরক্ত হয়ে আল্লা শেষ পর্যন্ত তাকে জান্নাতে ঢোকার অনুমতি দেবেন। বেহেস্তে ঢুকে যাবার পর আল্লা ঐ বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "কি তোমার কামনা বাসনা আছে বল?" বান্দা তখন তার মনোবাসনা আল্লাকে খুলে বলবে এবং সে যা চাইবে তার চাইতে দশগুণ সুখ সুবিধা আল্লা তাকে দেবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমা গ্রহণ করার জন্য সর্বাপেক্ষা পাপাসক্ত ও ঈমান শূণ্য মুসলমানও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদায় দুষ্কর্মকারী মুসলমানও শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমার জোরে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যাবে। বিশ্বাসীদের স্বর্গে প্রবেশ যখন এতখানি সুনিশ্চিত তখন তাঁরা কেন এত কষ্ট স্বীকার করে নামাজ, রোজা ইত্যাদি করেন তা দুর্বোধ্য।

এই ভাবে শেষ মুসলমানটিও যখন স্বর্গে প্রবেশ করবে তখন দোজখে পড়ে থাকবে শুধু অ-মুসলমান কাফেররা। তারা কোন দিনই মুক্তি পাবে না। অনন্তকালে ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। খাদ্য হিসাবে তারা পাবে জাকুম ও জরিয় [৪১] নামক মরুভূমির আগাছা, যা গলিত তাম্রের মত তাদের উদরে ফুটতে থাকবে। আল্লা নরকের কর্মচারীদের বলবেন, "ওদের ধর টেনে নিয়ে যাও জাহান্নমের মধ্যে। মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও, কারণ ওরা আমার শাস্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত।" এই সব অংশীবাদী ও সীমা লঙ্ঘনকারী কাফেররা সেখানে কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না। তারা পান করবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ রক্ত। যদি দোজখের সেই পুঁজরক্ত পৃথিবীতে এক বালতি ফেলা হত তবে তাঁর দুর্গন্ধে কেউ বেঁচে থাকতে পারতো না। যে সব কন্টকময় বিষাক্ত খাদ্য তাদের খেতে দেওয়া হবে তার বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে ফেলা হলে পৃথিবীর সবাই মারা পড়বে।

সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় নরক জহিম ও হাভিয়াতে যথাক্রমে অংশীবাদী ও কপটরা স্থান পাবে। সেখানকার আগুনের দাহিকা শক্তি পৃথিবীর আগুনের চাইতে ৭০ গুণ অধিক হবে। আল্লা এই সব কাফেরদের নরকের আগুনে ঝলসাবেন এবং প্রত্যেকবার ঝলসাবার পর নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন যাতে

---

(৪১) জরিয় ও জাকুল এক ধরনের তিক্ত কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ যা আরবের মরুভূমিতে জন্মায়। তাজা অবস্থায় এর নাম শবরক এবং তখন সেগুলো উঠে খায়। শুকিয়ে জরিয় বা জকুম হলে তা উঠেও খায় না।

নিরন্তর শাস্তি দেওয়া যায় (৪/৫৬)। এ ছাড়া পাপীদের অতিউচ্চ অগ্নিময় পর্বতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে নরকে ফেলে দেওয়া হবে। নরকে ৭০ হাজার জঙ্গল থাকবে যার প্রত্যেক গাছে ৭০ হাজার শাখা প্রশাখা থাকবে এবং প্রত্যেক শাখায় ৭০ হাজার সাপ এবং ৭০ হাজার বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে থাকবে। এই সব সাপ ও কাঁকড়া বিছে নরকের লোকেদের কামড়াবে এবং একবার কামড়ালে তার জ্বালা ও ফোলা ৪০ বছর স্থায়ী হবে। ফুটন্ত ধাতুর পাঁচটি নদী পাপীদের দিকে প্রবাহিত করা হবে এবং তার গরম বাষ্পে তারা ভয়ানক শাস্তি পাবে। আরাফ পাঁচিলের মধ্য দিয়ে একটা দরজা রাখা হবে যার মধ্য দিয়ে কাফেররা স্বর্গের ভিতরটা দেখতে পাবে। সেখানে স্বর্গবাসীদের প্রাচুর্য ও সুখ দেখে তারা তখন কপাল চাপড়াবে আর বলবে, "হায় যদি সময় থাকতে আল্লার রসুল মহম্মদ ও প্রেরিত আসমানী কেতাব কোরানে বিশ্বাস স্থাপন করতাম।"

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা দেখা যাচ্ছে যে, সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক নরক কপটদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, ঘৃণিত অংশীবাদী কাফেরদের চাইতেও কপটদের নরক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নবী মহম্মদের দৃষ্টিতে এই কপটরা অংশীবাদীদের থেকেও বেশী ঘৃণিত বিবেচিত হয়েছিল। কাজেই এই কপট বলতে কাদের বোঝায় তা বিশদ বিবরণের দাবী রাখে। এক কথায় কপট বা মোনাফেক বলতে বোঝায় সেই সমস্ত লোক যারা নামেমাত্র মুসলমান। উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ভয়ে মদিনার এই সমস্ত লোকেরা প্রকাশ্যে মহম্মদের নবীত্বে অবিশ্বাস করতে ভয় পেত, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করত না। শুধু প্রাণ বাঁচাবার জন্যই তারা নামেমাত্র মুসলমান হয়েছিল। পবিত্র কোরানে এই মোনাফেকদের কথা ২৫বার আছে এবং এদের ব্যাপারটা এতটা প্রাধান্য লাভ করে যে আল্লা মোনাফেক নামে একটা পৃথক সুরা (৬৩নং সুরা) অবতীর্ণ করেন। মহানবী এদের প্রতি এত খানি ক্রুদ্ধ ছিলেন যে, বলতেন "এদের জন্য জলন্ত নরক আছে।" আল্লাও এদের প্রতি সমান ক্রুদ্ধ ও কঠোর এবং সেই কারণে সর্বাপেক্ষা অগ্নিময় নরক হাভিয়া এদের জন্য নির্ধারিত করেন।[৪২]

৬২২ খৃস্টাব্দে মহম্মদ যখন তাঁর দলবল নিয়ে মদিনায় এলেন তখন মদিনার লোকেরা তাদের সাহায্য করে এবং আশ্রয় দেয়। এইসব সাহায্যকারী মদিনাবাসীকে যে আনসার বলা হত তা আগেই বলা হয়েছে। যাই হোক,

(৪২) আল কোরান (৩/১৬৬-১৬৮), (৪/১৩৮), (৮/১৪২), (৯/৭৩), (৩৩/১২-১৪), (৩৩/২৪, ৬০, ৬১), (৫৭/১৩,১৪), (৫৯/১১-১৭), (৬৩/৬-৮) ইত্যাদি।

শান্তিকামী ও ধার্মিক একজন নবী হিসাবেই তারা মহম্মদকে মদিনায় নিয়ে এসেছিল এবং মদিনার শাসন কর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই বিশেষ করে বদর যুদ্ধের পর উদ্বাস্তুরাই শক্তিশালী হয়ে উঠল আর মদিনাবাসীরা নিজদেশে পরবাসীর মত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হল। যখন তারা বুঝতে পারল যে, এ তো খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আলি, যুবায়ের, আব্বাস, ওমর, ওসমান, তালহা, আকিল ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন ও অনুচরদের মাধ্যমে মহম্মদ একটা শক্তিশালী বাহিনী তৈরী করে ফেলেছেন যারা মদিনায় আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে। এই বাহিনীর উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ভয়ে তারা মুখ বুজে সব সহ্য করতে বাধ্য হল।

মদিনার যে সমস্ত লোক তখনও মুসলমান হয়নি তাদের নিয়ে তত সমস্যা ছিল না, কারণ তাদের হত্যা করে অশান্তি দূর করা সম্ভব হত। কিন্তু মোনাফেকেরা সদ্য মুসলমান হয়েছে, তাই তাদের প্রকাশ্যে হত্যা করাও মহম্মদের পক্ষে সম্ভব হল না। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে, বিশেষ করে মহম্মদ আহত হয়ে ফিরলে, মদিনাবাসীরা মনে মনে খুসী হয় এবং দু এক জায়গায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া বদর যুদ্ধ শেষ হলে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ তাড়াতাড়ি মদিনায় পাঠাবার জন্য মহম্মদ যখন তাঁর নিজের দ্রুতগামী উট আল কাসোয়ায় করে অনুচর যায়েদকে মদিনা পাঠালেন তখম মহম্মদ যুদ্ধে মারা গেছেন ভেবেও মদিনাবাসীরা প্রথমে উল্লাস প্রকাশ করে। এই সমস্ত কারণে নবীর অনুচরেরা এইসব অবিশ্বাসী মোনাফেকদের হত্যা করার জন্য নবীর অনুমতি প্রার্থনা করত। কিন্তু নবী বলতেন যে, কলেমা গ্রহণকারী কোন মুসলমানকে প্রকাশ্যে হত্যা করার আদেশ তিনি এখনও আল্লার কাছ থেকে পান নি।

কাজেই যে পথ বাকী থাকল তা হল গুপ্ত হত্যা। প্রথমেই নিশানা করা হল মদিনার কবিদের কারণ তারা ছিল সে যুগের সাংবাদিক। আসমা বিনত্ মারোয়ান নামে একজন মহিলা কবি মক্কাবাসীদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের কথা প্রচার করে কবিতা লিখতে থাকে এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মদিনাবাসীদের উত্তেজিত করতে থাকে। মহম্মদের নির্দেশে তাঁর এক অনুচর উমের বিন আদি একদিন রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় কবি আসমাকে হত্যা করে আসে। ঠিক একই ভাবে খাজরাজ গোত্রের কবি আবু আফাককে সালিম বিন ওমর ও কবি কাব বিন আসরাফকে মহম্মদ বিন মাসলামা রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হত্যা করে। মদিনার কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদের হত্যা করার কারণও ছিল

মদিনায় ত্রাসের সঞ্চার করা। আল্লা বললেন, 'আশেপাশের লোকেরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক' (৯/১২৩), তাই ৮০০ লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে, বাজারের মত একটা জনাকীর্ণ স্থানে হত্যা করা হল যাতে মদিনার অবিশ্বাসী কাফের ও মোনাফেকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

ইসলামী স্বর্গ, নরক ইত্যাদি বিষয়ে আর দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। চিরকাল মানুষ পার্থিব দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার স্থান হিসাবে স্বর্গ কল্পনা করেছে। ভারতে শীত গ্রীষ্ম দুই এরই কষ্ট আছে, তাই হিন্দুর স্বর্গে চিরবসন্ত বিদ্যমান। তিব্বতীরা শীতে বারোমাস কষ্ট পায়, তাই তাদের স্বর্গ আরামদায়ক উষ্ণ। সেইরকম শুষ্ক আরব দেশে প্রখর সূর্যের তাপে সব জ্বলে যায়। সেখানে পানীয় শীতল জলের বড়ই অভাব। আরবে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতাহেতু গাছ জন্মায় না, কিছু গুল্মজাতীয় উদ্ভিই সেখানে জন্মায়। তাই আরবের স্বর্গ কল্পনায় গাছের শীতল ছায়া এবং শীতল পানীয় জলের নদী অপরিহার্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের এক জন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী স্বর্গে নদী ও গাছের ছায়ার অস্তিত্ব কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হবে না কারণ বাংলাদেশে উপরিউক্ত দুটি বস্তুর অভাবতো নেইই বরং প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের একজন মুসলমান ইহ জগতেই ইসলামী স্বর্গে বাস করছে। সুতরাং বাংলাদেশের কোন মুসলমানকে রুক্ষ, শুষ্ক ও উত্তপ্ত আরব ভূমিতে ছেড়ে দিলে তা তার কাছে নরক যন্ত্রণার মতই মনে হবে। যেমন আরব মরুভূমির একজন বেদুইনকে বাংলাদেশের জল হাওয়ায় নিয়ে আসলে তা তার কাছে স্বর্গসুখ বলেই প্রতীয়মান হবে।

ইসলামী স্বর্গ কল্পনার মধ্য দিয়ে আরবের লোকদের যে উদগ্র যৌন কামনা প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। সব থেকে বড় কথা হল উপরিউক্ত স্বর্গ ও নরক কল্পনার মধ্য দিয়ে ইসলামী ধর্ম প্রবক্তাদের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি যে হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণা প্রতিফলিত হয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আরব্য সমাজের কাম, ক্রোধ, লোভ ও লালসার যে নগ্নরূপ ইসলামী স্বর্গ ও নরক কল্পনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের জীবনধারার কোনই মিল নেই। যে ত্যাগ বৈরাগ্য ভারতীয় জীবনযাত্রার আদর্শ এবং যে কোন রকম ধর্ম আচরণের মূল সর্ত, সেই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের লেশমাত্রও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে অনুপস্থিত।

আল্লা

আরবী ইলাহ্ শব্দের অর্থ উপাস্য এবং আল্ শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ হল the, যার কোন সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় অনুপস্থিত। আল্ এবং ইলাহ্, এই দুই শব্দ মিলে আল্লাহ্ শব্দের উৎপত্তি। কাজেই আল্লাহ্ শব্দের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় উপাস্যটি বা উপাস্যটা। সুতরাং আল্লাহ্ শব্দের মধ্য দিয়ে সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভাব ব্যক্ত হয় না, বরং আরব জাতির বিশেষ কোন উপাস্যকেই বোঝায়। এ ব্যাপারে আর একটা কথা হল, আল্লাহ্ লিখলে বেশির ভাগ, অ-মুসলমান বাঙালী হ্'এর নীচে হসন্তটা খেয়াল না করে আল্লাহ উচ্চারণ করেন। এই কারণে উচ্চারণের দিক থেকে আল্লাহ্ না লিখে আল্লাঃ লেখা বেশি যুক্তিযুক্ত। (এই সমস্ত কারণে বর্তমান আলোচনায় শুধু আল্লা লেখা হয়েছে।)

অনেকের ধারণা হতে পারে যে, যেহেতু মুসলমানরা আল্লার মূর্তি তৈরী করে না বা মূর্তি তৈরী করে পূজা করে না তাই তাদের আল্লা নিরাকার। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোরানের আল্লা সাকার এবং তাঁর উচ্চতা ৬০ হাত (মুসলীম ৬৮০৯) এবং তিনি মনুষ্যাকৃতি। আল্লার আকৃতি যে মানুষের মত তার প্রমাণ হল, তিনি তাঁর নিজের আদলে প্রথম মানব হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন (মুসলীম-২৮৭২)। দু'জন মুসলমান মারামারি করলে কারও পক্ষে অপর জনের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করা উচিত নয় কারণ আল্লা মানুষের মুখমণ্ডলকে তাঁর নিজের মত করে করেছেন (মুসলীম-৬৩২৫)। সম্ভবত সভ্যতার দিক থেকে অনগ্রসর আরজাতির পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা করা সম্ভব ছিল না এবং এখনও সম্ভব নয়। তবে মনে হয় ফেরেস্তাদের মত তিনিও মানুষের কাছে সচরাচর অদৃশ্য থাকেন। উপরন্তু যখন বলা হয় যে, কেয়ামতের দিন সবাই আল্লাকে দেখতে পাবে, তখন আল্লা যে নিরাকার নন্ তা আরও পরিষ্কার হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়। প্রথমত আল্লা মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়ত তিনি পুরুষ মানুষ। আল্লা যে পুরুষ মানুষ তা আরও পরিষ্কার হয় যখন তিনি বলেন যে, তাঁর কোন স্ত্রী নেই (৬/১০)। আল্লা শুধু পুরুষ মানুষই নন্, তিনি সক্ষম পুরুষ এবং কোন মানবীতে গমন করে তিনি সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখেন। মহম্মদের জীবিতকালে ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, ঈশা যেহেতু কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর পিতা কে? এরকম এক বিতর্ক সভায় মহানবী উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে খৃস্টানরা বলতে থাকল যে আল্লাই ঈশার পিতা। এর জবাবে ইহুদীরা বলল, 'আল্লা

কি তবে মরিয়মে গমন করেছিলেন?' আল্লা মরিয়মে গমন করে পুত্র ঈশাকে উৎপাদন করেছিলেন এ একটা ব্যাখ্যা হয় বটে কিন্তু নবীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তা হলে আল্লার সম্মানহানি হয়। তিনি পরস্ত্রীতে গমনকারী ব্যাভিচারী প্রমাণিত হন। যাই হোক, ঈশা আল্লার পুত্র, এই অপবিত্র কথা বার বার শুনেও নবী মহম্মদ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে থাকলেন এবং বিবাদের মীমাংসা এইভাবে করলেন—যেমনভাবে আল্লা তাঁর বিশেষ কুদরতের দ্বারা মাটি দিয়ে হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, ঠিক সেই রকমভাবে তিনি তাঁর কুদরতের দ্বারা মরিয়মের গর্ভে ঈশাকে সৃষ্টি করেছিলেন।[৪৩] প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করাই আল্লার পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়, শুধু কুন বা হও বলতে হয় এই মাত্র। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, খৃষ্টান এবং ইহুদীদের শাস্ত্র মতেও আল্লা একজন সক্ষম পুরুষ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, যেহেতু আল্লার কোন স্ত্রী নেই এবং তিনি কোন মানবীতেও গমন করেন না তাই তাঁর পুরুষত্বের কোন ব্যবহার নেই।[৪৪]

আল্লার আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হল, তিনি মনে মনে কিছু স্থির করে কুন বা হও বললেই তা হয়ে যায় এবং এই সৃষ্টি কাজের জন্য কোন কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শূন্য বা nothingness থেকেই তিনি সব সৃষ্টি করতে পারেন। এই তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ ভারতীয় বা হিন্দু মতানুসারেও শূন্য থেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। বেদান্ত মতে অজ, নিত্য, শাশ্বত ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্মই হল এই সৃষ্টির মূল উপাদান। ব্রহ্ম হতেই এই দৃশ্যময় জগত উৎপন্ন হয়েছে, ব্রহ্মে তা অবস্থান করছে অবার প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মেই সব লীন হয়ে যাবে।

ব্রহ্মহৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।[৪৫]

সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল বলছেন, 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' 'বা অবস্তু থেকে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। সাংখ্য মতে সৃষ্টির মূল উপাদান মূলপ্রকৃতি। এই মূল প্রকৃতি অনাদি, অসীম, নিত্য, অন্তহীন, অতিসূক্ষ্ম, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব বা নির্বিশেষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় মূল প্রকৃতি অব্যক্ত থাকে এবং উপাদানের তিন গুণের তারতম্য হেতু প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়,

---

(৪৩) কাসাস [illegible], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০

(৪৪) মোমেনরা স্বর্গবাসী হয়ে যেখানে হাজার হাজার হুরীর সঙ্গে বসবাস করবে সেখানে স্ত্রী হীন আল্লার একাকীত্ব খুবই বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(৪৫) চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৬ ১৪৩

অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়। উপরিউক্ত সাংখ্য তত্ত্ব বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যাইহোক, ইসলামের আল্লা অসম্ভব ক্রোধী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আল্লা ছাড়া অন্য কারও ভজনা করলে আল্লার খুব ক্রোধ এবং হিংসা হয়। এই সমস্ত লোকদের তিনি সম্ভব হলে এই পৃথিবীতেই তাঁর রোষানল বা আযাব দ্বারা শেষ করেন অথবা মৃত্যুর পরে নরকে নিয়ে গিয়ে অনন্তকাল ধরে আগুনে দগ্ধ করেন। প্রত্যেকবার দগ্ধ করার পর তিনি আবার নতুন চামড়ার সৃষ্টি করেন যাতে অনন্তকাল ধরে অবিরাম দগ্ধ করা যায় (৪/৫৬)। এক মাত্র মুসলমানদের প্রতিই তিনি রহমানির রহিম বা দয়ালু দয়াময় এবং অ-মুসলমানদের কাছে তিনি একজন ক্রোধে রক্তচক্ষু জল্লাদ বিশেষ। উপরন্তু আল্লার বান্দারাও যদি এই সব বিধর্মী কাফেরদের উপর নির্বিবাদে অত্যাচার চালায় বা হত্যা করে তাহলে আল্লা খুশী হন এবং সেইসব খুনী বান্দাদের ইহলোকে গনিমতের মাল ও পরলোকে স্বর্গের উৎকৃষ্ট স্থানে আশ্রয় দিয়ে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর বলেন, 'সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'—আমার কাছে সকলেই সমান, কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয়, কেউ আমার প্রিয়ও নয়।

যাইহোক, ভারতীয় দর্শনমতে গুণ থেকে বস্তু আলাদা করা সম্ভব নয় যেমন আগুন থেকে তার দাহিকা শক্তি, বরফ থেকে তার শৈত্য এবং জল থেকে তার সিক্ত করার গুণকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ গুণ থাকলে তার আধার থাকবে আধার থাকলে গুণও থাকবে। কাজেই ভারতীয় মতে এই রকম প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন আল্লা কখনও নিরাকার হতে পারেন না [৪৬]। সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা চলে যে, যেহেতু আল্লা সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের অতীব বা ত্রিগুণাতীত নন্ তাই তিনি শাশ্বত বা নিত্য হতে পারেন না, সময়ের সঙ্গে তাঁর পরিবর্তন আছে। কাজেই প্রকৃত গুণসম্পন্ন আল্লার ক্ষয় এবং ধ্বংস অনিবার্য [৪৬]।

বেশীরভাগ মুসলমানই মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন সে এই জগতে একমাত্র তারাই নিষ্ঠাবান একেশ্বরবাদী। কিন্তু 'হরফ প্রকাশনী' দ্বারা প্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় আব্দুল আজিজ আল অমান সাহেব লিখেছেন, ' বেদের ঈশ্বর সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনাগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায়, বেদের ঋষিগণ একেশ্বর চিন্তাভাবনায় অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। প্রকৃতির নানা বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ডের মর্মমূলে মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। সুপ্রাচীনকালে সরল আর্যগণ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন।

(৪৬) বিশদ বিবরণের জন্য শ্রী দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের 'হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব', ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, পূষা, ত্বষ্টা, সোম, সূর্য্য, উষা, সরস্বতী, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যগণই উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির সকল কাণ্ড একই নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা এসব কিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন, এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই, এক হতেই সব।'

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত ''কোরান শরীফ' গ্রন্থের ভূমিকায় ''আল কোরানের আহ্বান'' অংশে আল আমান সাহেব লিখছেন, 'একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরও ব্যাপক ও গভীর। শঙ্কর ভাষ্য মতে, 'যে বিদ্যায় ব্রহ্মাকে পাওয়া যায় তাই উপনিষদ।' .....সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোরান শরীফ অবতীর্ণ হবার অনেক পূর্বেই একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।'' কাজেই হিন্দুর বহু দেবদেবী আরাধনার মূলে যে বেদের সত্য একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'' দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা আল আমান সাহেবের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এ প্রসঙ্গে এটাও জোর দিয়ে বলা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অগ্রসর, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে পরিচিত মুসলমানরা কোরানের আল্লায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না এবং আল্লাকে বেদান্তের সর্বব্যাপী, শাশ্বত, নিত্য ও নিরাকার ব্রহ্ম হিসাবেই চিন্তা করে থাকেন। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, আল আমান সাহেবের লেখার মধ্যে এরকম ভাব খুবই স্পষ্ট। আল আমান সাহেব জানেন যে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'' বলতে কি বোঝায়। তাই তিনি তাঁর ''কাবার পথে' গ্রন্থের এক জায়গায় আবেগে আপ্লুত হয়ে লিখছেন, 'নিখিলের সর্বত্র, অণুতে পরমাণুতে আল্লা আছেন।''(৪৭) আবেগের বশে আল আমান সাহেব লাইনটা লিখে ফেলেছেন। অত খেয়াল করেননি যে উপরিউক্ত লাইনটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফের হয়ে গেছেন এবং মোরতাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার যোগ্য হয়ে গেছেন। এই একটি মাত্র বাক্যের দ্বারা তিনি এই বিশ্ব জগতের দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুকেই আল্লা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই এক জন কাফের তো বটেই, সেই কাফেরের প্রতিমাকেও আল্লা বলে স্বীকার করে সিজদা করার যোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভয়ঙ্করভাবে আল্লার অংশী সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু ঐ একই বাক্যের দ্বারা তিনি, আল্লার দৈর্ঘ ষাট হাত, তাঁর মুখাবয়ব মানুষের মত, তিনি নিজের আদলে হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি ইসলামী সিদ্ধান্তগুলোকে অস্বীকার করে মোরতাদ হয়েছেন। সম্ভবত তার এই কথাগুলো কোন আলিমের নজরে পড়েনি বা নজরে পড়লেও তিনি অত তলিয়ে দেখেননি। অন্যথায় তাঁর গ্রন্থ থেকে ওই লাইনটা বাদ দিতে হত। আল

(৪৭) কাবার পথে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬

আমান সাহেব নিজে কি পারবেন কোন কাফেরের প্রতিমাকে আল্লা বলে সিজ্দা করতে?

শ্রী আল আমান সাহেব তাঁর 'কাবার পথে' গ্রন্থের আর এক জায়গায় ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে নবী মহম্মদের জন্ম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন, 'এই শুভ মুহূর্তটির জন্য কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী তার পরিক্রমা শুরু করেছিল, যে শুভক্ষণটির প্রত্যক্ষ করার জন্য সুদূর নভোলোক হতে নক্ষত্ররাজি ও নীহারিকাপুঞ্জ অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ধূলিমলিন পৃথিবীর দিকে।' এখানেও তিনি ইসলামী সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করে কাফের হয়েছেন। তাঁর ধর্মমতানুসারে আল্লা ছয় দিনে আকাশ, পৃথিবী, জল, বাতাস সব সৃষ্টি করে জুমআর সপ্তম দিনে আসরের নামাজের পর প্রথম মানব হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং শেষ নবী হজরৎ মহম্মদ আদমের ৯০তম বংশধর। কাজেই দুই প্রজন্মের মধ্যে বয়সের ব্যবধান যদি ৩০ বছর ও ধরা যায় তবে মহম্মদের জন্ম হয় পৃথিবীর সৃষ্টির ২৭০০ বছর পরে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে নবী মহম্মদের জন্ম হয়। কাজেই বলতে হয় যে আজ (১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) থেকে মাত্র ৪১২৯ বছর আগে আল্লা পৃথিবী, জল, আকাশ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তাই কোটি কোটি বছর আগে আল্লার অস্তিত্ব ছিল কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয়।

কোরানের সুরা 'নূর' (আলো)-এ আল্লা বলছেন, 'আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।' ... আল্লা যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন (২৪/৩৫)। উপরিউক্ত আয়াতটির মধ্যে শ্রী আল আমান সাহেব গায়ত্রীমন্ত্র 'বরেণ্যং ভর্গঃ' বা বরণীয় জ্যোতির মিল খুঁজে পেয়েছেন। এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার যে আরবের মত দেশেও গায়ত্রীমন্ত্রের সমতুল মন্ত্র আবির্ভূত হতে পারে। সব বিশ্বাসীই এটা স্বীকার করবেন যে আল্লা নবী মহম্মদকে সেই জ্যোতির পথ দেখিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুচর আলি, যুবায়ের, তালহা, আব্বাস, আকিল ইত্যাদিকেও আল্লা তাঁর জ্যোতির পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এবং এই জ্যোতির সন্ধান পেয়েই তাঁরা ১০ বছরে ৮২টা লুণ্ঠন, হত্যা ও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। আল্লা তাঁদের জ্যোতির পথ দেখিয়েছিলেন বলেই তাঁরা ৮০০ নিরস্ত্র ইহুদীর রক্তে মদিনার বাজার রক্তাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং ইহুদীর রক্তে খয়বরের মাটি পিছল করতে পেরেছিলেন। কাজেই আল্লার জ্যোতির পথ কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমান করা চলে। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, পরবর্তীকালে আল্লা তৈমুরলং, চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শাহ্, বাদশাহ্ আওরঙজেব, আহম্মদ শাহ্ আবদালি ইত্যাদিকেও তাঁর নূরের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা পৈশাচিক আনন্দে নররক্তের হোলি খেলতে পেরেছিলেন।

মহাগ্রন্থ কোরান

মুসলমানদের মতে কোরান স্বয়ং আল্লার বাণী। কোরানের কোন বাণী অবতীর্ণ করার বাসনা হলে আল্লাতায়লা প্রথমে তা ফেরেস্তা জিব্রাইলকে বলতেন এবং জিব্রাইল সেই বাণী পৃথিবীতে বয়ে এনে মহম্মদকে বলতেন। এই বাণী আসার নাম ওহী বা প্রত্যাদেশ। যখন ওহী অবতীর্ণ হত তখন মহম্মদের কিছু কিছু শারীরিক পরিবর্তন ঘটত, যেমন কথা বলতেন না, মুখ নীচু করে থাকতেন আর ঘামতেন। ওহী আসার তেমন কোন বাঁধাধরা সময় ছিল না। উঠের পিঠে যুদ্ধ যাত্রা করছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন কিংবা ঘরে বিশ্রাম্ করছেন, এমন সময় ওহী এসে যেত। এমন কি বিবি আয়েশার সঙ্গে লেপের তলায় শুয়ে আছেন এমন সময়ও ওহী অবতীর্ণ হত। যেমন নামাজের ইমামতি করার সময় কিবলা পরিবর্তনের ওহী এসে গিয়েছিল।

জিব্রাইল যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন তিনি সাধারণত অদৃশ্য থাকতেন। তবে বিবি আয়েশা এবং অন্য কেউ কেউ জিব্রাইলকে দেখেছেন বলে দাবী করতেন। বিবি আয়েশা বলতেন যে জিব্রাইলকে দেখতে অনেকটা সাবিত বিন কাইস নামে মহম্মদের অন্য এক অনুচরের মত। উক্ত সাবিত বিন কাইস দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। বনি মুস্তালেকের অভিযানকালে গনিমতের মাল ভাগাভাগির সময় সুন্দরী জয়েরিয়া প্রথমে এই সাবিতের ভাগে পড়ে। কিন্তু নবী জয়েরিয়ার সৌন্দর্যে খুবই মুগ্ধ হন। ইতিমধ্যে জয়েরিয়ার মুক্তি পন তিন ভরি সোনা ধার্য হয় এবং নবী ঐ পরিমাণ সোনা সাবিতকে দিয়ে জয়েরিয়াকে নিজের দখলে আনেন এবং বিবাহ্ করেন। যাই হোক, সাধারণভাবে জিব্রাইল একাই ওহী বহন করে নিয়ে আসতেন। তবে নবীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর রুহ্‌মুবারক কব্জা করার জন্য মৃত্যুর ফেরেস্তো আজরাইলকে সঙ্গে এনেছিলেন। নবীর মদিনা বাসকালে এত বাণী অবতীর্ণ হত যে জিব্রাইলের বিশ্রাম নেবার সময় থাকত না। মদিনার সমজিদ নব্‌বীর দরজাগুলোর বিশেষ নাম আছে, যেমন "বাবে রহমৎ" বা দয়ার দ্বার, "বাবে আন নিসা" বা মহিলাদের দ্বার ইত্যাদি। ওহী নিয়ে আসার সময় জিব্রাইল তাঁর জন্য সংরক্ষিত বাবে জিব্রাইল দিয়েই যাতায়াত করতেন।

৬১০ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসের সম্ভবত ২৭ তারিখে, শবে কদরের রাত্রিতে সর্বপ্রথম কোরানের বাণী অবতীর্ণ হয়। ঐ দিন রাত্রে মহম্মদ যখন হেরা

পর্বতের এক গুহায় উপাসনায় মগ্ন ছিলেন তখন জিব্রাইল সেখানে উপস্থিত হয়ে মহম্মদকে ডাকলেন, "ইয়া আন্‌তা রসুলুল্লা" (হে আল্লার রসুল)। প্রথমবার জিব্রাইলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরতে দেখেন তিনি জিব্রাইলের সঙ্গে বসে আছেন এবং তাঁর এক হাত জিব্রাইলের বুকে, অন্য হাত জিব্রাইলের হাতে। ঐ সময় তাঁরা দুই ধনুকের চেয়েও পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছিলেন বা তাঁদের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল (৫৩/৮,৯)। আগেকার দিনে বেদুইনদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে আকাশে তীর ছুঁড়ত। তখন তাদের মধ্যেকার দূরত্ব দুই ধনুকের চেয়ে কম হত। এইভাবে তীর ছুঁড়ে বন্ধুত্ব করা অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের লক্ষণ বিবেচিত হত। আগেই বলা হয়েছে যে মেরাজ এর দিন আল্লা এবং মহম্মদের মধ্যেকার দূরত্বও দুই ধনুকের চাইতে কম হয়েছিল।

যাই হোক, অতঃপর জিব্রাইল মহম্মদকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "আপনি পড়ুন।" মহম্মদ বললেন, "আমি উম্মী (নিরক্ষর), পড়তে শিখিনি।" এরপর জিব্রাইল তাঁকে আরও দু বার আলিঙ্গন করলেন এবং একই কথা বললেন এবং মহম্মদও একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বার আলিঙ্গন করার পর জিব্রাইল পাঠ করলেন ফোরকান বা সত্যাসত্যের পৃথককারী আসমাণী কেতাব কোরানের প্রথম বাণী। মধুরকণ্ঠে বললেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে; তুমি পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না" (৯৬/১-৫)। আল্লা অবশ্য অনেক আগেই স্বর্গীয় কোরান লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং জিব্রাইল রত্নখচিত সেই স্বর্গীয় কোরান থেকেই পাঠ করেছিলেন।

কোরান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, যে গ্রন্থ পাঠ করা উচিত অথবা শুধু পাঠ। এর অন্য নাম কালামাল্লা, কালামপাক ইত্যাদি। যাই হোক, শবে কদরের সেই দিন থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হয়েছে। এর আগে মুসার প্রতি অবতীর্ণ কেতাব তওরাৎ এবং দাউদ (বাইবেলের ডেভিড)-এর প্রতি অবতীর্ণ কেতাব জবুর এক সাথে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁরা তা লিখে নিয়েছিলেন। (এখানে জবুর গ্রন্থ নামে বাইবেলের Psalms অংশকে বোঝায়)। কিন্তু মহানবী নিরক্ষর ছিলেন বলে সর্বজ্ঞ আল্লা মহাগ্রন্থ কোরান এক সাথে অবতীর্ণ না করে ভাগে ভাগে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মহানবী ভুলে না যান (২৫/৩২)। এই ব্যবস্থা করে সর্বজ্ঞ আল্লা

বিশ্বাসীদের আর একটা সুবিধা করে দিয়েছিলেন, তা হল তাঁদের প্রয়োজন মাফিক উপযুক্ত আয়াৎ অবতীর্ণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যেমন মক্কা বাসকালে আল্লা খুব সম্ভবত ভাবেননি যে তাঁকে জিহাদের বাণী অবতীর্ণ করতে হবে, গনিমতের মাল হালাল করতে হবে অথবা নবীর সঙ্গে তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীর বিবাহ সমর্থন করতে হবে। কিন্তু নবীর মদিনা বাসকালে ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত বাণীর প্রয়োজন দেখা দিল এবং আল্লা একে একে তা সবই অবতীর্ণ করলেন। যাই হোক, আল্লা মহানবীকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন করলেন যাতে ভাগে ভাগে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও তিনি অবতীর্ণ বাণী ভুলে না যান (৮৭/৬)।

নবীর মৃত্যুশয্যায় শেষ যে আয়াৎ অবতীর্ণ হয় তা হল," তবে যদি কেহ অসিয়ৎকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংশা করে দেয় তবে তার কোন অপরাধ নাই; নিশ্চয়ই আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (২/১৮২) [৪৮]। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্রে এমন কোন তথ্য প্রমাণ নেই যে উপরিউক্ত বাণীর দ্বারা স্বর্গীয় কোরানের বাণী নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই মহানবীর দেহত্যাগের ফলে জিব্রাইল নিদারুণ পথশ্রম থেকে রেহাই পেলেন বটে, কিন্তু আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ থেকে গেল যে, আল্লা মনুষ্য জাতিকে যা বলতে চেয়েছিলেন তার সবটা বলা হয়েছিল কি না!

কাজেই বলা যায় যে, আল্লা সমগ্র স্বর্গীয় কোরান অবতীর্ণ করার আগেই আল্লার রসুল ধরা ধাম ত্যাগ করে চলে গেছেন। এবং যেহেতু মহম্মদের পরে আর কোন নবী জন্মাবেন না, তাই সেই স্বর্গীয় কোরানের অবশিষ্ট অংশ মনুষ্যজাতি আর কোন দিনই জানতে পারবে না। তাহলে প্রশ্ন হল সেই অজানা অবশিষ্ট অংশ কতটা। এমন হতে পারে যে স্বর্গীয় কোরানের আর সামান্য অংশই বাকী ছিল এবং নবী আর এক সপ্তাহ কি এক মাস জীবিত থাকলেই আল্লা সমগ্র কোরান অবতীর্ণ করে ফেলতে পারতেন। আবার এমনও হতে পারে যে, স্বর্গীয় কোরানের খুব সামান্য অংশই অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছে।

সমগ্র কোরান শরীফ ১১৪ টি সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি সুরা কতগুলি বাক্য বা আয়াতে বিভক্ত এবং সমগ্র কোরান শরীফে মোট ৬১৪১ টি আয়াৎ আছে। এছাড়া পড়ার বা মুখস্থ করার সুবিধার জন্য সমগ্র কোরান শরীফকে কতগুলি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন পুরো রমজান মাসে কোরান শরীফ একবার খতম করার নিয়ম, তাই তাকে সমান ৩০ ভাগে ভাগ

(৪৮) কোরান শরীফ, ডঃ আব্দুল গনি, পৃঃ ২১

করা হয়েছে যার এক এক ভাগকে এক এক পারা বা সিপারা বলে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন সুরার মাঝখানেই একটা পারা শেষ হয়েছে এবং পরবর্তী পারা শুরু হয়েছে। মহম্মদের অনুচর এবং পরবর্তীকালে ইসলামী দুনিয়ার তৃতীয় খলিফা ওসমান সাত দিনে কোরান খতম করতেন। জুমআর দিন তিনি কোরান তিলাওয়াৎ শুরু করতেন এবং বৃহস্পতিবার শেষ করতেন। তিনি এক এক দিনে কোরানের যতটা অংশ খতম করতেন তাকে মঞ্জিল বলে। এই অনুসারে কোরান শরীফ আবার সাতটি মঞ্জিলে বিভক্ত। এই মঞ্জিলগুলি অবশ্য কোন সুরার মাঝখানে শেষ বা শুরু হয়নি। আগেকার দিনে কোন কাফেরের পক্ষে কোরান শরীফ পড়া তো দূরে থাক, স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে কোরানের বাংলা অথবা ইংরাজী অনুবাদ যত্র তত্র কিনতে পাওয়া যায়। এমন কি ইংরাজী অনুবাদসহ মূল আরবী ভাষায় লিখিত কোরানও দুষ্প্রাপ্য নয়। (৪৯)

কোরান পাঠ করার কতগুলি বিধিনিষেধ আছে। প্রথমত অশুচি হাতে কোরান স্পর্শ করা যাবে না (৫৬/৭৯)। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার আগে ওসমান যখন শুনতে পেলেন যে তাঁর বোন ফতেমা মুসলমান হয়েছে তখন তরবারি নিয়ে তিনি ফতেমাকে কাটতে যান। ফতেমা তখন কোরান শরীফের সুরা "তাহা" পাঠ করছিল। ওসমান তার হাত থেকে কোরান ছিনিয়ে নিতে গেলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাই হোক, মিসওয়াক (দন্তধাবন) ও অজু করে পাক সাফ বা পবিত্র হয়ে কোরান স্পর্শ করতে হবে। তারপর শুদ্ধভূমিতে শুদ্ধ মনে কিবলামুখী হয়ে বসে কোরান শরীফ পাঠ করতে হবে। প্রথমে "আউজবিল্লা" (আল্লার শরণাপন্ন হই) এবং তারপর "বিসমিল্লা" (আল্লার নামে শুরু করছি) বলে পাঠ শুরু করতে হবে। একবার পাঠ শুরু করলে ৩ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে পুরো কোরান শরীফ শেষ করার নিয়ম। একমাত্র সুরা তওবা (৯ নং সুরা) ব্যতীত প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিসমিল্লা বলে সিজদা করে শুরু করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক সুরার মাঝে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক জায়গায় রুকু করতে হবে এবং কিছুক্ষণ বিরাম দিতে হবে। এই সব জায়গায় 'রুকু' লেখা থাকে। এ ছাড়া সমগ্র কোরান শরীফে বারটি বিশেষ আয়াৎ আছে যে গুলো পাঠ করার সময় সিজদা করতে হবে। কেয়ামত ও নরকের বর্ণনাকারী ভয়ঙ্কর আয়াতগুলি পাঠ করার সময় পাঠককে সমানভাবে ভীত হতে হবে এবং কাঁদতে হবে। কান্না না পেলেও চেষ্টা করে কাঁদতে হবে।

আরবী উচ্চারণে অনেক সময় নাকি সুরের ব্যবহার হয় এবং একে গন্না

---

(৪৯) বর্তমান গ্রন্থে উৎস হিসাবে কোরানের উল্লেখ (ক/খ) ভাবে দেওয়া হয়েছে। ক, সুরার ক্রমিক সংখ্যা এবং খ, আয়াত সংখ্যা এবং ডঃ ওসমান গনি অনুদিত কোরান ব্যবহার করা হয়েছে।

বলে, এই গন্না সহযোগে মূল আরবীতে কোরানের ভয়ঙ্কর আয়াতগুলি পাঠকালে শ্রোতার মনে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হয়। এ প্রসঙ্গে Sir John Bagot Glubb বলেন,"The shock often produced such terror that the hearer fainted or fell dead, possibly from a heart attack". (Life and Times of Mohammad, p-96).

কোরানের ২৯ টি সুরার আরম্ভে আরবী বর্ণমালার কয়েকটি (১ থেকে ৪টি) বর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান রয়েছে। একে হরফুল মোকাত্তা বা মোকাত্তায়াত বলে। মোকাত্তায়াতের আক্ষরিক অর্থ বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন এই বর্ণগুলির কি অর্থ হতে পারে এই নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ আছে। তাদের মতে এর প্রকৃত অর্থ আল্লা ও তাঁর রসুল মহম্মদই জানেন। যেমন দ্বিতীয় সুরা, সুরা বকর'এর মোকাত্তায়াত হল আলিফ, লাম, মীম বা আ,ল,ম। অনেকে এর অর্থ করেন আল্লা লতিফ মজিদ অর্থাৎ আল্লা দয়াময় ও মহিমান্বিত। অনেকের মতে আন্‌লি মেন্নি অর্থাৎ আমা হইতে ও আমাতে। অনেক সময় এই মোকাত্তায়াত বা ব্যবচ্ছেদক বর্ণ থেকে পুরো সুরার নামকরণ করা হয়েছে, যেমন ২০ নং সুরা তা হা, ৩৮ নং সুরা সাদ, ৪১ নং সুরা হা মীম এবং ৫০ নং সুরা কাফ।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম দিনের অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ স্থান পেয়েছে ৯৬ নং সুরা আলাক (অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত) এর প্রথম পাঁচটি আয়াতে এবং জীবনের অন্তিম আয়াতটি স্থান পেয়েছে ২ নং সুরা বকর (অর্থ বাছুর)-এর ১৮২ নং আয়াতে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, সময়ের ক্রম হিসাবে সুরাগুলো এবং তাদের অন্তর্গত আয়াতগুলো কি পরিমাণে অবিন্যস্ত। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, কোন আয়াত হয়তো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তার ঠিক আগের বা তার ঠিক পরের আয়াতটি বহু বছর আগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরান শরীফের একজন ইংরাজী অনুবাদক George Sale কোরানের সুরাগুলোকে সময়ের ক্রম হিসাবে মোটামুটিভাবে সাজিয়েছেন এবং সেই হিসাবে দেখা যায় যে সুরা আলাক সর্বপ্রথম এবং সুরা আল মায়েদা (৫নং সুরা, অর্থ খাদ্যদ্রব্য) সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা।

সুরাগুলির নামকরণ ও তার অন্তর্গত বিষয়সমূহও অদ্ভুত। দ্বিতীয় সুরা বকর এর অর্থ বাছুর কিন্তু মাত্র দুটো আয়াতে (৫১ ও ৯২) বাছুরের উল্লেখ আছে। তেমনি ১৬ নং সুরা নহল (অর্থ মৌমাছি) এর মাত্র একটি আয়াতে মৌমাছির উল্লেখ আছে। কাজেই যিনি প্রথম কোরান অধ্যয়ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি যদি কোন সুরায় শিরোনামের সঙ্গে অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়ের সামঞ্জস্য

খুঁজতে যান তবে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবেন। তবে সুরাগুলো সাজাবার ব্যপারে একটা ধরন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সুরা ফতেহা (অর্থ উপক্রমণিকা) বাদে পরবর্তী সুরাগুলি দৈর্ঘ্য অনুসারে পর পর সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে যেমন ২য় সুরা বকরের আয়াত সংখ্যা ২৮৬, ৩য় সুরা আল ইমরান (মরিয়ম বা মেরীর পিতা, ঈশার মাতামহ) এর আয়াত সংখ্যা ২০০, ৪র্থ সুরা নিসা (অর্থ স্ত্রীলোক) এর আয়াত সংখ্যা ১৭৫, ৫ম সুরা আল মায়েদা'র আয়াত সংখ্যা ১২০ ইত্যাদি। শেষের দিকের সুরাগুলির আয়াত সংখ্যা খুবই কম, ২০ কিংবা ৩০, কিংবা ৪০-এর মধ্যে। এই কারণে প্রথম ২০ টি সুরা কোরানের অর্ধেক দখল করে আছে এবং প্রথম ৪৫ টি সুরা ৮০ শতাংশ দখল করে আছে।

আল্লার বাণী কখন কোথায় অবতীর্ণ হবে তার কোন ঠিক ছিল না। কখনও মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে, কখনওবা পাহাড় পর্বতের উপরে, কখনও বা তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে বাণী অবতীর্ণ হত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নবী তা মনে করে রাখতেন এবং পরে তাঁর সঙ্গীসাথীরা তা খেজুর পাতা, হাড়, চামড়া অথবা নিজেদের বুকে তা লিখে রাখত। তৎকালীন আরবদের মধ্যে অনেকেরই স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে তারা সম্পূর্ণ কোরান মুখস্থ বলতে পারত। যে যতখানি কোরান মুখস্থ বলতে পারতো তার তত সম্মান ছিল। এর ভিত্তিতে মসজিদের ইমাম নির্বাচন করা হত। যুদ্ধ ক্ষেত্রের শহীদদের মধ্যে যে কোরান মুখস্থ বলতে পারতো তাকে সবার আগে দাফন করা হত। যারা পুরো কোরান মুখস্থ বলতে পারতো তাদের হাফিজ বলা হত। মহম্মদের অনুচরদের মধ্যে পাঁচ ছয় জন হাফিজ ছিল। বছরে একবার জিব্রাইলের সঙ্গে মহম্মদ পুরো কোরান মুখস্থ বলতেন। ম কালে তিনি ৭০ টি সুরা মুখস্থ বলেন যার মধ্যে ৭ টি বড় সুরা ছিল।

কিন্তু লিখিত খণ্ডাংশগুলি সংরক্ষণের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। নবীর নিজস্ব কোন ঘর ছিল না এবং তিনি পত্নীদের ঘরে ঘরে কাটাতেন বলে সংরক্ষণের অসুবিধা হত। অনেক সময় এমন হত যে, বাণী অবতীর্ণ হল কিন্তু সময়কালে তা লিখে রাখা হল না। কালক্রমে নবীও তা ভুলে গেলেন এবং এভাবে সে বাণী লুপ্ত হয়ে গেল। আবার অনেক সময় নবী হয়তো কিছু বললেন, কিন্তু অনুচরেরা তা আল্লার বাণী বলে লিখে রাখল এবং কালক্রমে তা কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অনেকের মতে আজকের কোরানের ৯১,১০০,১০২ ও ১০৩ নং সুরাগুলি আদৌ আল্লার বাণী নয়। [৫০] এই সুরাগুলো উপরিউক্ত উপায়ে কোরানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কোরানের কিছু

(৫০) Life of Mahomet, Sir W. Muir, (Voice of India) P-Xiv.

কিছু বাণী আছে যার উপযোগিতা ছিল খুবই তাৎক্ষণিক। কাজেই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে সে বাণীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল। এই কারণে এই সব তাৎক্ষণিক বাণীরও বেশ কিছু অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন।

মহম্মদের নবীত্বের সাফল্য দেখে ১০ম ও ১১শ হিজরীতে, অর্থাৎ মহম্মদের মৃত্যুর ঠিক পরেই, তালিহা, মুসাইলিমা ও আল আসোয়াদ নামে তিন ব্যক্তি নিজেদের নবী বলে প্রচার করতে শুরু করে। প্রথম খলিফা আবুবকর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন এবং ইয়োমানা নামক স্থানে মুসলমানদের সঙ্গে মুসাইলিমার বাহিনীর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বেশ কয়েকজন হাফিজ মারা যায়। এই ঘটনায় ওমর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন কারণ আর যে কয়জন হাফিজ অবশিষ্ট আছে তারা মারা গেলে কোরান শরীফই লুপ্ত হবার উপক্রম হবে। ওমর তাঁর এই আশঙ্কার কথা আবু বকরকে জানালেন। আবুবকর তৎক্ষণাৎ ওমরের পরামর্শকে সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে কোরানের সমস্ত খণ্ডাংশগুলি সংগ্রহ করে সমগ্র কোরান গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে আদেশ জারি করলেন এবং মহম্মদের সহকারী যায়েদ বিন সাবিত এর উপর এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন এই ব্যক্তিকে মহম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বলে বর্ণনা করেছেন [৫১]। কিন্তু সম্ভবত এই অনুমান ঠিক নয় কারণ মহম্মদের পালিত পুত্রের নাম যায়েদ বিন হারিস, কিন্তু উপরিউক্ত ব্যক্তির নাম যায়েদ বিন সাবিত। আরব দেশে নাম লেখার রীতি এই রকম—মহম্মদ বিন আবদুল্লা বলতে বোঝায় আবদুল্লার ছেলে মহম্মদ। মেয়েদের বেলায় বিন্ বা ইব্‌নের বদলে বিন্ত হয়, যেমন ফতেমা বিন্ত মহম্মদ বলতে বোঝায় মহম্মদের কন্যা ফতেমা। কোন দুই ব্যক্তির নিজের নাম ও বাবার নাম এক হয়ে গেলে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য ঠাকুর্দা পর্যন্ত যেতে হবে, যেমন মহম্মদ বিন আবদুল্লা বিন আবদুল মোওালেব বলতে বোঝায় আবদুল মোওালেবের ছেলে আবদুল্লা, তার ছেলে মহম্মদ। আমাদের দেশে যেমন অনেক সময় কোন ব্যক্তি বা কোন মহিলাকে সরাসরি নাম ধরে না ডেকে অমুকের বাবা বা অমুকের মা, এই ভাবে ডাকার রেওয়াজ আছে, তেমনি আরবে আবু বলতে বোঝায় বাবা এবং উম্মে বলতে বোঝায় মা। যেমন আবু বকর বলতে বোঝায় কুমারীর বাবা (কুমারী এখানে বিশেষ অর্থে আয়েশা) এবং উম্মে সালামা বলতে বোঝায় সালামার মা।

যাই হোক, দুই তিন বছরের চেষ্টায় কোরানের যে খণ্ডাংশগুলি সংগৃহীত

---

(৫১) কোরান শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ১২

হল যায়েদ তা সংকলিত করে ওমরকে দিলেন এবং ওমর তা তাঁর কন্যা ও নবীর বিধবা পত্নী হাফসাকে যত্ন করে তুলে রাখতে বললেন। ওমর মারা যাবার পর ওসমান খলিফা হয়ে সীরিয়ায় গিয়ে দেখলেন যে, সেখানকার নব্য মুসলমানরা যে কোরান পাঠ করছে তার সঙ্গে যায়েদ দ্বারা সংকলিত কোরানের অনেক অমিল আছে। তাঁর আদেশে কোরানের ঐ সমস্ত নকল পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হাফসার কাছে যেই কোরান রাখা ছিল তার হুবহু নকল করিয়ে বিভিন্ন বিজিত দেশে পাঠানো হয়। আজকের যাবতীয় কোরান গ্রন্থ ওসমান দ্বারা স্বীকৃত সেই কোরানের অবিকল অনুরূপ। উপরন্তু মহম্মদের জীবিতাবস্থায় যায়েদ তাঁর সামনে যে কোরান আবৃত্তি করতেন ঠিক সেই হিসাবেই তিনি কোরানের খণ্ডাংশগুলিকে গ্রথিত করেন। কাজেই বলা যায় যে, নবীর জীবিতকালে যে কোরান আবৃত্তি করা হত, আজকের কোরানও অবিকল তাইই আছে।

বিষয়বস্তু হিসাবে কোরানের আয়াতগুলিকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা চলে যেমন (১) যে সব বাণীকে শাশ্বত বলা চলে, (২) আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ক, (৩) ইসলামের পূর্বেকার নবীদের ইতিহাস বিষয়ক, (৪) ইসলামের ধর্মীয় রীতি নীতি বিষয়ক, (৫) তৎকালীন আরবের সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ক, (৬) জিহাদ ও গনিমতের মাল বিষয়ক, (৭) অপরাধ ও তার শাস্তি বিষয়ক, (৮) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক ও কেয়ামত বিষয়ক এবং (৯) খুবই তাৎক্ষণিক সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ক।

প্রত্যেক সুরায়, বিশেষ করে শুরুতে কিছু কিছু আয়াত আছে যাতে আল্লার মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। আল্লাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে, আল্লার দয়া ভিক্ষা করা হয়েছে ইত্যাদি আয়াতগুলিকে শাশ্বত বলা চলে। শেষের দিকে ছোট ছোট সুরাগুলিতে এ রকম আয়াত বেশী আছে। এই সব আয়াতের বেশীর ভাগই মক্কায় অবতীর্ণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ছয়দিনে আল্লার আকাশ, পৃথিবী, জল, মাটি, যাবতীয় জীবজন্তু এবং আদমকে সৃষ্টি করার বর্ণনা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে আগেকার দিনের নবীদের কাহিনী। এমনও আছে যে একই নবীর একই কাহিনী বিভিন্ন সুরায় বার বার বলা হয়েছে। এই সব নবীদের মধ্যে প্রধান হলেন (ক) হজরৎ আদম (খ) নবী নূহ্ আদমের ১০ম পুরুষ, যার সময় জলপ্লাবন সৃষ্টি করে আল্লা কাফেরদের ডুবিয়ে মারেন এবং নূহ্ এক বিশাল নৌকা তৈরী করে আল্লার সৃষ্ট প্রাণীকুলকে রক্ষা করেন। (গ) আদ জাতির নবী হুদ, যার কথা না শোনার ফলে আল্লা ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করেন এবং এর ফলে এক কালের জন বসতিপূর্ণ

এলাকা আজকের আরবের সর্বাপেক্ষা বড় মরুভূমি রাব অল-খালিতে পরিণত হয়। (ঘ) নবী ইব্রাহীম, যার বৃত্তান্ত হজ ও কোরবানী অংশে বলা হয়েছে। (ঙ) নবী লুত, যিনি হজরৎ ইব্রাহীমের ভ্রাতস্পুত্র ছিলেন, যার সময়ে আল্লার আদেশে জিব্রাইল সদুমা নগরীকে তুলে আছাড় মারেন, যার ফলে আজকের মরুসাগরের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আছেন (চ) নবী মুসা যিনি মিশর থেকে ইহুদীদের মুক্ত করে আনেন এবং আল্লার কাছ থেকে তত্তরাৎ গ্রন্থ লাভ করেন। এর পর আছে কয়েক জন ইহুদী রাজা তথা নবীর কাহিনী যেমন (ছ) তালুত, (জ) দাউদ ও (ঝ) সুলেমান। এইসব গল্প পড়লে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এরা সবাই ছিলেন অশিক্ষিত পশুপালক যাযাবর। পৃথিবীতে এঁদের একটাই কাজ ছিল, তা হল মূর্তি পূজকদের ক্ষতি করা। উপরিউক্ত ইহুদী রাজাদের সম্বন্ধে Sir H.G.Wells লিখেছেন, "It is a tale of barbaric Kings ruling barbaric people" [৫২]। সব শেষে আছে (ঞ) নবী ইশা বা যীশুর কাহিনী।

আরব্য মুসলীম সমাজের রীতি নীতি সংক্রান্ত বিষয়টির ব্যাপ্তি খুবই বিশাল। বহু বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন কোন্ কোন্ পশু খাওয়া যাবে, কোন্ কোন্ রমণীকে বিবাহ্ করা যাবে এবং ক'জনকে বিবাহ্ করা যাবে, কাফেরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কি ভাবে তালাক দিতে হবে, তালাক দেওয়া পত্নীকে পুনরায় কেমন করে বিবাহ্ করা যাবে, মৃতের সম্পত্তির কে কত অংশ পাবে, মেয়েরা কাদের সামনে পর্দাপালন করবে এবং কাদের সামনে করবে না ইত্যাদি। এক কথায় এর ব্যাপ্তি শয়নঘর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত। এই কারণেই মুসলমানরা কোরানকে আল্লার সংবিধান বলে। জিহাদ ও স্বর্গ নরক ইত্যাদি বিষয়সমূহ আগেই বলা হয়েছে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের আয়াতগুলির মধ্যে পড়ে যুদ্ধকালীন সমস্যা এবং নবীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত আয়াত সমূহ।

আমরা যারা আরবী ভাষা জানি না তাদের পক্ষে মূল আরবী কোরানের ভাষার মাধুর্য ও কাব্যিক রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মূল কোরানের ভাষা খুবই উৎকৃষ্ট এবং কাব্য গুণে সমৃদ্ধ। এমন অনেক ঘটনা আছে যাতে দেখা যায় যে ইসলাম ও মহম্মদের ঘোরতর শত্রু কোরান পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। ওমরের কথাই ধরা যাক। যখন ওমর শুনলেন যে বোন ফতেমা ইসলাম কবুল করেছে তখনই তিনি ক্রোধে অন্ধ হয়ে ছুটলেন ফতেমাকে কেটে ফেলতে। ফতেমা তখন সূরা তাহা পাঠ করছিলেন এবং তা শুনে ওমর এতই মুগ্ধ হলেন যে সেই মুহূর্তেই

(৫২) H. G. Welts, Ahort History of the World (Penguin), P-87

মহম্মদের কাছে ছুটলেন মুসলমান হবার জন্য। মহম্মদের অনুচরেরাও ওমরের এই মানসিক পরিবর্তন বুঝতে পারে নি। তারা পথ আটকে দাঁড়াল, ভাবল ওমর বুঝি নবীকে খুন করতে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন লিখছেন, "ইহার পদ বিন্যাস এবং রচনা কৌশল এত চমৎকার যে, একজন বর্ণ জ্ঞানহীন লোকের মুখ হইতে তাহা অনর্গল নির্গত হওয়া সর্বাপেক্ষা প্রধান অলৌকিক ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেক আয়াতে দর্পের সহিত এইরূপ উক্তি আছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে ইহার ন্যায় একটি আয়াতও বর্ণন করিতে পারে? বাস্তবিক পক্ষে তৎকালে আরবদেশে পণ্ডিত, রচয়িতা, কবি এবং সুবক্তার অভাব ছিল না। সেই শ্রেণীর অসংখ্য লোক হজরতের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কোরান শ্রবণ করিত এবং পরিশেষে বলিয়া যাইত যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন ভূতের সাহায্যে এ প্রকার অলৌকিক কথা প্রকাশ করিতেছে।"(৫৩)

বাস্তবিকপক্ষে নবীর মদিনায় হিজরৎ করার আগে মক্কার যে সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা কোরানে মুগ্ধ হয়েই তা করেছিলেন, কারণ তখন তরবারির সাহায্যে মুসলমান করার কোন প্রশ্নই ছিল না। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, কোরানের ভাষা এবং রচনা কৌশল খুবই উচ্চাঙ্গের। এই কারণে তৎকালীন মক্কাবাসীরা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইত না যে নিরক্ষর মহম্মদের দ্বারা অমন সুন্দর আয়াত রচনা করা সম্ভব। তারা একে এক নির্ভেজাল জালিয়াতি বলে মনে করত এবং আজমীভাষী মহম্মদের একজন সাহায্যকারী আছে বলে প্রচার করত। আরববাসীরা আরবী ভিন্ন অন্য যে কোন ভাষাকেই আজমি বা নিকৃষ্ট ভাষা বলে মনে করত। তবে এক্ষেত্রে তারা আজমি ভাষা বলতে বিশেষ অর্থে ফার্সী ভাষা এবং আজমিভাষী বলতে পারস্যের কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করতো। এই অপবাদের জবাবে আল্লা বলেন, " আমি তো জানিই তারা বলে তাকে (মহম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ, ওরা যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার ভাষাতো আরবী নয়, কিন্তু কোরানের ভাষা স্পষ্ট আরবী (১৬/১০৩)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, আল্লা অস্বীকার করছেন না যে কোন সাহায্যকারী আছে। তিনি শুধু এটুকুই বলছেন যে, সেই সাহায্যকারী যদি অন্য ভাষাভাষী হয় তবে আরবীতে কোরান অবতীর্ণ হয় কেমন করে?

যে কেউ কোরানের অংশবিশেষ পড়লেই বুঝতে পারবেন যে রচনাকারীর

(৫৩) কোরআন শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন, (হরফ), পৃঃ ১৩

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ঘটনাবলীতে ভাল দখল থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে কোরানে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব, আদম হাওয়ার গল্প ইত্যাদির সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত গল্পের সঙ্গে কোন মৌলিক তফাৎ নেই। কাজেই যারা কোরানকে মহম্মদের মুখনিঃসৃত বাণী বলে মেনে নিতে রাজী আছেন, তাঁদের জন্য নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা চলতে পারে।

মহম্মদের বয়স যখন ১২ বছর তখন কাকা আবুতালেব বাণিজ্য করতে সীরিয়ায় যান এবং মহম্মদ তাঁর সঙ্গী হন। পথে বসরা নামক স্থানে বুহায়রা রাহিব নামে নেস্তোরীয় পন্থী একজন খৃষ্টান সাধুর সাথে দেখা হয়। এই নেস্তোরীয়রা বিশ্বাস করতো যে যীশুর পার্থিব শরীর এবং তাঁর স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। ঐ সময় মহম্মদ একদিন একটা গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং এ থেকে সাধু বুহায়রা তাঁকে আরবের ভবিষ্যৎ নবী বলে সনাক্ত করেন। কারণ বুহায়রা বিশ্বাস করতেন যে ঐ বিশেষ গাছটির নীচে একমাত্র নবীরাই বসতে সক্ষম। বুহায়রা আবু তালেবকেও পরামর্শ দেন বালকের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে। এই সাধু বুহায়রার কাছ থেকেই মহম্মদ প্রথম বারের মত বাইবেলের অন্তর্গত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে অবগত হন। এর আগে বালক মহম্মদ মক্কায় বিচ্ছিন্ন দু এক জন ইহুদী ও খৃষ্টান দেখেছেন বটে তবে এই প্রথম তিনি খৃষ্টান অথবা ইহুদী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল দেখার সুযোগ পান। তাদের ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে উপাসনায় ডাকা এবং এক সঙ্গে উপাসনা করার পদ্ধতি দেখেন এবং এর থেকেই পরবর্তীকালে নামাজের উদ্ভব হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাক-ইসলামী আরবে পৌত্তলিকতার প্রচলন ছিল। অনেকের মতে ইসলামের আগে আরবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল এবং তার ফলেই সেখানে পৌত্তলিকতা প্রচলিত হয়। তাদের মতে মক্কার কাবা প্রকৃতপক্ষে মক্কেশ্বর শিবের মন্দির ছিল এবং বর্তমান কৃষ্ণপ্রস্তর হাজরে আসোয়াদ পূর্বেকার শিবলিঙ্গেরই ভগ্নাংশ বিশেষ। কাবার অভ্যন্তরস্থ ৩৬০টি মূর্তি হিন্দু দেবদেবীরই মূর্তি ছিল। কোন কোন মহল আবার এটাও বিশ্বাস করে যে, কোন হিন্দু যদি কাবার ভিতরে গিয়ে ঐ হাজরে আসোয়াদের উপর গঙ্গারজল ঢেলে দিতে পারে তবে পৃথিবী থেকে ইসলাম চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে এবং এই কারণেই কোন অ-মুসলমানকে কাবার ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। উপরিউক্ত মতামত পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে হজক্রিয়ার কিছু কিছু রীতিনীতি যা আজও মেনে চলা হচ্ছে তা হিন্দু রীতির অনুরূপ।

সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের

আগে রোম, গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশর, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে পৌত্তলিক ধর্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্তদেশগুলির পৌত্তলিকতার সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু পৌত্তলিকতার আকাশ পাতাল তফাৎ। ভারতীয় বা হিন্দু পৌত্তলিকতার বৈশিষ্ট হল সর্বেশ্বরবাদ বা pantheism এবং সেই কারণে হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করলেও মনে করে সেই সব দেবদেবী এক ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, সেই "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধাঃ বদন্তি"। এই কারণে হিন্দুর দেবতাদের মধ্যে এবং তাদের আরাধনাকারীদের মধ্যে কোন বিবাদ ও সংঘাত নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এই বিষয়টি বার বার বহুভাবে বলেছেন যেমন

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (৪/১১)

অথবা,

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।

কিন্তু আরবে যে পৌত্তলিকতার প্রচলন ছিল তার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে দেবতায় দেবতায় বিবাদ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উপাসক গোষ্ঠী গুলির মধ্যে হানাহানি রক্তপাত লেগেই থাকত। কাজেই তৎকালীন আরবের পৌত্তলিকতার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু প্রভাব থাকলেও তা যে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল তা হয়ত বলা চলে না।

যাই হোক, ঐ সব খৃষ্টান ও ইহুদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির লোকজনদের দেখে কিশোর মহম্মদ যখন তাদের সঙ্গে আরবের লোকজনদের তুলনা করলেন তখন দুটো পার্থক্য নজরে পড়ল। প্রথমত, তারা পৌত্তলিক নয় এবং আরবের চরম দারিদ্র্যের তুলনায় তারা অনেক সচ্ছল ও সমৃদ্ধ। এর থেকে মহম্মদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে, আরবের লোকদের দারিদ্র্যের কারণ তাদের পৌত্তলিকতা। পৌত্তলিক হবার কারণে আল্লার অভিশাপে তারা দরিদ্র্য হয়েছে। আরও একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করলেন, তা হল গ্রন্থ। তিনি দেখলেন যে ইহুদীদের তৌরাৎ এবং খৃষ্টানদের ইঞ্জীল গ্রন্থ আছে কিন্তু আরবজাতির নিজস্ব কোন গ্রন্থ নেই। তাই তিনি মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন, "হায় আমাদের যদি একখান গ্রন্থ থাকত।"

এই সময় মরু সাগরের কাছ দিয়ে যাবার সময় যখন তাঁকে বোঝানো হল যে, আল্লা কতৃক সদুম নগরী ধ্বংসের ফলেই এই বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি আল্লার ক্রোধ এবং আযাবের সেমিটিক তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন এবং অভিভূত হলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হল যে,

আল্লার আঘাতেই আরব জাতি চরম দারিদ্র্যের জীবন যাপন করছে এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় একেশ্বর আল্লার উপাসনা করা এবং পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা।

মহম্মদের বয়স যখন ২৫ বছর, তখন খাদিজার কর্মচারী হিসাবে তিনি আরও একবার সীরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান। সে বার তিনি সেখানে দুমাস কাটান এবং তত্তরাৎ ও হঞ্জিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও গভীর হয়। সেখানকার খাসামিদ রাজ্যের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝত এবং অনুমান করা চলে যে মহম্মদও তাদের ভাষা কিছুটা বুঝতেন, নতুবা তাঁর পক্ষ্যে ব্যবসা করা অসম্ভব হত। এই ভাষা বোঝার জন্য তিনি তত্তরাৎ-এর গল্পগুলি আরও বেশী করে বোঝার সুযোগ পেলেন।

মক্কায় আমর বিন আল খজমী নামে এক ব্যক্তির খবর নামে এক গ্রীক ক্রীতদাস ছিল। ইয়াসের নামে আরও একজন ক্রীতদাস খবরের বন্ধু ছিল। এরা দুজনেই লিখতে পড়তে জানত। মহম্মদ যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের তত্তরাৎ পাঠ শুনতেন [৫৪]। কায়েস নামে আরও একজন খৃষ্টান ক্রীতদাস ছিল যার বাড়ীতে মহম্মদ প্রায়ই যাতায়াত করতেন। আয়েস নামে আরও একজন ক্রীতদাস ছিল যার তত্তরাতে ভাল জ্ঞান ছিল এবং মহম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির পর সে ইসলাম কবুল করে মহম্মদের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিল। এদের মধ্যে কার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করেছিলেন এ ব্যাপারে মুসলমান ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে আবার ওৎবা বিন রবিয়া নামক ব্যক্তির আদ্দাস নামে এক ক্রীতদাসকে সেই ব্যক্তি বলে সন্দেহ করেন।[৫৫]

এ ব্যাপারে যাঁকে সব থেকে বেশী সন্দেহ করা হয় তিনি হলেন পারস্যের ইস্পাহান নিবাসী সলমন নামে এক ব্যক্তি। ইনি পারস্য থেকে সীরিয়ায় গিয়ে খৃষ্টান হন। পরে সাধু বুহায়রার সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে আরবে যেয়ে মহম্মদের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দেন। সেই অনুসারে তিনি মদিনায় এসে মহম্মদের সঙ্গে মিলিত হন। হিজরৎকালে মহম্মদ যখন কোবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন সলমন সেখানে মহম্মদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই মহম্মদ বুঝতে পারলেন যে, এই সেই ব্যক্তি যাকে তিনি খুঁজছেন। সলমনের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী যাকে আরবের লোকেরা আজমী ভাষা বলত। কিন্তু সলমনকে সেই সাহায্যকারী বলে মেনে নিতে দুটো

(৫৪) The Koran, George Sale, (Frederick Warne, London), P-267.
(৫৫) Ibid, P-268.

সন্দেহের কারণ থাকছে। প্রথমত, সলমন আরবে আসেন হিজরতের পরে, কাজেই মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোর ব্যাপারে তার হাত থাকা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোরানের উপরিউক্ত আয়াতটি (১৬/১০৩) মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলেই বেশীরভাগ ভাষ্যকারের বিশ্বাস। যদি ধরে নেওয়া যায় যে উপরিউক্ত আয়াতটি মদিনাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতগুলির সাহায্যকারী কে ছিল। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা চলতে পারে।

দুবার সীরিয়া ভ্রমণকালে মহম্মদ সেমিটিক ধর্মের মূল বিষয়গুলো, যেমন, সৃষ্টি, আল্লার ক্রোধ ও আযাব, স্বর্গ, নরক, শেষবিচার ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হন। বিশেষ করে আল্লার আযাবের তত্ত্ব তাঁর মনে এতটা রেখাপাত করে যে, পরবর্তীকালে ঝড় বৃষ্টিকে তিনি আল্লার আযাব বলে মনে করতেন এবং ভয় পেতেন (কোরান-৪৬/২৪, মুসলীম-১৯৬৩)। এছাড়া মক্কায় খবর, ইয়াসের, আয়েস ইত্যাদির তত্তরাৎ পাঠ শুনে শুনে সেগুলোকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। ইতিমধ্যে সাধু বুহায়রা তাঁকে আরবের ভবিষ্যৎ নবী বলে চিহ্নিত করার ঘটনাও তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। সর্বোপরি আরব জাতির জন্য আরবী ভাষায় একখানি গ্রন্থ লাভ করার তীব্র বাসনাও তাঁর মনে নিরন্তর কাজ করে চলেছিল। যেমন করেই হোক, গ্রন্থ তাঁকে পেতেই হবে, কারণ গ্রন্থই হল নবীত্ব প্রমাণ করার দলিল স্বরূপ। এই তীব্র বাসনার সঙ্গে যুক্ত হল অপর কোন ব্যক্তির সাহায্য এবং নিজের কবিত্ব শক্তি, যা এত দিন সুপ্ত ছিল। Sir H.G. Wells মহম্মদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখছেন, "He married a number of wives in his declining years, and his life on the whole was by modern standards unedifying. He seems to have been a man compounded of very considerable vanity, greed, cunning, self-deception and quite sincere religious passion." (৫৬) এই sincere religious passionই কোরান অবতীর্ণ হবার মূল কারণ বলে অনুমান করা চলে। এই জগতে ভাল কাজ বা খারাপ কাজ, যাই হোক না কেন, এই passion বা তীব্র ইচ্ছা ছাড়া হয় না। এই passion দৈব প্রকৃতির হলে তাতে জগতের কল্যাণ হয় এবং অসুর প্রকৃতির হলে তাতে জগতের অকল্যাণ হয়। আসুরিক passion দ্বারাই হিটলার সমস্ত জগৎ জুড়ে মারণযজ্ঞ

(৫৬) H.G. Wells, Ashort History of the World (Penguin), P-177.

চালিয়েছিল, স্ট্যালিন কোটি কোটি ইউক্রেনীয় কৃষককে হত্যা করেছিল অথবা কাম্বোডিয়ার পল পট অন্তত ১০ লক্ষ দেশবাসীকে হত্যা করেছিল। অপর দিকে দৈব passion দ্বারা চালিত হয়েই বুদ্ধদেব জগতে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন, সম্রাট অশোক প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন এবং আধুনিককালে শ্রীচৈতন্য মানুষে মানুষে প্রেম মৈত্রী বন্ধন প্রচার করে গেছেন। আসুরিক বা পাশব passion-ই যে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কোরানের সমগ্র আয়াতগুলিকে সরাসরি দুই ভাগে ভাগ করা চলে, মাক্কি এবং মাদানি। হিজরতের আগে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতগুলিকে মাক্কি আয়াত এবং হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ আয়াতগুলিকে মাদানি আয়াত বলে। নবী মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও চিন্তা ভাবনার দ্বারা এই আয়াতগুলি ভীষণভাবে প্রভাবিত। হিজরতের আগে তিনি ছিলেন একজন মাত্র পত্নী বিবি খাদিজাকে নিয়ে ঘর করা একজন নবী মাত্র। তখন তাঁর কাজ ছিল সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে মক্কার অধিবাসীদের কাছে আল্লাতায়লার বাণী পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে আল্লার ক্রোধ এবং আযাব সম্পর্কে শতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু হিজরতের পরে তিনি হলেন একাধারে মদিনার প্রশাসক, প্রধান বিচারক এবং সামরিক সেনা নায়ক। এক কথায় মদিনার সর্বময় অধিকর্তা। হিজরতের আগে নবী কোনদিন চিন্তা করেন নি যে তরবারির সাহায্যে ইসলামের প্রসার ঘটাবেন। তখন ভয় বলতে ছিল আল্লার ভয়, নরকের শাস্তির ভয়, তরবারির ভয় নয়। তখন আল্লা বললেন, "আল্লা অত্যাচারীদের ভালবাসেন না" (৩/১৪০), "নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে" (১৪/২২), "আল্লা অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না"(৫/৬৪), "আল্লা উদ্ধত ও অহঙ্কারীদের ভালবাসেন না" (৫৭/২৩), "কেউ ধৈর্যধরলে বা ক্ষমা করলে তা হবে বীরত্বের কাজ" (৪২/৪৩), "তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে (প্রিয়), আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)" (১০৯/৬), "(আল্লার বাণী) প্রচার করাই রসূলের একমাত্র কাজ" (৫/৯৯) ইত্যাদি নিরীহ ও অহিংস বাণী।

কিন্তু হিজরতের পর আল্লা প্রথমেই বলে রাখলেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা (নবীর প্রতি) বিনত হয়" (৭/৯৪), এবং এই বাণীর দ্বারা নবীকে মদিনাবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাবার একচ্ছত্র অধিকার হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লা তাঁর বান্দাদের যুদ্ধ করার অধিকার ও অনুমতি দিলেন এবং মদিনার অ-মুসলমান ও মোনাফেকদের মনে ত্রাসের

সঞ্চার করতে বললেন (২/২১৬,২২/৩৯)। ইতিমধ্যে নবী জিহাদের তত্ত্ব অবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং আল্লাও তখন থেকেই জিহাদের রক্তাক্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন। আল্লা বলতে থাকলেন, "তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়" (৮/৩৯) এবং নবীও আল্লার শক্তির চাইতে তরবারির শক্তির উপরই বেশী নির্ভরশীল হতে থাকলেন। আল্লা অ-মুসলমানদের প্রতি ক্ষমার আদর্শে অবিচল থাকতে পারলেন না এবং বললেন, "ওরা নিকৃষ্ট জীব" (৮/৫৬), "ওরা পশুর সমান"(৭/১৭৯), "ওদের যেখানে পাও হত্যা কর" (৯/৫), "ওদের গর্দানে আঘাত কর" (৪৭/৪), "ওদের গলায় আঘাত কর" (৮/১২), "ওদের হাত পা কেটে ফেল" (৫/৩৩) ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুটের মাল বৈধ ঘোষণা করে (৮/৬৯) লুঠপাটে উৎসাহ দিলেন।

নবীর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতিও আল্লা নজর দিতে শুরু করলেন এবং লুঠের মালের এক পঞ্চমাংশ তাঁর জন্য বৈধ ঘোষণা করে তাঁর বৈষয়িক উন্নতি ঘটাবার ব্যবস্থা করলেন (৮/৪১) এবং সুন্দরী রমণীতে নবীর হারেম পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাণী অবতীর্ণ করে বললেন, "হে নবী , তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের তুমি দেন মোহর [৫৭] দান করেছ, এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে, যাদের আমি দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাত ভগ্নী ও ফুফুত ভগ্নী, মামাত ভগ্নী ও খালাত ভগ্নীকে যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে। তা ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহে বৈধ করতে চাইলে তাও বৈধ। এ ব্যবস্থা শুধু তোমার জন্য, অন্য কোন বিশ্বাসীর জন্য নয়; যাতে তোমার অসুবিধা না হয়" (৩৩/৫০)। নবী তাঁর পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে আল্লা সেই অনুমতিও নবীকে দিয়ে দিলেন (৩৩/৩৭) এবং স্ত্রীদের মধ্যে যাকে যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে এবং বাকীদের দূরে রাখতে পরামর্শ দিলেন (৩৩/৫১)। Sir W. Muir এ ব্যাপারে আরও একটা মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, নবী যত দিন মক্কায় এক বিবি খাদিজাকে নিয়ে ঘর করছিলেন, ততদিন আল্লা স্বর্গবাসীদের জন্য শুধু হুরীর আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু খাদিজা মারা যাবার পর নবী যখন একের পর এক নিকাহ্ করতে শুরু করলেন তখন আল্লাও হুরীর বদলে বৈধ স্ত্রীর আশ্বাস দিতে থাকলেন।

(৫৭) মুসলমানদের বিবাহের যে চুক্তিপত্র বা নিকাহ নামা লেখা হয় তাতে পাত্র পক্ষকে একটা টাকার মূল্য লিখতে হয় যাকে দেন মোহর বলে। দেন মোহর পরে দেবার অঙ্গীকার করলেও চলে তবে সেই স্ত্রীকে তালাক দিলে ওই দেন মোহর স্ত্রীকে দিতে স্বামী বাধ্য থাকে।

কাজেই শ্রী আল আমান সাহেবের ভাষায় মদিনায় নবীর হিজরতের পর ইসলাম যে "নতুন রূপে জিন্দা হয়ে উঠল" তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, আমাদের দেশের আলিমরা ইসলামের রক্তাক্ত থাবাটাকে যথাসাধ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে মাক্কি আয়াৎগুলিকেই সব সময় তুলে ধরেন এবং মাদানি আয়াৎগুলোকে (আল আমান সাহেবের ভাষায়) সামাজিক বিপর্যয়ের সময় নিজেদের কাজের জন্য তুলে রাখেন।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে কোরান আল্লার বাণী। তাদের এ বিশ্বাস যে কত গভীর একটা উদাহরণ দিলে তা ভাল বোঝা যাবে। কোরানে আল্লা বলেছেন যে বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের ৩০০০ কিংবা ৪০০০ ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন (৩/১২৪, ১২৫)। এ প্রসঙ্গে আল আমান সাহেব লিখছেন, "বদর যুদ্ধে ফেরেস্তাগণের অংশগ্রহণ ও ধূলি নিক্ষেপের ঘটনা আলকোরানে বিধৃত না হলে আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞান এগুলিকে উড়িয়ে দিত এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ সহজেই অস্বীকার করে বসত" [৫৮]। আল আমান সাহেবকে তাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে যে, কোরানে আল্লাপাক যা যা বলেছেন তার সবকিছুই কি তিনি বিশ্বাস করেন? তিনি কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাতায়লা ছয় দিনে এই জগত সংসার সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি বিশ্বাস করেন যে নবী মহম্মদ প্রথম মানব হজরৎ আদমের ৯০তম পুরুষ এবং সেই কারণে বর্তমান মানুষ্য সমাজের ইতিহাস মাত্র ৪০০০ বছরের পুরাণো? তিনি কি বিশ্বাস করেন যে আকাশ একটা কঠিন ছাদ? তিনি কি বিশ্বাস করেন যে জলের উপরে বসানো নড়বড়ে মাটিকে দৃঢ় করতে আল্লা পাহাড় পর্বতকে পেরেক হিসাবে ব্যবহার করেছেন?

মহম্মদ নুরুল ইসলাম নামে একজন বিজ্ঞানী আলিম " বিজ্ঞান না কোরআন" (এম বি মল্লিক এন্ড ব্রাদার্স) নামে ৩৩৬ পৃষ্ঠার এক বিশাল কেতাব লিখে ফেলেছেন যাতে তিনি দেখিয়েছেন যে আল্লা একজন বৈজ্ঞানিক। আল্লার সৃষ্টিকার্যের একদিনকে তিনি কোটি কোটি বছর বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এই সব তথ্য আল্লা তাকে গোপনে সরবরাহ করেছেন। নুরুল সাহেবের নবী কিন্তু পরিষ্কার বলে গেছেন আল্লা শনিবারে তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু করে পরবর্তী জুমআর দিন আদমকে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা শেষ করেন। কাজেই আল্লাকে বিজ্ঞানী বানাতে গিয়ে তিনি তাঁর নবীর কথার উপরেই কলম চালিয়েছেন এবং সেই কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হবার যোগ্য হয়েছেন। নুরুল সাহেব তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই লিখছেন যে, যেখানে বরফের দরকার আল্লা সেখানে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং যেখানে বাষ্প দরকার সেখানে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করেছেন। কাজেই

(৫৮) কাবার পথে, (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০০

একজন মাধ্যমিকের ছাত্রের পক্ষেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি কত উঁচুদরের বিজ্ঞানী। কারণ ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বরফ আর বরফ থাকবে না, গলে জল হয়ে যাবে। এই সব আলিমরা মনে করেন যে তাঁদের লেখা শুধু বিশ্বাসীরাই পড়বে তাই যা ইচ্ছা তাই লিখে অনর্থক কাগজের অপচয় করেন। এই প্রসঙ্গে জানতে ইচ্ছা হয় যে বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ সমস্ত ইসলামী দেশগুলোতে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের শুধু কোরান বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বই পড়ানো হয় কিনা। যদি এ আশঙ্কা সত্য হয় তা হলে একথাই বলতে হয় যে আল্লাপাক তাঁর বান্দাদের মানুষ হবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে মুসলমান করে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে এককালের যুক্তিবাদী মুসলমান গোষ্ঠী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে কোরানকে স্বয়ং আল্লার বাণী বলা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, কোন রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে স্বর্গ ভ্রমণ অসম্ভব। তাই তারা নবীর মেরাজ ভ্রমণও বিশ্বাস করত না। প্রকৃতপক্ষে কঠিন আকাশ ভেদ করে নবী কেমন করে স্বর্গে গিয়েছিলেন সেটা ভাবতেও বেশ অবাক হতে হয়। তেমনি ফেরেস্তা জিব্রাইল কেমন করে কঠিন আকাশ ভেদ করে আল্লার বাণী নিয়ে আসতেন তাও সমান বিস্ময়কর।

বিশ্বাসীদের মতে কোরান এক অতুলনীয় জ্ঞান ভাণ্ডার। শ্রী রফিকউল্লাহ্ সাহেব তাঁর "হাদিস শরীফ" (হরফ) গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন, "প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কোরান শরীফ হল অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার"। কিন্তু অবিশ্বাসীদের বুঝতে একটু অসুবিধা হয় যে তিনি কোন্ কোন্ জ্ঞানের কথা বলতে চাইছেন। তিনি কি সেই সব জ্ঞানের কথা বলতে চাইছেন যেখানে আল্লা বলছেন যে, তাঁর কোন স্ত্রী নেই, তিনি ছয় দিনে জগত সৃষ্টি করেছেন, মুসলমান ছাড়া আর সবাই নরকে যাবে, স্বর্গবাসীরা হাজার হাজার হুরী পাবে, অ-মুসলমান কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না, তারা পশুর সমান, তাদের গ্রেপ্তার কর, হত্যা কর, গর্দানে আঘাত কর। না কি তিনি সেই সব জ্ঞানের কথা বলছেন যেখানে আল্লা বলছেন, গনিমতের মাল নিশ্চিন্তে ভোগ কর, অংশীবাদী নারী গনিমতের মাল মাত্র, নবীর নিকট সব নারী বৈধ, নবী যাকে ইচ্ছা কাছে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন ইত্যাদি। একটু পরিষ্কার করে বললে অ-বিশ্বাসীদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়।

রফিক উল্লাহ্ সাহেবের মত উপরিউক্ত অন্ধ বিশ্বাসই মৌলবাদের জন্ম দেয় যা মানব সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। কথিত আছে যে খলিফা ওমরের আমলে যখন মুসলমানরা মিশর জয় করে তখন মুসলমান সৈন্যরা আলেক্জান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়। গ্রন্থাগারিককে তারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার গ্রন্থাগারের গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে তা কি কোরানে

আছে?" জবাব "হ্যাঁ" কি "না" হোক তাতে কিছু যায় আসে না, পরিণাম একই, গ্রন্থাগার ধ্বংস। জবাব যদি না হয় তা হলে সেই জ্ঞান অপ্রয়োজনীয় এবং জবাব হ্যাঁ হলে সেই জ্ঞান বাহুল্য। এই সময় অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থও আল্ মাজেস্টও ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, মুসলমানরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করে তখন সেই গ্রন্থ তারা সারা দুনিয়াময় হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করে এবং ভাগ্যগুণে শেষ পর্যন্ত ইটালীতে ঐ গ্রন্থের একখানি নকল খুঁজে পায় (বিশদ বিবরণের জন্য শ্রী সমরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "বিজ্ঞানের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য)। ঠিক একই ভাবে মুসলমানরা ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্বনামধন্য বিদ্যা চর্চাকেন্দ্রসমূহের গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করে। কথিত আছে যে নালন্দার বৃহৎ গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থ দীর্ঘ এক মাস সময় ধরে জ্বলতে থাকে। এই সব ইতিহাস রফিক উল্লাহ্ সাহেবের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ যে কোরানের গভীর জ্ঞান তাঁকে মুগ্ধ করেছে সেই কোরানের জ্ঞানকে মান্যতা দেবার জন্যই ঐ সমস্ত পৈশাচিক ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল।

আজ রফিক উল্লাহ্ সাহেব নবী মহম্মদের মধ্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের গুণাবলী দেখতে পাবেন। কোরানকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার বলবেন তাতে আর আশ্চর্য কি, কারণ তিনি তাঁর নিজের প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর আত্মপরিচয়ের মূলকে ছেদন করা হয়েছে এবং সেই কারণে তিনি একটি মূলহীন বৃক্ষে পরিণত হয়েছেন। আত্মপরিচয়হীন এক শূন্যে ভাসমান মানবে পরিণত হয়েছেন। কোন এক দুর্যোগের রাতে তাঁর পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে পিতৃ পুরুষের পরিচয়কে অস্বীকার করেছিল এবং রফিক উল্লাহ্ সাহেব সেই ধারাকে আজও বহন করে চলেছেন। তাই এই পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও তাকিয়ে আছেন শুষ্ক রুক্ষ্ম আরবের মরুভূমির দিকে। তাঁর প্রকৃত পূর্বপুরুষরা আজ তাঁর পর হয়ে গেছে। তাঁরা যেসব গ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন তার মধ্যে কোন জ্ঞানের কথা তিনি খুঁজে পান না। তাঁরা যে সব মহাকাব্য লিখে রেখে গেছেন, যে সব মহাকাব্যের আদর্শ হাজার হাজার বছর ধরে তাঁর পিতৃপুরুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই সব মহাকাব্য তাঁর কাছে আজ অপাংক্তেয়। তাঁরা যে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন তা আজ তাঁর কাছে বর্জনীয়।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, রফিক উল্লাহ্ ও আল আমান সাহেব সহ আজকের কোটি কোটি ভারতীয় মুসলমানের প্রকৃত ও মূল পরিচয় ঐ সব গ্রন্থেই লেখা আছে, আরবের কোন গ্রন্থে নয়। তাঁরা আজ তা অস্বীকার করতে

পারেন কিন্তু মতিভ্রম হবার ফলে ছেলে যদি মাকে অস্বীকার করে তবে মা পর হয়ে যায় না, মা মা'ই থাকে। পরিচয় হারিয়ে যায় না। যে বাংলা ভাষায় তাঁরা কথা বলেন, সংস্কৃতই তার জননী, আরবের কোন ভাষা নয়। তাঁরা যে সঙ্গীত চর্চা করেন, সামবেদই তার উৎস, আরবের কোন গ্রন্থ নয়। শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরাই তাঁদের পূর্বপুরুষ, মুসা, ইব্রাহীম বা লুতের মত অশিক্ষিত পশুপালকরা নয়। ব্যাসদেব, বাল্মিকী ও কালিদাসরাই তাঁদের কবি; কণাদ, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্তরাই তাঁদের বিজ্ঞানী; কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ ও মহাবীরের মত মানুষরাই তাঁদের সম্মানীয় ব্যক্তি, আরবের নৃশংস বেদুইনরা নয়। তাঁরা আজ অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু যুগ যুগ ধরে বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ মহাভারতের রক্তই তাঁদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাই শুধু মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লে আর গোমাংস খেলেই সেই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় না। সেই ঐতিহ্যের মূল অনেক গভীরে, তাই তাকে উৎপাটন করা অসম্ভব।

হয়তো এমন হতে পারে যে সব জানলে বা বুঝলেও রফিক উল্লাহ্ সাহেবের পক্ষে সত্য কথা বলার উপায় নেই। হয়তো সত্য কথা বললে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি হবে, যেমন শ্রীমতি তসলিমা নাসরিন এবং সলমন রুশদির ক্ষেত্রে হয়েছিল। যেমন দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব মসীরুল হাসান সাহেবের বিরুদ্ধে দাবী উঠেছিল "কৌম কা গদ্দার, মৌৎকা হকদার"। তাই হয়তো ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, রফিক উল্লাহ্ সাহেবকে লিখতে হয় কোরান এক বিশাল জ্ঞানের খনি। কিন্তু অল্প কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের দ্বারা তরবারির ভয় দেখিয়ে অধিক সংখ্যক লোকের মান্যতা আদায় করা বেশীদিন চলতে পারে না। আজ দু একজন এগিয়ে আসছেন বলে ভয় দেখিয়ে তাঁদের স্তব্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু যেদিন অনেক অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক এগিয়ে আসবেন তখন আর তাঁদের স্তব্ধ করা সম্ভব হবে না।

হাদিস শরীফ

সাহেবরা আরবী হাদিস শব্দের অর্থ করে Tradition বা পরম্পরা। কিন্তু মুসলমানদের কাছে হাদিসের অর্থ হল উপদেশ এবং বিশেষ অর্থে নবী মহম্মদের উপদেশ। তাঁরা বলেন কোরান বা হাদিস, দুইয়ের মূলেই ওহী বা প্রত্যাদেশ কিন্তু তফাৎ হল এই যে, কোরানের প্রত্যাদেশ হল ওহীয়ে মতলু বা পঠিত প্রত্যাদেশ এবং হাদিসের প্রত্যাদেশ হল ওহীয়ে গায়ের মতলু বা অপঠিত প্রত্যাদেশ। কাজেই কোরান এবং হাদিস, দুইই স্বয়ং আল্লার বাণী যা জিব্রাইল মারফৎ নবী পেয়েছিলেন। তবে কোরানের বাণী জিব্রাইল নবীকে স্বর্গীয় কোরান থেকে পাঠ করে শোনাতেন এবং হাদিসের বাণী সম্ভবত মুখে মুখে বলতেন। কাজেই পাঠ করে পাওয়াই হোক আর মুখে মুখে পাওয়াই হোক, প্রত্যাদেশ প্রত্যাদেশ এবং সমান মান্য। তাই মুসলমানরা কোরান ও হাদিসে কোন তফাৎ করেন না। কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে, কোরানের কোন আয়াতের সঙ্গে সেই সম্পর্কিত কোন হাদিসের কোনই তফাৎ নেই, হুবহু একই। আবার কখনও এমন দেখা যায় যে, কালামপাকের কোন আয়াৎ এবং সেই সম্পর্কিত কোন হাদিশ প্রায় একই, যেটুকু তফাৎ আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আমরাও অনেক সময় বলি যে, আগেকার দিনের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জ্ঞান চক্ষু দিয়ে যা দেখেছেন তাই বেদ, উপনিষদ ইত্যাদিতে লিখে রেখে গেছেন। কাজেই তাঁদের সত্য দর্শন এবং আরবের নবী মহম্মদের কাছে আল্লার ওহী আসার মধ্যে কি তফাৎ সেটা কিছুটা আলোচনার দাবী রাখে। ভারতীয় যোগ শাস্ত্রমতে জল স্থির না হলে তাতে যেমন কোন স্থির প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি মানুষের মন যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত বা মূঢ় অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাতে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে না। যখন যোগীর মন থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয়ে নির্লিপ্ত হয়, মনস্থির হয়, তখনই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হয়।

সার্বভৌম সমাধির্হি ধর্ম্মশ্চিত্তস্য কীর্ত্তিতঃ।

তত্র লোভান্মোহাচ্চাপি আদ্যভূম্যোঃ প্রজায়তে।। (পাতঞ্জল-১/১৩)

কিন্তু যখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে মন স্থির হয় তখন মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দর্শনের মতই ঈশ্বর দর্শন হয়—

নিরোধ সর্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টুশ্চিন্মাত্ররূপিণঃ।

তথৈবার্কপ্রভাবাচ্যা মেঘান্মুক্তো যথার্য্যমা।। (ঐ-১/১৭)

কাজেই ভারতীয় ওহী ও আরব্য ওহীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির দ্বারা মন সম্পূর্ণভাবে বিক্ষিপ্ত থাকলেও আরব্য ওহী আসা বন্ধ হয় না, বা ওহী আসার পথে তা কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভারতীয় মতে ঐ রকম বিক্ষিপ্ত বা মূঢ় চিত্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ওহী লাভ করাই সম্ভব নয়। এই কারণে ভারতের ঋষিরা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর ওহীই লাভ করতেন, কাফের নিধন করার, গনিমতের মাল ভাগ বাটোয়ারা করার বা মাতৃজাতির প্রতি অত্যাচার করার ওহী তাঁরা পেতেন না।

যাইহোক, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে অবশ্যই হাদিসের শরণাপন্ন হতে হবে। শুধু কোরান পাঠ করে তিনি ইসলামের খুব সামান্যই বুঝতে পারবেন। কোরানের আয়াতকে যদি ব্যাকরণের সূত্র বলা যায় তবে হাদিস হল তার ভাষ্য, অথবা কোরানের আয়াতকে যদি text বলা যায় তবে হাদিসকে বলা যায় context। আগেই বলা হয়েছে যে, কোরানের আয়াতগুলি খুবই অবিন্যস্ত। কাজেই হঠাৎ কোথায় কোন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে একখানা আয়াত অবতীর্ণ হল তা জানতে হলে হাদিস খুঁজতে হবে। যেমন আল্লা হঠাৎ বললেন, "হে বিশ্বাসীগণ, যে সমস্ত উত্তম বস্তু আল্লা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তা তোমরা অবৈধ করো না, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (৫/৮৭)। কাজেই শুধু এই খাপছাড়া আয়াতটি পড়ে বোঝার সাধ্য নেই যে এখানে উত্তম বস্তুই বা কি এবং সেই বৈধ উত্তম বস্তুকে অবৈধ করা এবং সীমা লঙ্ঘন না করতে বলার মধ্যদিয়ে আল্লা প্রকৃতপক্ষে কি বলতে চাইছেন। কিন্তু মুসলীম শরীফের ৩২৪৩ নম্বর হাদিসটি পড়লে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যুদ্ধাভিযানকালে স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অভাবজনিত কারণে জিহাদকারী আল্লার প্রিয়তম বান্দারা কষ্ট পায়। তাই পরম দয়াময় দয়ালু আল্লা এই আয়াতের দ্বারা স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ করছেন। কিন্তু যে কোন বিবাহের ক্ষেত্রেই দেনমোহর প্রদান করাকে আল্লা অবশ্য কর্তব্য করেছেন, কাজেই এ ক্ষেত্রেও দেনমোহর না দিয়ে আল্লা তাঁর সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করছেন। সুতরাং হাদিস থেকে বোঝা গেল যে উক্ত আয়াতে আল্লা বৈধ কর্ম বলতে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাকে, উত্তম বস্তু বলতে সেখানকার স্থানীয় রমণীদের এবং সীমা লঙ্ঘন করা বলতে দেনমোহর না দেওয়াকে বোঝাতে চাইছেন।

তেমনি হঠাৎ আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন," যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের [illegible] যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন তাদের প্রভাত কত মন্দ

হবে"(৩৭/১১৭)। বিক্ষিপ্ত এই আয়াতটি থেকে বোঝার উপায় নেই যে, কাদের সতর্ক করা হয়েছিল আর কেমন করেই বা তাদের প্রভাত মন্দ হয়েছিল। কিন্তু মুসলীম শরীফের ৪৪৩৮ নম্বর হাদিসটি পড়লে বোঝা যাবে যে আল্লা এখানে খয়বর অভিযানের কথা বলছেন। আগেই বলা হয়েছে যে নজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের শুধু ভয় দেখিয়ে নবী মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন এবং তারা মদিনার উত্তরে খয়বরে আশ্রয় নেয় এবং নবী তাদের উৎপন্ন শস্যের ৫০ শতাংশ কর ধার্য করেন। ৬২৯ খৃস্টাব্দে মহম্মদ ২০০ অশ্বারোহী ও ১৬০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে খয়বর আক্রমণ করলেন। অন্যসব লুণ্ঠন আক্রমণের মত এটাও নবী খুব ভোরে, ফজরের নামাজের ঠিক পরেই শুরু করেন। খয়বরের ইহুদীরা তখন যন্ত্রপাতি নিয়ে কেউ মাঠে, কেউবা পশু চরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় মহম্মদ অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করেন। কাজেই উক্ত আয়াতের মতে মুসলমানদের দ্বারা আক্রমণ করিয়ে আল্লা খয়বরের ইহুদীদের প্রভাত মন্দ করেছিলেন।

ঠিক একইভাবে সুরা তহরীমা (৬৬ নং সুরা)'র প্রথম আয়াতে আল্লা বললেন, "হে নবী, আল্লা তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন? আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়"(৬৬/১)। এখানেও সেই একই প্রশ্ন। স্ত্রীদের খুশী করতে নবী কোন বৈধ কর্ম করতে সঙ্কোচ করছিলেন যার জন্য আল্লার তিরস্কারের প্রয়োজন হল? মুসলীম শরীফের পর পর পাঁচটি হাদিস, ৩৫০৭ থেকে ৩৫১১ থেকে উক্ত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে।

ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই নবী এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর দেহ মুবারক যাতে তাঁর সব পত্নীই সমানভাবে পায় তাই তিনি পালা করে সব পত্নীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। শুধু বয়স হয়ে যাবার দরুন বিবি সৌদা তাঁর পালা বিবি আয়েশাকে দান করেছিলেন। ঘটনার দিন বিবি হাফসার (ওমরের বিধবা কন্যা) পালা ছিল। কোন কাজে বিবি হাফসা বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে দেখেন নবী তাঁর বিছানায় ক্রীতদাসী মারিয়াকে নিয়ে শুয়ে আছেন। দুজনকে ঐ অবস্থায় দেখে হাফসা চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। ঘাবড়ে গিয়ে নবী তাঁকে চুপ করতে বললেন এবং একথা কাউকে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। উপরন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর কোন দিন তিনি মারিয়াকে স্পর্শ করবেন না। কিন্তু নবীর এই ব্যবহারে আল্লার ক্রোধের সঞ্চার হল। কারণ অনেক আগেই আল্লা দাসীদের সঙ্গে শোয়া বসা বৈধ করে দিয়েছেন। কাজেই সেখানে নবীর কি ক্ষমতা আছে , আল্লার

আদেশের উপর কলম চালাবার? তাই আল্লা নবীকে তিরস্কার করে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। শুধু তাই নয়, নবীর বারণ না শুনে বিবি হাফসা বিবি আয়েশাকে সব বলে দিয়েছিলেন। এতেও আল্লার ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং হাফসাকে তিরস্কার করে আল্লা বললেন, "যখন নবী তার স্ত্রীদের এক জনকে গোপনে কিছু বলেছিল, পরে তার স্ত্রী উহা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লা নবীকে সে বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি"(৬৬/৩)।

উক্ত ঘটনার পরে ঝগড়া, চেঁচামেচি সারারাত ধরে চলল। নবী বিবিদের তালাক দেবার ভয় দেখালেন এবং আল্লাও তাতে সায় দিয়ে বললেন, তোমরা তো কোন্ ছার,"আল্লা তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী দেবেন, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, তওবাকারী, এবাদৎকারী, রোজা পালনকারী এবং বিধবা ও কুমারী" (৬৬/৫)। যাই হোক, ভোর বেলায় ওমর ও আবু বকরের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হল। নবী তাঁর বিবিদের সঙ্গে এক মাসের অস্থায়ী তালাক বা ইলা করলেন এবং এই এক মাস সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজেকে আল্লার বৈধ কাজে নিযুক্ত করলেন। এ ঘটনাটি একটু বিশদভাবে বলা হল এই কারণে যে, আগেই বলা হয়েছে যে কোরান তিলাওয়াৎ করার সময় প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিশ্বাসীদের সিজদা করতে হয়। কাজেই ৬৬ নম্বর সুরার শুরুতে সিজদা করে তারা যে আয়াতটি পড়েন তা সিজদা করে উঠে পড়ার মত আয়তই বটে। এই সব ঘটনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লার বাণী পড়লে কোরান যে স্বয়ং আল্লার বাণী সে বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে বাধ্য।

যাই হোক, নবী মহম্মদ অচিরেই আরববাসীদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন, কারণ তিনি বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত বিবদমান আরব গোষ্ঠীগুলিকে ইসলামের ছত্রছায়ায় এনে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করলেন। গনিমতের মাল ও জিহাদের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ এই আরব জাতি নবীর মৃত্যুর দু দশকের মধ্যেই এক বিশাল বৈদেশিক সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দারিদ্র্য পীড়িত আরবজাতি একটি সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হল। ফলে মহম্মদ হয়ে উঠলেন এক প্রবাদ পুরুষ। তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে নানা গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল যার কিছু সত্য, কিছু অসত্য, কিছু কাল্পনিক, কিছু আবার অতিরঞ্জিত। আরবের কবিরাও নবীর জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে, নানা রকমের কবিতা লিখে লোকজনের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে দিল। পরবর্তীকালে মুহাদ্দেস বা হাদিস রচয়িতারা এই সব লোক কথা থেকেই তাঁদের মাল মসলা

জোগাড় করেন। সংগৃহীত এই সব বিপুল সংখ্যক হাদিশ থেকে সন্দেহজনক হাদিসগুলোকে বাদ দিয়ে হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়।

কোরানে আল্লা যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির বিধান দিয়েছেন এবং অপরাধ ও তার শাস্তি বিষয়ক যে সমস্ত আইন কানুন অবতীর্ণ করেছেন, নবীর জীবিতকাল পর্যন্ত আরব সমাজের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা ওমরের আমলেই মুসলমানরা সীরিযা ও মিশর জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসল। জনবহুল এবং সভ্যতার দিক দিয়ে অগ্রসর এই সব বিজিত দেশের সঙ্গে আরব্য জীবন যাত্রার অনেক প্রভেদ ছিল। কাজেই সেই সব জায়গায় এমন অনেক নতুন ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হতে থাকল যার সমাধান করা কোরানের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কাজেই খোঁজ খবর শুরু হল যে এই রকম পরিস্থিতি নবীর জীবিতাবস্থায় উৎপন্ন হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে সেই অবস্থায় নবী কি ভাবে তার সমাধান করেছিলেন। কাজেই নবীকে যাঁরা দেখেছেন, নবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাঁরা কিছু বলে গিয়েছেন কি না বা কিছু লিখে রেখে গিয়েছেন কি না, তার খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেল। লোকমুখে যে সব গল্প কাহিনী প্রচলিত ছিল তাও সংগ্রহ করা হল। এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মুসলমানরা যে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা এই কাজে তাঁদের সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন। শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে, সমস্ত মুসলীম জগত ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু সংগৃহীত এই সব তথ্য নিয়ে কিছু অসুবিধা দেখা দিল। এর মধ্যে এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেল যা কাল্পনিক অথবা অতিরঞ্জিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাদের স্বার্থের খাতিরে অনেক জাল হাদিস তৈরী করে বসে আছে। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে সঠিক হাদিস খুঁজে বার করা এবং বাদবাকীগুলি বর্জন করা। মুসলীম জগত ইতিমধ্যে সিয়া ও সুন্নী এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবার ফলে জাল হাদিসের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করল। এমন অনেক জাল হাদিশ তৈরী হল যাতে বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করার চেষ্টা প্রকাশ পেল। কিছু কিছু জাল হাদিসে রমজান মাসে রোজা রাখাকেও হারাম বলে বর্ণনা করা হল। এই সমস্ত কারণে খলিফা দ্বিতীয় ওমর হিজরীর ৯৯ সনে সঠিক হাদিস সংকলনের কাজে ব্রতী হলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় ১৪৬৫ খানা হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হল। এই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে ৬ খানা গ্রন্থকে মুসলীম জগত সহীহ্ বা সঠিক বলে মান্য করে।

এই ৬ খানার মধ্যে আবার দুই খানা সর্বোৎকৃষ্ট। সব থেকে উপরে বুখারি শরীফের স্থান এবং তার পরেই মুসলীম শরীফের স্থান। এই দুই খানি হাদিস গ্রন্থকে এক সাথে সহীহায়েন বা বিশুদ্ধ দুই বলা হয়ে থাকে।

হাদিস সম্রাট ইমাম বুখারী হিজরী ১৯৪ সনে খোরাসানের অন্তর্গত বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল মহম্মদ কিন্তু বুখারা শহরে জন্ম বলে বুখারী নামেই সমধিক পরিচিত হন। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মহম্মদের প্রায় ২০০ বছর পরে জন্মগ্রহণ করে তিনি এই হাদিস গ্রন্থ সংকলন করলেন কেমন করে। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রথমে ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। হাদিস প্রবক্তাদের রাবী বলে। ইমাম বুখারী হয়তো কোন রাবীর কাছ থেকে একটা হাদিস পেলেন। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে ঐ হাদিসটি সে কার কাছ থেকে শুনেছে। তার পর সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কার কাছ থেকে শুনেছে। এই ভাবে পিছনে যেতে যেতে দেখা গেল যে ঐ রাবীর ১০ কিংবা ১১ পুরুষ আগে কেউ ঐ হাদিসটি প্রথম শুনেছিল। সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম ঐ হাদিসটি শুনেছিল সে যদি একজন সাহাবী হয় এবং তা যদি কোন তাবেয়ীর দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে তবেই হাদিসটি গ্রহণীয়, অন্যথায় বর্জনীয়। নবীর যে সব অনুচর নবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের সাহাবী বলে এবং যাঁরা কোন সাহাবীকে নিজের চক্ষে দেখেছেন তাঁদের তাবেয়ী বলে। এর পর দেখতে হবে যে, যাদের মুখে মুখে হাদিসটি পুরুষাণুক্রমে চলে আসছে সেই সব লোকেরা বিশ্বাসযোগ্য কিনা। আসমাউর রেজাল নামক গ্রন্থে এ রকম পাঁচ লক্ষ রাবীর ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে। এই গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে এবার হাদিসটির প্রবক্তাদের পুরো শৃঙ্খলটিকে যাচাই করতে হবে। এভাবে যাচাই করার পর হাদিসটির শুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে তবেই তা গ্রহণীয়, অন্যথায় বর্জনীয়। ইমাম বুখারী তাঁর সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে ১৮০০ জন রাবী দ্বারা বর্ণিত ৭০০০ হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন এবং তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

কাজেই এ কাজের জন্য যে কি পরিমাণ ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। ইমাম বুখারী একবার খবর পেলেন যে অমুক জায়গার অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে এক খানা হাদিস পাওয়া যেতে পারে। শত শত মাইল হেঁটে সেখানে হাজির হয়ে দেখলেন যে, সেই ব্যক্তি খালি একটা ঝুড়ি দেখিয়ে তার ঘোড়াকে ডাকছে, ঝুড়িতে খোল বা ভূষি কিছুই নেই। এতে বুখারীর ধারণা হল যে, যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে এ ভাবে ঠকাতে পারে তার কাছ থেকে বিশুদ্ধ হাদিস পাবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তিনি

হাদিস না নিয়েই তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ফিরে এলেন। ইমাম বুখারীর শিষ্য ইমাম মুসলীম হিজরীর ২০৪ সনে খোরাসানের অন্তর্গত শিবপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে বাছাই করে মাত্র ৭১৯০টি হাদিস শুদ্ধ বিবেচনা করেন।

মহম্মদ তাঁর জীবিতকালে হাদিস লিখে রাখার বিরোধী ছিলেন কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এতে করে কোরানের মধ্যে হাদিস অথবা হাদিসের মধ্যে কোরান ঢুকে যেতে পারে। তা সত্বেও তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে হাদিশ লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন আবু হোরায়রা এবং তার পরেই আবদুল্লা বিন অমর এর স্থান। শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তা রোজকারটা রোজ লিখে রাখতেন, আবু হোরায়রাও সেই রকম নবীর কথোপকথন লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কাজেই আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস আর সমস্ত হাদিসের মধ্যে বিশুদ্ধতম। এছাড়া নবীর পত্নীরাও বেশ কিছু হাদিস বলে গেছেন এবং সে গুলোকেও বিশুদ্ধ বলা চলে। নবীর পত্নীদের মধ্যে বিবিই আয়েশার প্রসিদ্ধি এই দিক দিয়ে সর্বাধিক। তিনি একাই মোট ১২১০ টি হাদিসের প্রবক্তা। তার পরই বিবি উন্মে সালামার স্থান এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৩৭৮।

এ প্রসঙ্গে হাদিস প্রবক্তাদের সম্বন্ধে দু একটি কথা না বললে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই সব রাবীদের সত্যনিষ্ঠা ও অকপট সত্য ভাষণ প্রশংসার দাবী রাখে। অনেক সময় নবীর কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত হাদিস পড়লে মনে হবে যে, এই হাদিসটি তিনি বর্ণনা না করলেই হয়তো ভাল করতেন, অথবা মনে হবে যেন শত্রুপক্ষের কোন লোক নবীর নামে কুৎসা রটানোর জন্যই হাদিসটি বর্ণনা করেছে। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের দেশের মুসলমান লেখকরা, যাঁরা নবীর জীবন আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে এই সত্য নিষ্ঠার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। তাঁরা অনেক রেখে ঢেকে নবীর জীবন বর্ণনা করেন এবং অনেক সময় বিকৃত তথ্য পেশ করেন অথবা বিতর্কিত বিষয় সযত্নে এড়িয়ে চলেন। যেমন আল আমান সাহেব তাঁর "কাবার পথে" গ্রন্থে নবীর জীবনের সব দিকই বিশদ আলোচনা করেছেন, কিন্তু নবীর বিবাহের ব্যাপারগুলো সযত্নে পরিহার করেছেন। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে।

ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা

গত ১৯৯৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যার সারমর্ম হল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধানতলা থানার কালোপুর গ্রামের বাসিন্দা আয়ুব আলি ও তার স্ত্রী জাহানারা বিবির মধ্যে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) না হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মৌলবীরা তাদের দ্বিতীয় বার নিকায় বসতে বাধ্য করে। ঘটনার সূত্রপাত হয় বছরখানেক আগে। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যা বেলা তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে এবং আয়ুব আলি তখন জাহানারাকে হুমকী দেয় যে, এই রকম ঝগড়া করলে সে তাকে তালাক দেবে। সেই গ্রামেরই এক কিশোর তাদের ঝগড়ার অংশবিশেষ শুনে রটিয়ে দেয় যে আয়ুব আলি জাহানারাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে! গ্রামের মৌলবী সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া জারী করে যে, আয়ুব ও জাহানারার তালাক হয়ে গেছে, তাই তারা আর এক সঙ্গে থাকতে পারবে না। জাহানারাকে হয় বাপের বাড়ী চলে যেতে হবে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে হবে। যদি সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় তবেই সে আবার আয়ুব আলির ঘরে ফিরে আসতে পারবে।

এর প্রায় দশ বছর আগে আয়ুব জাহানারার বিয়ে হয় এবং তারা মৌলবীর ফতোয়া মানতে অস্বীকার করে। এই কারণে উক্ত মৌলবী আর একটি ফতোয়া জারি করে যার ফলে গ্রামশুদ্ধ লোক তাদের একঘরে করে। আয়ুবকে মাঠে কাজ করতে দেওয়া হয় না, মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না এবং আয়ুবের মামা বরগুন মণ্ডলের মুদির দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন কি গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা আয়ুব জাহানারার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা বন্ধ করে দেয়। এই ভাবে অনাহারে অর্ধাহারে এক বছর কাটাবার পর গ্রামের মৌলবী ফতোয়া দেয় যে, আয়ুব ও জাহানারাকে মসজিদে গিয়ে আল্লার দোয়া চাইতে হবে এবং সম্পূর্ণ নতুন করে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়ুব ও জাহানারাকে এ প্রস্তাব মেনে নিতে হয় এবং পুনরায় বিয়ে করতে হয়।

যে শরীয়তি বিধানকে ভিত্তি করে মৌলবীরা আয়ুব জাহানারার উপর প্রথমোক্ত ফতোয়া জারি করে তার ভিত্তি হল কোরান শরীফের দ্বিতীয় সুরা (সুরা বকরা)-এর ২২৯ এবং ২৩০ আয়াত। ঐ আয়াত দুটিতে বলা হচ্ছে ''তালাক দুবার; পরে তাকে নিয়ম অনুযায়ী রাখতে পার অথবা সৎভাবে

বিদায় দিতে পার .....''(২/২২৯)। ''অতঃপর সে যদি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) আর তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সে বিবাহিত হবে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে যদি তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে (স্ত্রী ও প্রাক্তন প্রথম স্বামী) মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কোন অপরাধ হবে না......''(২/২৩০)। উপরিউক্ত প্রথম আয়াতটিতে তালাক বলতে তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো বোঝাচ্ছে। অনেকের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে তাই উপরিউক্ত আয়াত দুটির ইংরাজী অনুবাদ তুলে দেওয়া হল, "Ye May divorce your wives twice; and then either retain them with humanity or dismiss them with kindness ......" (2:229). "But if the husband divorce her a third time, she shall not be lawful for him, until she marry another husband. But if he also divorce her, it shall be no crime in them if they return to each other again, if they think they can observe the ordinance of God" (2:230). (tr. George sale).

উপরিউক্ত আয়াত দুটি অবতীর্ণ হবার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন ''তফসীর হোসেনী'' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হল, ''পৌত্তলিকতার যুগে স্ত্রী বর্জনের নির্ধারিত কোন সংখ্যা ছিল না। এক স্ত্রীকে দশবার বর্জন করিয়াও পুরুষ তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিত। একদা একটি স্ত্রীলোক হজরতের সহধর্মিনী মহামান্য আয়েষার নিকট আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ বর্ণনা করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বর্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে দুইবার মাত্র বর্জনবিধির প্রবচনের অভ্যুদয় হয়।'' উপরন্তু উক্ত আয়াত দুটি সম্বন্ধে শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন শাহ্আবুল কাদেরের যে টীকা দিয়েছেন তা হল, '' নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জনে এই বিধি, দ্বিতীয় বর্জনের পর পুনঃগ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার স্বত্ব প্রদান করিতে সক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে। সেইরূপ গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কর্তব্য''[৫৯]।

ইসলাম ধর্মমতে শুধু পুরুষেরই তালাক দেবার অধিকার আছে। তিনবার

(৫৯) কোরআন শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ৩৩

"তালাক" শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে, স্থান, কাল নির্বিশেষে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকর হয় (৬০)। কোরান শরীফের ৪ নং সুরার, সুরা নিসা বা স্ত্রীলোক এর ১২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, "কোন স্ত্রী লোক যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নাই, এবং মীমাংসাই কল্যাণকর।" বিক্ষিপ্তভাবে এই আয়াতটি পড়লে মনে হবে যেন, আল্লা স্ত্রীলোককেও তালাকের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল এই যে, নবী একবার তাঁর সর্বাপেক্ষা বয়স্কা পত্নী সৌদাকে তালাক দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষে উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উপরন্তু ঐ আয়াতে আপোষ নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে তালাক নয়, স্বামী প্রসন্নতা অর্জনের জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করার কথাই বলা হয়েছে। উক্ত সময়ে নবীর ছয় জন পত্নী ছিল এবং নবী পালা করে সকলের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন এবং উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবি সৌদা তাঁর পালা বিবি আয়েশাকে দান করে আপোষ মীমাংসা করেন।

উপরিউক্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন পুরুষ যদি রাগের মাথায় স্ত্রীকে বর্জনও করে তবে প্রথম দুবার তা ক্ষমার যোগ্য। এর পর ইচ্ছা করলে তারা পুনরায় স্বামী স্ত্রী হিসাবে সহবাস করতে পারে। তবে তৃতীয়বার বর্জনের পর আর তাকে গ্রহণ করা যাবে না এবং সে ক্ষেত্রে কোরান শরীফের (২/২৩০) আয়াতকে অনুসরণ করতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোরানের নির্দেশ এবং আয়ুব-জাহানারা দম্পতির প্রতি মৌলবীদের ফতোয়ার মধ্যে ফারাক রয়েছে। অবশ্য খবরে এটা বলা হয় নি যে, আয়ুব জাহানারাকে এর আগে আরও দুবার তালাক দিয়েছিল। সম্ভবত তা করেনি কারণ সে ক্ষেত্রে আয়ুবের পক্ষে জাহানারাকে আর বিয়ে করা সম্ভব ছিল না।

বর্তমান প্রসঙ্গে উক্ত ঘটনার কিছু দিন আগের আর একটি ঘটনার কথা বলা চলতে পারে। এই সংবাদ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন এক গ্রামের এক দরিদ্র গৃহ বধূ সেই গ্রামেরই এক মৌলবীর কু-প্রস্তাবে রাজী না হবার জন্য ঐ মৌলবী তাকে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী ঐ গৃহবধূকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ইসলামী মতে ব্যভিচার খুবই জঘন্য অপরাধ এবং এ ব্যাপারে কোরান বলছে, " তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না

---

(৬০) M. Hidayatullah, Principles of Mehamedan Law, (Tripatny, 1980), P-324

তাদের মৃত্যু হয়। অথবা আল্লা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেন"(৪/১৫)। এই আয়াতে চার জন সাক্ষী বলতে চার জন পুরুষ সাক্ষী বোঝায় এবং একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান দু জন স্ত্রী সাক্ষী। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, বিত্তবানের পক্ষে টাকার বদলে এবং একজন মৌলবীর পক্ষে ভয় দেখিয়ে চারজন সাক্ষী যোগাড় করা কোন কঠিন কাজ নয়। যাই হোক, পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে, "এবং তোমাদের মধ্যে যদি দুজন অস্বাভাবিকতা করে তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে—আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (৪/১৬)। (এখানে "তোমাদের মধ্যে দুজন" বলতে দু জন সমকামী পুরুষ না একজন নারী ও একজন পুরুষ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত ভেদ আছে) প্রকাশ্যে সাক্ষী রেখে কেউ কোনদিন ব্যভিচার করে না, উপরন্তু সাক্ষী থাকলেও কখনও এক জন অভিযুক্ত হতে পারে না। এই সাক্ষীর ব্যাপারটা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, যে সব দেশে শরীয়তি আইন চালু আছে সেই সব দেশে কোন নারী কোন পুরুষ কতৃক ধর্ষিতা হলেও অভিযোগ প্রমাণ করতে তাকে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে।

মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দল ইসলামী পার্টী পাশ (আই পি পি) গত ১৯৯০ সালে কেলান্তান প্রদেশের ক্ষমতা দখল করে এবং সেখানে তারা ইসলামী আইন কানুন চালু করতে শুরু করে। প্রথমেই তারা যে আইনটি চালু করতে চেষ্টা করে তা হল এই যে, কোন নারী কারও বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনলে সঙ্গে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে নতুবা তাকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

প্রাক ইসলামী জাহেলিয়াতের যুগে আরবে কোন নারী ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাকে গৃহ বন্দী করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা হত। কালক্রমে এই প্রথা এমন পর্যায়ে গেল যে সতী সাধ্বী রমণীকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কৌশলে পরিণত হল। কোরান শরীফের উপরিউক্ত (৪/১৫) আয়াতটিতে চার জন সাক্ষীর সমর্থনের কথা এই কারণেই বলা হয়েছে। যাই হোক কালক্রমে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠে যায় এবং একজন কুমারী ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে ১০০ ঘা বেত ও এক বছরের নির্বাসনের দণ্ড দেওয়া হত এবং এক জন সধবা রমণীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হত। বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ সবাইকেই পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছোঁড়া বা রজম করা হত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পরেও এই প্রথা চলতে থাকে।

নবীর মদিনাবাসকালে এক দিন মাগর আসলামী নামে একটি লোক নবীর কাছে এসে বলল যে সে ব্যভিচার করেছে। নবী তার কথা শুনলেন এবং তার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার তাকে একই কথা বলল এবং নবী আগের মতই মুখটা তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তৃতীয়বার একই কথা বলল এবং চতুর্থ বার বলার পর নবী তার শঙ্গীসাথীদের ইসারায় তাকে পাথর ছুড়ে বা রজম করে মেরে ফেলতে বললেন। সহচরেরা তৎক্ষণাৎ তাকে নিকটবর্তী একটা মাঠে নিয়ে গিয়ে রজম করে মেরে ফেলল। এ ব্যাপারে ইসলামী ভাষ্যকারদের মত হল যে, লোকটি চার বার নিজের মুখে দোষ স্বীকার করায় চারজন সাক্ষীর কাজ হল এবং নবী তাকে রজমের শাস্তি দিলেন।

কাজেই চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য না নিয়ে বাংলাদেশের উপরিউক্ত মৌলবী কেমন করে সেই গৃহ বধূকে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করলেন তা অবাক হবার বিষয়। আরও অবাক হবার বিষয় হল, ঐ মৌলবী ব্যভিচারের সাজা হিসাবে পুড়িয়ে মারলেন কেমন করে? কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ইসলামী ধর্মমতে আগুনে পুড়িয়ে মারার এক মাত্র মালিক আল্লা। এ প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আল্লার রসুল তাঁর সহচরদের এই আদেশ দিলেন—দু জন মূর্তি পূজক কোরেশ এর নাম করে বললেন যে, তাদের ধরতে পারলে যেন পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বললেন, "তাদের বরং তরোয়াল দিয়ে মাথাই কেটে ফেলো, আগুনে পুড়িও না, কারণ আগুনে পোড়াবার অধিকারী এক মাত্র আল্লা" (বুখারী-২১১৯)। ঐ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, নবীর কন্যা জয়নব যখন মক্কা থেকে মদিনায় আসছিলেন তখন তারা তাঁকে উৎপীড়িত করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে মুসলীম সমাজে নারীরা, বিশেষ করে অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীরা কতখানি নিরাপত্তাহীন।

যাই হোক, আয়ুব আলি ও জাহানারার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে কোরান শরীফের (২/২৩০) আয়াত অনুসারে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দিলে তার পক্ষে আর তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করছে এবং সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে যে ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় স্বামী তাকে তৃতীয়বার তালাক দিয়ে দিল, কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার তার ইচ্ছা নেই। এই রকম ক্ষেত্রে মুসলীম সমাজে একটা প্রথা চালু আছে তা হল, টাকা পয়সার বিনিময়ে রাস্তা থেকে এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে তার সাথে এক রাত্রির জন্য ঐ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর বিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রি কাটাবার পর সকালবেলা ঐ ব্যক্তি চুক্তি অনুযায়ী

সেই রমণীকে তালাক দিয়ে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। এক রাত্রের জন্য নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে মুস্তাহেল বলে। যাতে করে মুস্তাহেল ঐ রমণীর মনে কোন রকম ছাপ ফেলতে না পারে সেই কারণে যথাসম্ভব কদাকার ও কুশ্রী এক ব্যক্তিকেই মুস্তাহেল নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত প্রথা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir বলেন, "Many lovers or gallants cause less shame to a woman than one Mostahel. ... In order to regain his wife, a man hires (at no considerable rate) some peasants, whom he choses from the ugliest that can be found in the streets. .... A case is mentioned by tradition in which Mohammad himself insisted on co-habitation with another husband, before married life could be returned, to, and in language which one may hope, prurient tradition has fabricated for him. .... It must not be forgotten that, all the immorality of speech and action connected with this shameful institution and the outrage done to the female virtue (not necessarily for any fault of the wretched wife, but the passion and thoughtlessness of the husband himself) has solely out of the verse (2/230) quoted above". (Life of Mehomet, (Voice of India), P- 337) । উপরিউক্ত মন্তব্যে W.Muir যে হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হল, একদিন একজন তালাকপ্রাপ্তা রমণী মহম্মদের কাছে এসে বলল যে, সে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় কারণ তার নতুন স্বামী যেন কাপড়ের একটু আঁচল (অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে দুর্বল)। শুনে মহম্মদ হাসলেন এবং বললেন, "না, তা তুমি পার না, যতক্ষণ না তোমার নতুন স্বামী তোমার মাধুর্য উপভোগ করছে এবং তুমি তার মাধুর্য উপভোগ করছ " (মুসলীম-৩৩৫৪)।

রফিক উল্লাহ্ সাহেব লিখছেন, "প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির মর্যাদানই হল হজরৎ মহম্মদের সংস্কারমূলক কর্মগুলির অন্যতম।" (৬১) কিন্তু যে কেউ ইসলামী শাস্ত্রের সামান্য অংশ অধ্যয়ন করলেই তার মনে হবে স্বয়ং আল্লাই নারী জাতিকে মর্যাদাদানের ঘোরতর বিরোধী। কাজেই আল্লাকে অতিক্রম করে এই কাজে নবী যে খুব কমই কৃতকার্য হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? মুসলীম সমাজে নারীজাতি কতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত তা খুব

(৬১) হাদিস শরীফ, (হরফ), পৃঃ ৫০

ভালভাবে ফুটে ওঠে যখন আল্লা বলেন, 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা একে অপরের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, আর এ শ্রেষ্ঠত্ব এ জন্য যে পুরুষ নারীর জন্য ধন ব্যয় করে। কাজেই সাধ্বী নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে আনুগত্য ও ইজ্জৎ রক্ষাকারিণী। আল্লার হেফাজতে তারা হেফাজৎ করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদের প্রহার কর " (৪/৩৪)।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লা এটাই বলতে চাইছেন যে, পুরুষ নারীর কর্তা তার প্রধান কারণ পুরুষ নারীর ভরণপোষণের জন্য টাকা খরচ করে। ঐ একই কারণে নারীর উচিত সতী সাধ্বী থাকা এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে ইজ্জৎ রক্ষা করা। কাজেই নারী যদি আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয় বা ভরণপোষণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করতে না হয় তবে কোরান মতে তার সতীসাধ্বী থাকার বা ইজ্জৎ রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। টাকা খরচ করে একজন পুরুষ অনেক কিছুর উপরই অধিকার অর্জন করতে পারে, যেমন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দাসী, রক্ষিতা, বারবণিতা, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। কাজেই কোরান অনুসারে মুসলীম সমাজে নারীর স্থান এ সবের থেকে মর্যাদাসম্পন্ন কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। ইসলাম নারীকে কতখানি মর্যাদা দিয়েছে তা আরও ভালভাবে ফুটে ওঠে যখন আল্লা বলেন, "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তোমরা অনাথাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমাদের অভিরুচি অনুসারে দুই, তিন অথবা চার জন নারীর পাণি গ্রহণ করবে "(৪/৩)।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লা সীমা বেঁধে দিচ্ছেন যে, চার জনের বেশী স্বাধীন নারীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু অধিকারভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সেরকম কোন সীমা টানছেন না এবং বলছেন, "দাসী ব্যতীত আর কোন (স্বাধীন) নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা বা অন্য কোন নারীর সঙ্গে পরিবর্তন করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাদের মুগ্ধ করে" (৩৩/৫২)। "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার উপর অধিকার অর্জন করেছে সেইরূপ নারী (অর্থাৎ দাসী) ব্যতীত অন্য কোন সধবা নারী তোমাদের জন্য বৈধ নয়" (৪/২৪)। যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে না তবে এক (স্বাধীন) নারীকে বিবাহ করবে, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার উপর অধিকার অর্জন করেছে তাদের (পত্নীস্থলে) গ্রহণ করবে"(৪/৩)।

কাজেই একজন মুসলমান পয়সা খরচ করে যত খুসী সংখ্যক নরীর উপর প্রভুত্ব অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে নারী যদি সে অধিকারের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটায় তবে তার উপর যথেচ্ছ শারীরিক নির্যাতন চালানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে গত ১৯৯৪ সালের ২০শে জুলাই তারিখে "বর্তমান" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলতে পারে। ঐ খবর বলছে "পাকিস্তানে বউ পেটানোর খবর এতদিন তেমন একটা শোনা যেত না। গত সপ্তাহে নিজের বউএর উপর অকথ্য নির্যাতন চালাবার দায়ে এক বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার ৩০ বছরের জেল হয়। এই ঘটনার পর থেকেই একের পর এক বউ-পিটুনির খবর প্রকাশিত হতে থাকে। দণ্ডপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতা, তথা মসজিদের ইমাম, হাফিজ শরীফ নিয়মিত তার স্ত্রীর উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেন। জানা গেছে হাফিজ শরীফ তার স্ত্রীকে উলঙ্গ করে যৌনাঙ্গে ইলেক্ট্রিক রড দিয়ে মারতেন।" এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রগতিশীল নারী সংগঠনের প্রধান শাহনাজ বোখারি আশা প্রকাশ করে বলেন, "হাফিজ শরীফের ৩০ বছরের জেল হওয়ায় অত্যাচারী স্বামীদের কিছুটা টনক নড়বে। এরা সংযত হবার চেষ্টা করবে। পাকিস্তানে মহিলাদের প্রতি পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করবে এই ঘটনা। .....সাধারনত পাকিস্তানে মহিলাদের খুন করে পুরুষরা পার পেয়ে যায়। এখানে গরু, ছাগল বা মুরগীর মতই মেয়েদের খুন করা হয়।"

উক্ত খবরে শাহনাজ বোখারি আরও বলেন, "পাকিস্তানে নারী নির্যাতনের ঘটনা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠেছে। শুধু যে স্বামীরাই স্ত্রীদের উপর নিপীড়ন চালায় তাই নয়, ভাইরা বোনেদের উপর ও বাবারা মেয়েদের উপরও নানা রকম নির্যাতন চালায়"। তিনি আরও বলেন, "গত এক মাসে তাঁর কাছে নারী নির্যাতনের ১৫ টি ঘটনার খবর এসেছে। এর মধ্যে ১৩ জন মহিলা অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যান। বাকি দু জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন।"

আমরা আগেই দেখেছি যে, কোরান শরীফের উপরিউক্ত (৪/৩৪) আয়াত অনুসারে মুসলীম সমাজে নারী হল পয়সা দিয়ে কেনা অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ। কাজেই নারী যদি, শিক্ষিতা হয় বা বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তবে সমস্ত ইসলামী অনুশাসন খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তাই তাকে পর্দাবৃত করে গৃহবন্দী করে রাখতে হবে যাতে সভ্যতার আলো তার কাছে না পৌছুতে পারে। যাতে প্রয়োজনে যত জনকে খুসী বিয়ে করা যায় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে খুব সহজেই তালাক দিয়ে বিদায় করা যায়। নারীকে তাই পুরুষের লালসার শিকার ও ভোগের সামগ্রী হয়েই থাকতে হবে। কোরান মতে স্ত্রী হল শস্যক্ষেত্র বিশেষ, তাই তাতে যখন খুশী, যেমনভাবে খুশী গমন করা চলতে পারে (২/২২৩)।

নবী মহম্মদ নারী জাতির আরও একটা প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গেছেন। ঘরের স্ত্রী হল চরিতার্থ করা সম্ভব নয় এমন অবৈধ কামনা ঢেলে দেবার নর্দমা-বিশেষ। নিজের পত্নী ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে কামনার উদ্রেক হলে সঙ্গে সঙ্গে তা স্ত্রীরূপ নর্দমা দিয়ে বইয়ে দিতে হবে। নবী একদিন মদিনার মসজিদে বসেছিলেন এমন সময় এক মহিলা তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। মহিলাকে দেখে মহম্মদের মনে কামের উদ্রেক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নী জয়নবের কাছে চলে গেলেন। জয়নব তখন চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই আল্লার রসুল তাঁর কামনা চরিতার্থ করে ফিরে এলেন (মুসলীম-৩২৪০)।

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল খজ্জালী এই জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে আঠারটি বিষয়ে আল্লা নারীকে শাস্তি দিয়ে পুরুষকে মহিমান্বিত করেছেন। এই আঠারোটি কারণ হল (১) রজঃস্রাব, (২) সন্তান প্রসব, (৩) বিয়ের পর নিজের লোকজন ছেড়ে পরের সঙ্গে চলে যাওয়া, (৪) গর্ভধারণ, (৫) নিজের শরীরের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণহীনতা, (৬) কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়া, (৭) অন্যের কাছ থেকে শুধু তালাক পাবার অধিকারিণী এবং তালাক দেবার অক্ষমতা, (৮) পুরুষ এক সঙ্গে চারটি স্ত্রী রাখার অধিকারী কিন্তু তাদের একজনের বেশী স্বামী রাখার অক্ষমতা, (৯) তাদের গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়, (১০) বাড়ীর ভিতরেও তাদের মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, (১১) আল্লা একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দু জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের সমান্ করেছেন, (১২) নিকট আত্মীয় (মাহারাম ব্যক্তির)'র সহচর্য ছাড়া তারা বাড়ীর বাইরে যাবার অধিকারিণী নয়, (১৩) পুরুষরাই শুধু জুমআর জামাতের নামাজ ও ভোজে অংশগ্রহণ করার অধিকারী, (১৪) তারা শাসক বা বিচারক হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত, (১৫) তারা মেধার হাজার ভাগের এক ভাগের অধিকারিণী কিন্তু পুরুষ নয় শত নিরানব্বই ভাগের অধিকারী, (১৬) শেষ বিচারের দিন একজন লম্পট পুরুষ লম্পট নারীর অর্ধেক সাজা পাবে, (১৭) স্বামী মারা গেলে পুনর্বিবাহের জন্য তাদের তিন মাস (ইদ্দাহ্) অপেক্ষা করতে হয় এবং (১৮) স্বামী তালাক্ দিলেও পুনর্বিবাহের জন্য তাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। [৬২]

নারীজাতির প্রতি ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী আকাশ থেকে পড়ে নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাক-ইসলামী আরব্য সমাজে নারীর যে স্থান ছিল ইসলামে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। জনাব রফিক উল্লাহ্ সাহেবের ভাষায় "নারীজাতিকে

---

(৬২) Counsel for Kings, Nasihat Al-Muluk, (Univ. of Durham Pub. London, 1971), P-164

তখন অস্থাবর সম্পত্তির মতই ব্যবহার করা হত। কোন কিছুতেই তাদের কোন অধিকার ছিল না, না স্বামীতে, না স্বামীর ধন সম্পত্তিতে। প্রয়োজনে পুরুষ তাকে ব্যবহার করত আবার দাসীর মত তাড়িয়েও দিত।''(৬৩) আসলে রফিক উল্লাহ্ সাহেবের উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ কবা যে, ইসলামের আগে আরবে নারী খুবই অবহেলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম নারীকে যার পর নাই মর্যাদা-সম্পন্ন করেছে। কিন্তু যে ইসলাম চারজন স্বাধীন নারী ও যত খুশী সংখ্যক দাসী রক্ষিতার উপর অধিকার বৈধ ঘোষণা করে, যে ইসলাম তিন বার ''তালাক'' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা কোন খরপোষের ব্যবস্থা না করেই নারীকে গৃহপালিত পশুর মতই রাস্তায় বের করে দেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করে, সেই ইসলাম নারীজাতিকে কতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করেছে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মুসলমানকে এ কথা বলতেই হবে যে, ইসলামের আগে সবই খারাপ ছিল এবং ইসলামের 'পর সবই ভাল হয়েছে। অথবা ইসলাম বা কোরান যা বলছে তার থেকে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। এছাড়া আর সব কিছুই খারাপ ও পরিত্যাজ্য। সভ্যতার দিক থেকে অনগ্রসর পশুপালক ইহুদী জাতির দ্বারা যে ধর্মমতের সূচনা হয়েছিল তার কিছু রদ বদল ঘটিয়েই আজ তা ইসলামের রূপান্তরিত হয়েছে। আরবের পশুপালক সমাজে ইসলাম জন্মলাভ করেছে তাই তৎকালীন আরব্য সমাজের সামাজিক রীতি নীতি তাতে স্থান পাবে এতে আর আশ্চর্য কি।

তৎকালীন আরব সমাজ ছিল যথেচ্ছ নারী সম্ভোগ ও যৌন স্বেচ্ছাচারের অবাধ লীলা ক্ষেত্র। সঙ্গতিসম্পন্ন আরবরা অসংখ্য নারীকে দখলে রেখে বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করত। স্বাধীন নারী অপেক্ষা ক্রীতদাসীর ভরণপোষণের খরচ অনেক কম হবার দরুন কম সঙ্গতি সম্পন্ন আরবরা দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে হারেম ভরতি করত। প্রায়শই তারা অধিকারভুক্ত এই সব স্ত্রীদের অন্য পুরুষের কাছে ভাড়া খাটাতো অথবা নিজেদের মধ্যে স্ত্রী বিনিময় করত। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা চলতে পারে যার থেকে তৎকালীন আরব সমাজে নারীর কি স্থান ছিল এবং ইসলাম তাকে কতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করেছে তা অনুমান করা চলতে পারে। মহম্মদের এক অনুচর আব্দুর রহমান মক্কা থেকে হিজরৎ করে মদিনায় এলে ধর্মভাই সাদ বিন রাবী তাকে আশ্রয় দেয়। মক্কায় উক্ত আব্দুর রহমানের ১৬ জন পত্নী ও বেশ কিছু সংখ্যক দাসী রক্ষিতা ছিল। যাই হোক, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর্ব সমাধা হলে সাদ তার দুই পত্নীকে ডেকে পাঠালেন এবং আব্দুর রহমানকে বললেন,

(৬৩) হাদিস শরীফ (হরফ), পৃঃ ৫১Muir

"আমার এই দুজন পত্নী আছে, এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নাও।" আব্দুর রহমান একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্র সাদ তৎক্ষণাৎ সেই পত্নীকে তালাক দিয়ে তার সাথে শুতে পাঠালো।

বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করার ব্যাপারে বস্তুতপক্ষে ইসলামের নবীগণই মুসলমানদের মূল প্রেরণা। পূর্ববর্তী নবী হজরৎ সুলাইমান (বাইবেলের Solomon) এর ১৭০০ পত্নী ও প্রায় ৩০০ দাসী রক্ষিতা ছিল। হজরৎ দাউদ (বাইবেলের David) এর ৭ জন পত্নী এবং অসংখ্য দাসী রক্ষিতা ছিল। হজরৎ ইয়াকুব ও হজরৎ মুসার চার জন করে পত্নী ছিল। এই প্রসঙ্গে ক্রীতদাসী রক্ষিতাদের ব্যাপারটা বলে নেওয়া সঙ্গত হবে। একজন দাসীকে শুধু তার প্রথম মনিবই বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারত। সেই প্রথম প্রভু তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করলে বা অন্য কারো কাছে বিক্রী করে দিলে সে আর স্ত্রীর মর্যাদা পাবার যোগ্য থাকত না। এর পর থেকে সে শুধু এক মনিবের থেকে আর এক মনিবের হাত বদল হতে থাকত। হজরৎ সুলাইমান যখন বৃদ্ধ অবস্থায় রোগ শয্যায় শয়ান তখন পুরোহিতরা বিধান দিল যে, নবীকে গরম করার জন্য একটি অল্প বয়স্কা কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া দরকার। কাজেই সারা দেশ খুঁজে একটি সুন্দরী সুলক্ষণা কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হল। Mohamad Encyclopaedia (৬৪) গ্রন্থে নবী মহম্মদের ২২ জন পত্নীর নাম পাওয়া যায় যার মধ্যে ৪ জন দাসী রক্ষিতা ছিল। এ ছাড়া ৭ জন রমণীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, কিন্তু কোন না কোন কারণে তা নিকাহ্ পর্যন্ত এগুতে পারে নি।

এই সব হারেম বন্দী নারীদের প্রতি কোন কারণে বিরূপ হলে তাকে পশুর মতই তাড়িয়ে দেওয়া হত। কোন স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইচ্ছা হলে তৎকালীন আরবরা আরও একটা বিচিত্র উপায় অবলম্বন করত। হঠাৎ এক দিন তাকে মা বলে ডাকতে শুরু করত এবং মায়ের প্রতি ছেলের মত আচার আচরণ করতে শুরু করত। পরে কোরান দ্বারা এই রীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (৩৩/৪)। কেউ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীর গায়ে যে তার জামাটা ছুঁড়ে মারতে পারত তবে সেই বিধবার উপর তার অধিকার জন্মে যেত। তখন সে সেই বিধবাকে ইচ্ছা করলে নিজের হারেমে ঢোকাতে পারত, কিংবা বিক্রী করে দিতে কিংবা ভাড়াখাটাতে পারত। বিধবা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিয়ে করা তখনকার আরবে বৈধ ব্যাপার ছিল। বিধবা বিমাতাদের স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে করা হয়ে যেত কারণ মৃত বাবার অন্যান্য সম্পত্তির মত ছেলে তার হারেমেরও মালিক হত।

---

(৬৪) Mohammad Encyclopaedia, Seerah Foundation, London. Vol. II, p-205

ইসলাম এই সব হারেমবন্দী হতভাগিনীদের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দু একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ১৬৫৯ সালে আফজল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন তখন তিনি তাঁর হারেমের ৬৩ জন বিবিকে কৎল করে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফজলের মনে আশঙ্কা ছিল যে তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না। কাজেই তাঁর অবর্তমানে তাঁর বিবিরা অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িণী হবে এটা তার সহ্য হল না। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বিবি অবশ্যই পাওয়া যাবে। বেশিদিন আগের কথা নয়, এই বিংশ শতাব্দীতেই, উগাণ্ডার অধিপতি ইদি আমিনের হারেমে যে কত জন বিবি ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া মুশকিল। কারণ কিছু দিন পর পরই তিনি পুরাণো বিবিদের কৎল করে নতুন বিবি দিয়ে হারেম ভর্তি করতেন। কসাইখানার পশুর মত শৃঙ্খলিত সেই সব রোরুদ্যমান বিবিদের প্রাসাদ থেকে কৎল খানায় নিয়ে যাবার বিবরণ সেই সময় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, যা পড়তে গায়ের রক্ত হিম হবার উপক্রম হয়। সেই ইদি আমিন ক্ষমতাচ্যুত হবার পর যখন সৌদী আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার যোগ্য বিবেচিত হল তা থেকে মনে হয় উপরিউক্ত কাজকর্মের দ্বারা তিনি আর যাই করুন, ইসলামের অমর্যাদা করেননি।

ইসলাম নারীজাতিকে কতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করেছে তার আর একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল নবী মহম্মদ কতৃক পুরুষের অস্থায়ী বা ক্ষণস্তায়ী বিবাহের অনুমোদন। প্রকৃতপক্ষে মুসলীম সমাজে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তিমাত্র। যেহেতু যে কোন সময় যে কোন পত্নীকে তালাক দিয়ে বিদায় করা যায়, তাই সমস্ত বিবাহ চুক্তিই ক্ষণস্থায়ী বিবাহে পর্যবসিত হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। ইসলামী বিবাহ চুক্তির কেন্দ্র বিন্দু হল দেনমোহর। বিবাহের সময় চুক্তি অনুয়ায়ী পাত্র পক্ষের তরফ থেকে কিছু অর্থ পাত্রীকে দিতে হয় যাকে দেনমোহর বলে। পাত্রপক্ষ চেষ্টা করে দেনমোহরের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে এবং পাত্রীপক্ষ চেষ্টা করে তা যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিতে। তালাকের দ্বারা যে কোন সময় বিবাহ চুক্তি ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকার জন্য W. Muir একে নিছক ভাড়া বলে গণ্য করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু আলোচ্য ক্ষণস্থায়ী বিবাহের বিবাহ চুক্তিটাই ক্ষণস্থায়ী। কিছু বাস্তব কারণবশত নবী তাঁর অনুচরদের এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে তা অবশ্যই দেনমোহর প্রদান করে। স্থান বিশেষে একটা জামা, বা এক মুষ্ঠি খেজুর বা এক মুষ্ঠি ময়দাও দেনমোহর হিসাবে চলতে পারে। হুনাইন যুদ্ধের পর আউতাস অভিযানের সময় মহম্মদ তাঁর উম্মতদের তিন রাত্রির জন্য ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। হাদিসে এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহের

নির্দেশ আছে (মুসলীম—৩২৪৮, ৩২৪৯,৩২৫১ ইত্যাদি)। পরবর্তীকালে তুরস্কের সুন্নী আলিমগণ এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করেন, কিন্তু ইরান প্রভৃতি দেশের শিয়া শিবিরে তা যথারীতি চলতে থাকে।

ইসলামী স্বর্গে নারীজাতিকে যতখানি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না (বিশদ বিবরণের জন্য " জান্নাত বা স্বর্গ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সভ্যতার দিক থেকে অনগ্রসর আরব জাতির কাছে নারী মাতৃজাতি নয়, শুধু ভোগের সামগ্রী, ভোগ্য পণ্য। স্বাভাবিকভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গী কোরান তথা ইসলামী শাস্ত্রের সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যে স্বর্গে প্রবেশ করা ইসলামের চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি, সেখানেও যথেচ্ছ নারী সম্ভোগের ছড়াছড়ি। ইসলামী সমাজ সম্পূর্ণভাবে পুরুষ-শাসিত সমাজ। তাই এই ভয়ঙ্কর পুরুষশাসিত সমাজে শুধু পুরুষরাই স্বর্গে গিয়ে অঢেল যৌন সুখ ভোগ করবে। নারীর সেখানে বলতে গেলে প্রবেশ করারই অধিকার নেই। মহম্মদ বলতেন যে, নরকবাসীদের মধ্যে মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। নবী আরও বলতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সব সমস্যারই সমাধান করতে পেরেছেন, শুধু মাত্র নারী পুরুষের যে ক্ষতি করে তারই কিছু করে যেতে পারেন নি। এর কারণ হল নারী তার সমস্ত বদগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম মানবী মা হাওয়ার কাছ থেকে পেয়েছে।

এই বিশ্বে একমাত্র মুসলীম সমাজেই নারীজাতিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে গৃহবন্দী করে রাখার রীতি চালু আছে। আফগানিস্তানে নাজিবুল্লা সরকারের পতনের পর প্রথম যে ইসলামী সরকার শাসন ক্ষমতা দখল করে তারা শরীয়তি আইন চালু করার নামে সর্বপ্রথম নারীজাতিকে পর্দা দিয়ে আবৃত করে। তারপর বর্তমান তালিবান সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের যেটুকু অধিকার তখনও বিদ্যমান ছিল তাও হরণ করে নেয়। মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মেয়েদের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় দুই দশকেরও বেশীদিন ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধের ফলে কাবুল শহরের পুরুষের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে এবং এতদিন তাদের বিধবারা সামান্য কাজকর্মের দ্বারা রুটি রুজির যোগাড় করছিল। কিন্তু তালিবান সরকারের ফতোয়ার ফলে তাদের উপবাসে মারা যাবার উপক্রম হয়। এই সব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম নারী জাতিকে অগ্রসর হতে দিতে চায় না, মধ্যযুগেই দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়।

মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত মুসলীম অধ্যুষিত দেশ এত দিন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পতনের পর তারাও ইসলামের জিগীর

ভূলে শরীয়তি আইন কানুন চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মিশরের আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তাশখন্দে তারা একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সমস্ত অঞ্চলটি ইসলামীকরণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে (৬৫)। এটা বলাই বাহুল্য যে, এই ইসলামীকরণের সর্বপ্রথম বলি হবে ঐসব দেশগুলোর নারীসমাজ। ইসলামীকরণের অঙ্গ হিসাবে প্রথম তাদেরই পর্দাবৃত করে গৃহবন্দী করা হবে এবং তিন তালাকে বিতাড়িত হবার অধিকারিণী করা হবে। পর্দার দৌলতে মুসলীম নারী সমাজের স্বাভাবিক চলাফেরা, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সর্বোপরি আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা যে বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তা বলাই বাহুল্য।

এই পর্দার দাপটে সৌদি আরব, ইরানসহ মুসলীম দেশগুলোতে মেয়েদের খেলাধুলা করার কোন অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, ইরানে মেয়েদের পক্ষে খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখারও অনুমতি নেই। বাংলাদেশকে ইসলামী দেশ ঘোষণা করার পর মেয়েদের শাড়ীর দৈর্ঘ্য বার হাত করা হয় যাতে তাদের পর্দা করতে সুবিধা হয় এবং মেয়েদের খেলাধুলা করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গত কয়েক বছর আগে আলজিরিয়ায় প্রায় ৩০০ স্কুল ছাত্রীর গলা কেটে দেওয়া হয় কারণ তারা ইসলামী আইনমত ঘরে বন্দী না থেকে স্কুলে শিক্ষা নিতে যায়। গত ১৯৯৭ সালে মিশরের ১৩ বছরের এক ছাত্রীকে অনেক কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয় কারণ সে গরমে টিকতে না পেরে প্রাকাশ্য স্থানে পর্দা তুলেছিল এবং সকলে তার মুখমণ্ডল দেখে ফেলেছিল। এ বছর ৮ই মার্চ, ১৯৯৮, বিশ্ব নারী দিবসে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নাসিম আলম জাহিদ কলকাতার একটি সভায় বলেন যে, কলকাতার মেয়েরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে পাকিস্তানের মেয়েদের কাছে তা এখনও এক স্বপ্ন। তিনি আরও বলেন যে আজও সেখানে ধর্ষিতা মাহিলারা সুবিচার পান না।(৬৬)

বর্তমানে এই পর্দার দাপট ইরানে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।(৬৭) আয়াতুল্লা খোমেইনীর আমলেই সেখানে মেয়েদের জন্য আলদা বাস ও ট্যাক্সী চালু করা হয়েছিল এবং ইদানীং সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কও খোলা হয়েছে, সেখানে সব কর্মচারীও মহিলা থাকবে। মেয়েদের জন্য পৃথক রেস্তোরাঁ ও সিনেমা হলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত কো-এডুকেশন স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে ঘেরা জায়গায় মেয়েদের সমুদ্রস্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাট বাজার এবং দোকানেও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া

(৬৫) The Statesman, 8.8.1994 (৬৭) ibid – 8.8.1994
(৬৬) ibid–9.3.1998

হয়েছে যখন শুধু মেয়েরাই কেনাকাটি করবে। এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন দুজন ছেলে মেয়ের পক্ষে পথে ঘাটে কথাবার্তা বলা নিষেধ।

পথে বেরোবার সময় তাদের এমন পোষাক পরতে হবে যাতে সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকে, শুধু প্রয়োজনে মুখমণ্ডলটি খোলা থাকতে পারে। তাদের চুল অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে, কারণ তা বিপজ্জনক। ইরানের প্রথম রাষ্ট্রপতি আবুল হাসান বনি সদর ১৯৭৯ সালে এই দাবী করেন যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েদের চুল থেকে এক রকমের অদৃশ্য রশ্মি বের হয় যা পুরুষদের উন্মত্ত করে তোলে। এ ব্যাপারে ইরানের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি আলি খোমেইনীর মত হল, কোন মুসলমানের চাদরের নীচে মেয়েদের এক গাছা চুল থাকা ইসলামের প্রতি তাক করা এক খানা ধারালো ছুরির মতই বিপজ্জনক। ইসলামী ইরানের সর্বাপেক্ষা বড় তাত্ত্বিক গুরু আয়াতুল্লা ইমামী কাসামীর মতে বিবাহ সম্বন্ধ বহির্ভূত দুজন নারী পুরুষের ছোঁয়াছুঁয়ি হল সকল অনর্থের মূল। তার মতে একটা ভীড় বাসে যতবার একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, ততবার ইসলামী বিপ্লবের সৌধ কেঁপে ওঠে। অপর একজন ইসলামী আলিম আয়াতুল্লা হুসেন দস্ত গিয়াবের মতে, বিবাহ সম্বন্ধ বহির্ভূত কোন নারীপুরুষ পরস্পরের দিকে তাকালে শয়তান মুচকি হাসে।

নারী পুরুষের উপরিউক্ত ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে অনেক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। ১৯৮৬ সালে আলি খোমেইনীর জিম্বাবোয়ে সফরকালে তিনি সেখানকার এক মহিলা মন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করলে খুবই তিক্ততার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবে অত্যন্ত রেগে যান এবং আলি খোমেইনীকে তৎক্ষণাৎ জিম্বাবোয়ে ত্যাগ করতে আদেশ দেন। এর পরে গত ১৯৯৩ সালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আলি আকবর বিলাইতীর জার্মানী সফরকালে তিনি সেখানকার মহিলা রাজনীতিকদের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করলেও অনুরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে এরই সমসাময়িককালে ভারতের অভিনেত্রী শ্রীমতী শাবানা আজমীর গালে নেলসন ম্যান্ডেলার চুমু খাওয়া নিয়ে মুসলীম জগতে যে সোরগোল উঠেছিল তাও স্মরণ করা চলতে পারে।

বর্তমান ইরানে মেয়েদের পক্ষে চুলে কলপ লাগানো, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো, রঙচঙে পোষাক পরা, মাথায় টুপী পরা অথবা পোষাকের ভেতর থেকে মাথার চুল বেরিয়ে থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই সমস্ত অপরাধের প্রতি নজর রাখার জন্য সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে বন্দুকধারী এক মহিলা পুলিশ বাহিনী। কোন মহিলা উপরিউক্ত অপরাধগুলির কোন একটিতে

অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পেটানো হয়। অনেককে উত্তর পশ্চিম তেহরাণে অবস্থিত কুখ্যাত এভিন কারায় বন্দিনী করা হয় এবং যথাযোগ্য অত্যাচার চালানো হয়। এই প্রসঙ্গে ইরানেরই একটি প্রগতিশীল মহিলা সমিতির বক্তব্য হল, এই সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল নারীজাতিকে গৃহবন্দী করে রেখে শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করা এবং পুরুষের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল করে রাখা।

এই পরিস্থিতিতে বর্তমান ইরানের নারী সমাজকে কতখানি শ্বাসরোধকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয় তা সহজেই অনুমান করা চলে। বাংলাদেশী লেখিকা শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর "নির্বাচিত কলম"-এ এর কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে আঙুলের ডগার কোন সামান্য ক্ষতের চিকিৎসা করাতে এসে কোন কোন মহিলা ডাক্তারের সামনে নিজেকে নগ্ন করে ফেলে। এপ্রসঙ্গে "মনু সংহিতা" 'র একটি শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে।

অরক্ষিতা গৃহরুদ্ধাঃ পুরুষৈবাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।। (৯/১২)

—অর্থাৎ, যে কামিণী দুঃশীলতা হেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী হয় না তাহাকে আপ্ত পুরুষেরা গৃহরুদ্ধ রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিত হইয়া থাকে। মনু আরও বলেছেন, "কেহ কখনও বলপূর্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না" (ন কশ্চিদ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্ (৯/১০)। যে সমাজে বা দেশে বিড়ালের উপদ্রব খুব বেশি, মাছ সেখানে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, দোষটা মাছের নয়।

কোন্ কোন্ রমণীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা চলতে পারে সে ব্যাপারে কোরান বলছে, "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তাদের তোমরা বিবাহ করো না"(৪/২২)। এই আয়াতে আল্লা আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারে বিধবা বিমাতাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করলেন এবং পরবর্তী আয়াতে বললেন "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু (পিসী), খালা (মাসী), ভ্রাতুস্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধমাতা,[৬৮] দুগ্ধভগিনী, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্বস্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার

(৬৮) দাইমা। আরবে এই রীতি ছিল যে, অভিজাত ঘরের শিশুরা আপন মায়ের বদলে দাইমার স্তন্যপান করে বড় হত, তাই এই নাম।

অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা। পূর্বে যা হয়েছে হয়েছে, আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়"(৪/২৩)।

উপরিউক্ত আয়াতাটিতে দেখা যাচ্ছে যে, (১) অত্যন্ত নিকট আত্মীয়তা সম্বন্ধযুক্ত মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে ছাড়া প্রায় সকল নারীকেই বিবাহ করা চলে, (২) ক্ষেত্রবিশেষে কন্যাস্থানীয়া রমণীকে বিবাহ করাও কোরান দ্বারা বৈধ এবং (৩) শেষে "পূর্বে যা হয়েছে হয়েছে" থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যে কয়টি বিধি নিষেধ কোরান আরোপ করেছে, প্রাক ইসলামী আরবে তাও বৈধ ছিল। এই প্রসঙ্গে পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ওল্ড টেস্টামেন্টকে কিছুটা অদল বদল করেই কোরানে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এর থেকে বড় কথা হল ওল্ড টেস্টামেন্ট রচনাকারী যাবাবর পশুপালক ইহুদীদের এবং পশুপালক আরবের বেদুইনদের জীবনশৈলীর মধ্যেও তেমন কোন ফারাক ছিল না। ওল্ড টেস্টামেন্টের লেভিটিকাস অধ্যায়ের (১৮/৭) বাক্য বলছে "Do not dishonour your father by having sexual relation with your mother." — অর্থাৎ "মায়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে বাবার অসম্মান করো না।" কাজেই কারো বাবা মারা গেলে কিংবা নিরুদ্দেশ হলে কি বিধান হবে তা এই বর্বরদের গড'ই জানেন। সেমিটিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিকট আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহের প্রচলনের উৎস হল, আদম ঈভ বা আদম হাওয়ার গল্প। আদম হাওয়ার ছেলে মেয়েদের বিবাহের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ভাই-বোনের বিবাহের মধ্য দিয়েই মানব জাতির প্রসার হয়েছিল। কাজেই নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ তাদের ধর্মের মূল কথা।

যেহেতু উপরিউক্ত (৪/২৩) আয়াতের বলে যে কোন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করা কোরান দ্বারা বৈধ, তাই মুসলীম সমাজে কোন নারীর পক্ষে কোন নিকট আত্মীয় পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তা হলে সেই সমাজে নারীর নিরাপত্তা কোথায়? এই নিরাপত্তার অভাবও মুসলীম সমাজে পর্দাপ্রথা অপরিহার্য হয়ে ওঠার একটা অন্যতম কারণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের ও বেদনার কথা হল এই যে, আমাদের দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজস্ব জন্মলব্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আরবের বর্বর পশুপালক বেদুইন সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে চলেছেন। যখন একজন ভারতীয় হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন, তখন তার নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কি উন্নতি হয় তা বলা

শক্ত। কিন্তু তিনি যে নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করার অধিকার অর্জন করে অনগ্রসর আরব্য সংস্কৃতির অংশীদার হন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামের প্রভাবে তারা যে কতখানি অনুপ্রাণিত হন, একটা ঘটনা থেকে কিছুটা অনুমান করা চলতে পারে। গত ১৯৯৪ সালের ২৮শে জুন তারিখের "বর্তমান" প্রত্রিকার খবর অনুযায়ী রাজার হাট থানার অন্তর্গত হাতিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা আনিসুর রহমান নিজের ১৭ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। আনিসুরের স্ত্রী থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আনে এবং তখন দেখা যায় যে মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা। এমন হতে পারে যে আনিসুর পূর্ববর্তী নবী হজরৎ লুত (Lot)-এর কাছ থেকেই উক্ত কর্মকাণ্ডের প্রেরণা লাভ করেছিল। স্ত্রী মারা গেলে হজরৎ লুত তাঁর দুই বয়স্কা কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন (Genesis – 19/33-36)।

মুসলমানদের মতে সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী ফোরকান বা কোরান শরীফ আবির্ভূত হবার আগে সবই খারাপ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, প্রাক-ইসলামী সেই জাহেলিয়াত বা অন্ধকারময় অজ্ঞানতার যুগেও, অথবা রফিক উল্লাহ্ সাহেবের ভাষায় "যৌন ব্যভিচার"-এর যুগেও বেদুইন রমণীদের মধ্যে পর্দার প্রচলন ছিল না এবং সেই যুগের নারীরা আজকের মুসলীম সমাজের নারীদের থেকে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir John Bagot Glubb তাঁর Life and Times of Mohammad গ্রন্থে লিখছেন, "The Bedouin women were free and not veiled and romantic courtship was a recognized institution. In the 6th century, the Bedouin women enjoyed considerable freedom. Young widows, for example, lived in their own tents and received their suitors as they felt inclined" (P-27). কাজেই এটা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, কঠিন পর্দার দ্বারা আবৃত হয়ে আজকের মুসলীম নারী সমাজকে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন যে জীবন কাটাতে হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে ইসলামেরই অবদান।

তৎকালীন মদিনার অল্প সংখ্যক মুসলীম রমণীকে অ-মুসলমান রমণীদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করার জন্যই সর্বপ্রথম পর্দার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৬২২ খৃস্টাব্দে মহম্মদ হিজরৎ করে মদিনায় এলে আস্তে আস্তে তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গরাও মদিনায় এসে তাঁর সাথে যোগ দিল। এই উদ্বাস্তু মুহাজীররাই যে কালে মদিনার কর্তা হয়ে বসল তা আগেই বলা হয়েছে এবং মুসলমানদের

সহজে সনাক্ত করার জন্য যে মহম্মদ তাঁর দলের লোকদের গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে বলেন তাও আগে বলা হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ঐ পদ্ধতিতে একজন মুসলমান রমণীকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অপর দিকে পরম করুণাময় আল্লা কুমারী, সধবা, বিধবা, সবরকম বিধর্মী নারীকেই মুসলমানদের জন্য বৈধ করে রেখেছেন। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল কোন মুসলমান রমণীকে ভুল করে বিধর্মী ভেবে কোন কোন আল্লার বান্দা আল্লা নির্দিষ্ট বৈধ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এই গর্হিত কাজ বন্ধ করার জন্য মুসলমান রমণীদের বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণ খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিল। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে ওমর মুসলমান রমণীদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেবার পরামর্শ দিলেন এবং আল্লা তৎক্ষণাৎ সেই সুপারিশকে সমর্থন করে বাণী অবতীর্ণ করলেন, "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও বিশ্বাসী রমণীগণকে বল তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ তাদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়; এতে করে তাদের চেনা সহজ হবে এবং উত্যক্ত করা হবে না"(৩৩/৫৯)। আল্লার উপরিউক্ত বাণীর মাধ্যমে পর্দার প্রাথমিক উদ্দেশ্য খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং আল্লার আদেশ অমান্য করলে যে উত্যক্ত হবার সম্ভাবনা আছে তাও আল্লা খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। উপরিউক্ত আয়াত থেকে এটাও অনুমান করা চলে যে, সম্ভবত নবীর কোন স্ত্রী বা কন্যাকে উত্যক্ত করা হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে, এই সমস্ত আয়াতও আল্লা তাঁর মণিমুক্তাখচিত স্বর্গীয় কোরানে অনেক আগে থেকেই লিখে রেখেছিলেন।

উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা পর্দার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হল বটে, কিন্তু অন্যান্য আল্লার বান্দার লালসার হাত থেকে নবীর পত্নীদের রক্ষা করার জন্য আল্লাকে কালক্রমে আরও বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করে পর্দাকে নিশ্চিদ্র করতে হল। এই ভাবে পর্দা এক কঠিন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনে পরিণত হল।

৫৯৪ খৃস্টাব্দে প্রথম পত্নী খাদিজার সঙ্গে যখন নবীর বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজা জীবিত থাকাকালীন নবী দ্বিতীয় কোন পত্নী গ্রহণ করেন নি। সেই সময়কার আরব সমাজ, যে সমাজে বহুবিবাহ একটা সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সমাজের লোক হয়েও নবী দ্বিতীয় কোন দার পরিগ্রহ না করায় অনেকের মনে এই ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে, নবী একজন সাত্ত্বিক ও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। সেই সময়কার আরব সমাজে কোন রমণী যদি যথেষ্ট ধনশালী বা প্রভাবশালী

বংশের মেয়ে হতেন তবে তাঁর স্বামীর পক্ষেও একাধিক বিবাহ করা সম্ভব হত না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। নবী তাঁর অত্যন্ত আদরের কন্যা ফতেমাকে চাচাত ভাই আলির সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবী হিসাবে মহম্মদ খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলির পক্ষে দ্বিতীয় কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবুজাহল নামে মহম্মদের এক ঘোরতর শত্রু ছিল যে বদরযুদ্ধে মারা যায়। মক্কা দখলের পর আলি আবু জাহলের মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। এ সংবাদ ফতেমা পিতা মহম্মদকে জানালে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন,"না, এ কখনই হতে পারে না। আলি যদি আবুজাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তবে তার আগে ফতেমাকে তালাক দিতে হবে। আমি ও ফতেমা অভিন্ন। যে ফতেমাকে উত্যক্ত করে সে আমাকে উত্যক্ত করে, যে ফতেমার শত্রুতা করে সে আমার শত্রুতা করে" (মুসলীম-৫৯৯৯)। কাজেই আলিকে তার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বংশমর্যাদার দিক থেকে খাদিজা ছিলেন মহম্মদের অনেক উপরে এবং মহম্মদ ছিলেন খাদিজার অনুগ্রহধন্য। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, খাদিজা জীবিত থাকাকালীন নবী হিসাবেও মহম্মদ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি এবং ৬১৯ খৃস্টাব্দে খাদিজার মৃত্যু হলে তারও দুবছর বাদে মদিনায় হিজরত করার পর থেকেই নবীর ভাগ্য খুলতে থাকে।

কোরেশ বংশীয় সক্রান ও তার স্ত্রী সৌদা ইসলামের শৈশবেই মুসলমান হন। পরে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার শুরু হলে তাঁরা আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে সক্রান মারা গেলে মহম্মদ বিধবা সৌদাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং খাদিজা মারা যাবার দুই থেকেতিন মাসের মধ্যে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। তখন সৌদার বয়স ছিল ৫০ বছর। হিজরতের পর নবী অনেক যুবতী পত্নী গ্রহণ করলে তিনি সৌদাকে তালাক দিতে উদ্যত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তালাক না দিয়ে যে রফা হয় তা আগেই বলা হয়েছে। নবীর মৃত্যুর পরও সৌদা দশ বছর বেঁচে ছিলেন।

মহম্মদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু ছিলেন মক্কার ধনী ব্যবসায়ী আবু বকর। খাদিজা মারা যাবার সময় মহম্মদের কনিষ্ঠা কন্যা ফতেমার বয়স ছিল ১৪/১৫ বছর। সেই সময় আবু বকরের মক্কার হারেমে ১৬ জন পত্নী ছিল এবং তা সত্ত্বেও কিশোরী ফতেমার প্রতি তাঁর লোভ ছিল। তৎকালীন আরব সমাজে শিঘার বিবাহ নামে এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল যা আমাদের বদল বিবাহের মত। এই রীতি অনুসারে মহম্মদ ও আবু বকরের সঙ্গে এই বোঝাপড়া হয় যে,

মহম্মদ ফতেমাকে আবুবকরের সঙ্গে এবং আবু বকর আয়েশাকে মহম্মদের সঙ্গে বিবাহ দেবেন। যে বছর সৌদার সঙ্গে নবীর বিবাহ হয় সেই বছরই উপরিউক্ত বোঝাপড়া অনুসারে আয়েশা নবীর বাগদত্তা বধূতে পরিণত হন। নবীর বয়স তখন ৫০ বছর এবং আয়েশার বয়স ৬/৭ বছর।

ইসলামী বিধি অনুযায়ী কোন রমণীকে, বিশেষভাবে কোন কুমারীকে তার সম্মতি ব্যতীত পাত্রস্থ করা যায় না। ই আব্বাস বর্ণিত হাদিস বলছে, "পূর্ববিবাহিতা স্ত্রীলোক (অর্থাৎ বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা) তার অভিভাবকদের চাইতে নিজেই নিজের অভিভাবক হবার অধিকতর অধিকারী, কিন্তু কুমারী বালিকার সম্মতি চাইতে হবে এবং তার নীরবতাই তার সম্মতি" (মুসলীম-৩৩০৭)। কাজেই অনুমান করা চলে যে ছয় বছরের শিশু আয়শাকে যখন বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁর নীরবতাকেই সম্মতি বলে গণ্য করা হয়েছিল।

যাই হোক, হিজরীর প্রথম বছরে মদিনায় আবু বকরের বাড়িতে যখন এই বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয় তখন নবীর বয়স ৫২ বছর এবং আয়েশার বয়স ৯ বছর। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যর সৈয়দ আমির আলি তাঁর "Spirit of Islam" গ্রন্থে লিখছেন যে, ব্যক্তিগত ভোগ লালসা চরিতার্থ করতে নবী এই বিবাহ করেননি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আবু বকরের সাথে তাঁর বন্ধুত্বকে আত্মীয়তার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অচ্ছেদ্য এবং চিরস্থায়ী করা বা cementing করা। কিন্তু অন্যান্য অনেক মুসলমান গ্রন্থকারই উপরিউক্ত কারণকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন না। তাঁদের মতে উক্ত বিবাহের পিছনে নবীর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। যেমন জনাব এম, আব্দুর রহমান তাঁর "নবীদের জীবন সঙ্গিনী" গ্রন্থে লিখছেন, "অ-মুসলমানদের অনেকেই বিবি আয়েশার বিবাহকে উপলক্ষ্য করে হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) কে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে কসুর করেন না। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, কর্তব্যের খাতিরেই হজরৎকে এ বিবাহ করতে হয়েছিল। শরীয়তে ইসলামের (ইসলামের বিধান শাস্ত্রে) নারীদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিধি বিধান ও কানুন আছে। হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ), পাক-নাপাক (পবিত্র-অপবিত্র) প্রভৃতি বিষয়ে এবং নারী সমাজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল (অবগত) ও পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করতে হলে সুশিক্ষিতা নারীর মাধ্যমেই সে শিক্ষাদান সহজ-সাধ্য হয়। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জানানাকে শরিয়তের সকল বিষয়, বিশেষ করে যৌন সম্বন্ধীয় নাজুক বিষয়ে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অল্পবয়স্কা ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীই এ সকল বিষয়ে শিক্ষা

গ্রহণের যোগ্যা পাত্রী। .....অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মন ও মস্তিষ্ক থাকে শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। নারী সমাজকে বিবি আয়েশার মারফৎ শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবার জন্যই হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) অল্প বয়স্কা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন" (পৃঃ ৬৪)।

জনাব আবদুর রহমান আরও মনে করেন যে, নবীর কাছ থেকে এই সমস্ত মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলেই বিবি আয়েশার পক্ষে ১২১০ টি হাদিস বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছিল এবং লিখছেন, 'ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, আলেমা (বিদুষী) আয়েশা বার শ দশটি হাদিশ রওয়ায়েত বা বর্ণনা করেছিলেন। এত বিপুল সংখ্যক হাদিস নবীর অন্য কোন পবিত্রা পত্নীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি" (ঐ, পৃঃ ৬৪)। পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে যে, যৌন নাজুক বিষয়ে কি কি মূল্যবান হাদিস মহামান্যা আয়েশা রেখে গেছেন, তাই তার কয়েকটা নীচে দেওয়া গেল।

কোন ব্যক্তি একদিন বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেন "কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্নান করা আবশ্যক (ফরজ)?" তখন বিবি আয়েষা বললেন, "যখন কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের উপর বসে এবং তাদের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে তখনই স্নান করা আবশ্যিক"(মুসলীম-৬৮৪)। বিবি আয়েশা বর্ণনা করছেন যে, একদিন এক ব্যক্তি নবীকে জিজ্ঞাসা করল যে, বীর্যপাত না হওয়া সত্ত্বেও কি যৌন মিলনের পর স্নান করা বাধ্যতামূলক? নবী তখন আঙুল তুলে বিবি আয়েশাকে দেখিয়ে বললেন, "সে আর আমি প্রায়ই এ রকম করি এবং তারপর স্নান করি।"(মুসলীম-৬৮৫)। আয়েশা বর্ণনা করছেন, "আমি এবং আল্লার রসুল যৌন ক্রিয়ার পর একই পাত্র থেকে জল নিয়ে স্নান করতাম, একবার আল্লার রসুল হাত ঢুকিয়ে জল তুলতেন, এক বার আমি হাত ঢুকিয়ে জল তুলতাম" (মুসলীম-৬২৯)। আশাকরা যায় আর বেশী উদাহরণের প্রয়োজন হবে না।

উপরিউক্ত ব্যাপারে আব্দুর রহমান সাহেব তাঁর গ্রন্থে আরও লিখছেন, "পঞ্চাশ উর্ধ্ব বছর বয়সে একটি বালিকাকে বিবাহ করার মধ্যে কামের কুৎসিৎ প্রেরণা থাকতে পারে না, যৌন বিজ্ঞানের পাঠক পাঠিকারা তা অস্বীকার করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। হজরৎ আয়েশা-মোহাম্মদ (দঃ) এর সাদী মোবারক সম্বন্ধে যারা অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন, তাঁদের হৃদয় মন যে পবিত্র নয় এবং তাঁরা যে "দ্বীন ইসলাম" কে সুনজরে দেখেন না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই" (ঐ, পৃঃ৬৫)। উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্যে আবেগের বশে আবদুর রহমান সাহেব নিজের অজ্ঞাতসারে ইসলাম বিরোধী কথা বলে ফেলেছেন। কাম কুৎসিৎ, ইসলাম এ কথা বলে না, উপরন্তু কামের চরিতার্থতাই ইসলামের নির্দেশ এবং প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।

উম্মতদের মধ্যে কেউ বিয়ে সাদী না করে কাম দমন করার কথা বললে আল্লার রসূল বলতেন, "ওরা কি সব পাগল হয়ে গেছে? অথচ আমি নামাজ করি, ঘুমাই, রোজা রাখি, রোজা বন্ধ করি এবং বেশ কয়েকজন স্ত্রীলোককেও বিয়ে করেছি। যারা আমার সুন্নত না মানবে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই"(মুসলীম-৩২৩৬)। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করাকে নবী মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধতো করেছেনই (মুসলীম-৩২৩৯), উপরন্তু বলতেন যে,"আমার উম্মতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যার সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্নী আছে।"(৬৯) যেই নবীকে তিনি কামশূন্য সাত্ত্বিক বানাতে চাইছেন সেই নবীই বলতেন যে, এক দিন্ ফেরেস্তা জিব্রাইল তাঁকে এক বাটি আরক পান করতে দেয়, যা খেয়ে নবীর যৌনক্ষমতা ৪০টা মানুষের সমান হয়ে যায়(৭০)। ডাক্তার হিসাবে শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর "নির্বচিত কলাম"-এ লিখছেন যে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে অনেক পুরুষের মধ্যে প্রোষ্টেট গ্ল্যান্ড আকারে বড় হয় এবং এই রোগের ফলে এন্ড্রোজেন ও এসট্রোজেন হরমোন দুটির পরিমাণগত সাম্য নষ্ট হয় এবং রোগীর যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়(পৃঃ ৩০)।

শ্রীমতী নাসরিন আরও লিখছেন, "শারীরিক অসুস্থতার কারণে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তাই তারা কোন বয়স্কা মহিলা নয়, কিশোরী থেকে যুবতী পর্যন্ত মেয়েদের বিয়ে করবার আগ্রহ প্রকাশ করে"(ঐ, পৃঃ৩১)। "প্রোসটেটের পরিবর্ধন এবং তার প্রতিকার আমার বিষয় নয়। আমার বিষয় প্রোসটেট হঠাৎ রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে ষাট সত্তর বছর বয়সের সেই সব বুড়ো পুরুষ, যারা কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিয়ে করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। অনেকে এই বিষয়কে ন্যায়সঙ্গত করবার জন্য নানারকম যুক্তি তৈরী করেন। যেমন বুড়ো বয়সে যত্ন করার কেউ নেই অথবা আমাদের রসুলুল্লাহ্ নবী দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন ইত্যাদি" (পৃঃ ৩১)।(৭১)

সব থেকে বড় কথা হল, কামকে কুৎসিৎ বললে আবদুর রহমান সাহেব জান্নাতে গিয়ে করবেন কি? সেখানকার হাজার হাজার হুরীদের সামনে এরকম ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বললে আল্লার বিদ্বেষভাজন তো হবেনই, এমন কি জান্নাত থেকে বিতাড়িত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

---

(৬৯) Tabaqat, Vol-II, P-146

(৭০) Understanding Islam Through Hadis, Ram Swarup (Voice of India),p. (ঐ-১/১৭)

(৭১) নির্বাচিত কলাম, আনন্দ পাবলিপার্স (১৯৯৩)।

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আবদুর রহমান সাহেব সব থেকে জোরালো যুক্তিটাই তাঁর গ্রন্থে লেখেন নি। এক যুক্তিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর তা হল, হজরৎ আয়েশা ও হজরৎ মহম্মদের বিবাহ আল্লা কতৃক নির্দিষ্ট ছিল এবং আল্লার আদেশ পালন না করে আল্লার রসুলের কোন উপায় ছিল না। ফেরেস্তা জিব্রাইল পর পর তিন রাত্রে নবীকে আয়েশার ছবি দেখিয়ে বলেন, "এই তোমার পত্নী।" প্রথম দু রাত্রে ছবিটা ঠিকমত না দেখানোতে আল্লার রসুলের বুঝতে অসুবিধা হয় যে, সেটা কার ছবি। কিন্তু তৃতীয় রাত্রে নবী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে সেটা বিবি আয়েশার ছবি (মুসলীম-৫৯৭৭)।

আবদুল জব্বার সাহেবের "বাংলার চালচিত্র" যখন "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কোন একটা সংখ্যায় তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাদের এলাকার জনৈক ধনী মুসলমান বৃদ্ধ টাকার জোরে জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিয়ে করে তাকে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পত্নীতে পরিণত করেছিল। বিয়ের আগে আবদুল জব্বার সাহেব একদিন ঐ বালিকাটির বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় কাক তাড়াতে গিয়ে বালিকাটির বুকের কাপড় সরে যায় এবং আবদুল জব্বার সাহেবকে দেখে সে লজ্জায় ঘরে পালায়। বালিকার এ চাপল্য ও লজ্জা জব্বার সাহেবের মনে দাগ কাটে। বৃদ্ধের সঙ্গে ঐ বালিকাটির বিয়ে হবার কিছু দিন পর আবদুল জব্বার সাহেব দেখতে পেলেন যে রাস্তায় একটা মরা ইঁদুর পড়ে আছে এবং একটা কাক ইদুরটির কান খুঁচিয়ে মাথার ঘিলু বার করে খাচ্ছে। আবদুল জব্বার সাহেবের তখন এই ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে গেল যে, ঐ বৃদ্ধ প্রতি রাত্রে এমনি করেই ঐ বালিকাটির মাথার ঘিলু বার করে খেয়ে চলেছে। তবে আবদুল জব্বার সাহেব এ সংবাদ দেননি যে, ফেরেস্তা জিব্রাইল ঐ বৃদ্ধকে ঐ বালিকাটির ছবি দেখিয়েছিল কি না।

যাই হোক, নবীর সাথে বিবি আয়েশার বিবাহ সুসম্পন্ন হবার পর আবু বকর অনেক দিন আশায় আশায় থাকলেন কবে নবী তার সাথে ফতেমার বিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে নবী কোন উচ্চবাচ্য না করায় আবু বকর একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে নবী বললেন যে তিনি আল্লার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। এ সংবাদ ওমরকে জানালে সে বলল, "নবী আপনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন"[৭২]। ওমরের উক্ত জবাব হজম করা আবু বকরের পক্ষে খুবই

(৭২) Mirkhond, Rauzat-us-Safa, Vol-I, Part-II, P-269. As Quided by Ram Swarup in Understanding Islam Through Hadis, P-59.

বেদনাদায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই, তবে তার চেয়েও বড় কথা হল উক্ত জবাব সৈয়দ আমির আলির যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আবু বকরের সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করবার উদ্দেশ্যেই যদি নবী আয়েশাকে বিয়ে করতেন তবে ফতেমাকেও নবী আবু বকরের সাথে অবশ্যই বিয়ে দিতেন কারণ তাহলে সম্পর্ক দুই দিক থেকেই মজবুৎ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহানবীর সাথে বিবি আয়েশার বিয়ের ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হল কারণ পর্দাপ্রথার উৎপত্তির ব্যাপারে নবী ও আয়েশার দাম্পত্য জীবন বিশেষভাবে জড়িত।

হিজরীর পঞ্চম বছরে মহম্মদের কানে এল যে মক্কার কোরেশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করছে। তিনি আরও খবর পেলেন যে মুস্তালেক নামে একটি গোষ্ঠীর লোকেরা দলপতি হারিসের নেতৃত্বে মক্কার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর তিনি মুস্তালেকদের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন স্থির করলেন। এই মুস্তালেক অভিযানকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে নবীর পারিবারিক এবং মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পত্নীদের সুরক্ষার সমস্যাও নবীকে চিন্তিত করে তোলে।

নবী যখন কোন অভিযানে যেতেন তখন সাধারণভাবে একজন স্ত্রীকে সঙ্গে নিতেন। কিন্তু উপরিউক্ত অভিযানের সময় বিবি উম্মে সালামার সাথে বিবি আয়েশাও নবীর সঙ্গী হলেন। পর্দা দিয়ে ঘেরা একটা বিশেষ আসনে বসে নবীর পত্নীরা উটের পিঠে সওয়ার হতেন। বিবিরা আগেই ঐ বিশেষ আসনে বসে থাকতেন এবং চাকর বাকরেরা আসন শুদ্ধু তাদের তুলে নিয়ে উটের পিঠে চাপিয়ে দিত। অভিযান শেষ করে কাফেলা যখন মদিনায় পৌছালো তখন দেখা গেল যে বিবি আয়েশা তাঁর হাওদা বা আসনে নেই। মুহূর্তের মধ্যে এক হুলস্থূলু কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বিবি আয়েশা ছিলেন একটু রোগা পাতলা ও হালকা। এই কারণ দেখিয়ে চাকর বাকররা বলল যে, আগের দিন তারা যখন হাওদা উটের পিঠে তুলছিল তখন বিবি আয়েশা ছিলেন কি না বুঝতে পারে নি। চারিদিকে লোকজন পাঠিয়ে যখন খবর আনার প্রস্তুতি চলছে এমন সময় দূরে দেখা গেল সাফোয়ান বিন মোয়াত্তেল নামে এক ব্যক্তি লাগাম ধরে একটা উটকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে এবং তার পিঠে বসে আছেন বিবি আয়েশা।

দলছুট হবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিবি আয়েষা বললেন যে, আগের দিন রওনা দেবার ঠিক আগে প্রাকৃতিক কারণে তিনি তাঁবুর বাইরে যান এবং তাঁবুতে ফিরে এসে দেখেন যে গলার হারটি কোথায় ফেলে এসেছেন। কাউকে কিছু না বলে তিনি আবার হার খুঁজতে বেরিয়ে যান এবং ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁকে ফেলে সবাই চলে গেছে। তখন তিনি সেখানে বসেই ভাবতে থাকেন

যে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। এই সব ভাবতে ভাবতে তিনি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। অন্য দিকে সাফেয়ান অসুস্থ হবার জন্য প্রধান কাফেলার পিছন পিছন আসছিল এবং ভোরবেলা সে সেখানে পৌঁছায় এবং বিবি আয়েশাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সাফেয়ান বিবি আয়েশাকে চিনতে পেরেছিল কারণ পর্দা চালু হবার আগে সে বিবি আয়েশাকে দেখেছিল।

উপরিউক্ত ঘটনা মদিনায় এক বিশাল কুৎসার সূচনা করল। মদিনার বিখ্যাত কবি কাব জঘন্যতম কবিতা লিখে আগুন জ্বালিয়ে তুলল। সে প্রচার করতে শুরু করল যে সাফোয়ানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই বিবি আয়েশা কাফেলা থেকে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।। শুধু তাই নয়, সে আরও প্রচার করল যে, আলি সহ মহম্মদের আরও কতিপয় অনুচরের সাথে বিবি আয়েশার অবৈধ সম্পর্ক আছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবদুল্লা বিন ওব্বা, যায়েদ বিন রেফা, হাসান বিন সাবিত ইত্যাদি নবীর বিশিষ্ট অনুচরেরা, বিবি জয়নবের বোন হামনা এমন কি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় অনুচর, বদর যুদ্ধে যোগদানকারী হজরৎ মেসতাও এই কুৎসায় যোগ দিল। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কি করা উচিত নবী ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রথমে সবাইকে ৮০ ঘা করে বেত মারা হল কিন্তু সমস্যার কিছু সুরাহা হল না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং তার সমাধানকল্পে কিছু দিনের মধ্যেই আল্লা আয়াত অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি একাধারে ২৪টি আয়াত (২৪ নং সুরা, সুরা "নূর"-এর প্রথম দিকে) অবতীর্ণ করে আয়েশাকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করলেন। বিবি আয়েশা যে নিষ্কলুষ তা আরও ভালভাবে প্রমাণিত হল যখন দেখা গেল যে সাফোয়ান নপুংসক ছিল। এ ব্যাপারে একটা ঘটনার উল্লেখ করা চলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে একটা বাগান বাড়ী তৈরী করে নবী সেখানে তাঁর দাসী পত্নী মারিয়ার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে মারিয়ার দেখাশোনা করার জন্য একজন চাকর নিয়োগ করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে নবীর কানে সংবাদ এল যে ঐ চাকর ও মারিয়া অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত করতে নবী আলিকে সেখানে পাঠালেন। চাকরটা তখন কুয়োর পাশে স্নান করছিল। কোন কথা না বলে আলি তৎক্ষণাৎ তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলল।

যাই হোক আল্লা আরও কিছু আয়াত অবতীর্ণ করলেন যার কতগুলি নবীর পত্নীদের উদ্দেশ্য করে এবং কতগুলি যারা নবীপত্নীদের প্রতি কুৎসিৎ দৃষ্টি দেয় তাদের উদ্দেশ্য করে। এই সব ঘটনার পর থেকেই পর্দাকে আরও নিশ্ছিদ্র করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, যেহেতু নবী সকলের

নেতা তাই তাঁর বাড়ীতে অনুচরেরা যাতায়াত করবেই এবং সেটাই সব থেকে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিল। তাই আল্লা বললেন, "হে, নবীপত্নীগণ, যে কাজ স্পষ্টতই অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে" (৩৩/৩০)। আল্লা আরও বললেন, "হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সদালাপ করবে এবং গৃহে অবস্থান করবে, প্রাক ইসলামী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না" (৩৩/৩২/৩৩)। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লা নবীপত্নীদের গৃহে অবস্থান করার পরামর্শ দিয়ে মুসলমানদের পক্ষে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখাকে বৈধ করে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত "প্রাক ইসলামী .... বেড়িও না" বাণীর দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে ইসলামের আগে আরবে পর্দা ছিল না এবং মেয়েদের চলাফেরায় কোন বিধি নিষেধ ছিল না। অন্যান্য বান্দাদের শাসন করার জন্য আল্লা বললেন, "আল্লা ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীকে অনুগ্রহ করেন, তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর; যারা আল্লা সম্বন্ধে মন্দ বলে এবং তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় আল্লা তাদের ইহলোক পরলোক অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন" (৩৩/৫৬-৫৭)। এর পরই অবতীর্ণ হল সেই ভয়ঙ্কর আয়াত, "কপটচারিগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে (অর্থাৎ নবীকে) প্রবল করব।....অভিশপ্ত হয়ে ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে" (৩৩/৬০,৬১)। (এই আয়তাটিই নবীর বিরুদ্ধে কুৎসাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার মূল ইসলামী বিধান)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে যে, প্রথম দিকে মুসলমান নারীকে অ-মুসলমান নারীদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে যে পর্দা চালু হয়েছিল, কালক্রমে, প্রধানত নবীর পত্নীদের সুরক্ষার কারণে তা এক কঠিন সামাজিক অনুশাসনে পরিণত হল এবং আল্লা নবীপত্নীদের সাথে সাথে সমগ্র মুসলীম নারী সমাজকেই পর্দাবৃত করলেন। আল্লা বললেন, "(হে নবী) বিশ্বাসী নারীদের বল যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ করে থাকে তা ছাড়া তাদের অন্য আভরণ যেন প্রকাশ না করে। তাদের বক্ষ গ্রীবা যেন মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা,

শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভগ্নীর পুত্র, সেবিকা, যারা তাদের অধিকারভুক্ত এবং অনুগত, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন গোপন আভরণ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে"(২৪/৩১)। "নবীপত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনী পুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের দাসদাসীগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়" (৩৩/৫৫)।

বিশেষজ্ঞদের মতে উপরিউক্ত আয়াতগুলিতে আল্লা আভরণ বলতে অলঙ্কার ইত্যাদির সাথে শরীরের যে সমস্ত অংশ সাধারণত দেখানো উচিত নয় তাও বোঝাতে চাইছেন। বিশেষ করে নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ স্বামী ছাড়া আর কাউকেই দেখানো একেবারেই নিষিদ্ধ। যে সব পুরুষকে পর্দার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের মাহারাম ব্যক্তি বলে, এরা খুবই নিকট আত্মীয় পুরুষ এবং এদের কাছ থেকে কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই কারণ কোরান দ্বারা এই সব ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দেবার সময় কিংবা ডাক্তার কবিরাজের সামনে পর্দা অমান্য করা যেতে পারে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, মাহারাম ব্যক্তিদের তালিকা থেকে কাকা ও মামাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই কাকা বা মামা তার ভাইঝি বা ভাগ্নীকে পর্দাবিহীন অবস্থায় দেখার যোগ্য কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হল কাকা বা মামা যেহেতু তার ভাইঝি বা ভাগ্নীর শরীর তার ছেলেদের (যারা মাহারাম নয়) কাছে, বর্ণনা করতে পারে তাই তারা নিষেধের তালিকাতেই পড়ে। ঠিক তেমনি কোন বিধর্মী মহিলার সামনে পর্দা করা উচিত কি উচিত নয় তা বিতর্কের বিষয়, কারণ তারা তাদের স্বামীদের কাছে শরীর বর্ণনা করতে পারে। তবে বেশীরভাগের মত হল, যে কোন মহিলার সামনেই পর্দা অনাবৃত করা চলে।

ক্রীতদাস, সে পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক, পর্দার আওতার বাইরে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একদিন মহম্মদ তাঁর মেয়েকে একটি ক্রীতদাস উপহার দিতে নিয়ে যান। ফতেমা তখন স্বল্প বেশবাশে ছিলেন, মাথা ঢাকতে গেলে পা দেখা যাচ্ছিল এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা দেখা যাচ্ছিল। ফতেমার এই অবস্থা দেখে নবী হেসে বললেন, "পুরুষ হলেও এ একজন ক্রীতদাস মাত্র, কাজেই এর সামনে পর্দা করার দরকার নেই।" "যৌন কামনা রহিত পুরুষ" বলতে আল্লা বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ বা হাস্যকর এমন সব পুরুষ বোঝাতে চাইছেন যারা

নারীর কাম ও পুরুষের ঈর্ষা জাগাতে অক্ষম। কিন্তু হিজরাদের সামনে পর্দা করতে হবে কিনা তা তর্কের বিষয়। গত বছর (১৯৯৭ সালে) পাকিস্তানে এই নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় যে কোন নারীদেহের শবব্যবচ্ছেদ (postmortem) করা কোন পুরুষ ডাক্তারের পক্ষে সঙ্গত কিনা। শেষে স্থির হয় যে, একমাত্র মহিলা ডাক্তাররাই নারী শবের ব্যবচ্ছেদ করতে পারবে। কিন্তু মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা পাকিস্তানে খুব কম হবার দরুন শব ব্যবচ্ছেদের কাজ বর্তমানে খুবই ব্যহত হচ্ছে।

কথিত আছে যে, একদিন একটা কিছু দেয়া নেওয়ার সময় মহম্মদের এক অনুচরের হাত বিবি আয়েশার হাতকে স্পর্শ করে। নবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এই দৃশ্য নবীর মনকে ব্যথিত করে। কাজেই আল্লা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তোমরা বিশ্বাসীরা নবীর পত্নীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে" (৩৩/৫৩)। পর্দা সম্পর্কে কোরানের অনুশাসনের এটাই সম্ভবত শেষ আয়াত। এর আগে আল্লা মেয়েদের গৃহে অবস্থান করতে বলেছেন। কিন্তু এই আয়াতের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন, শুধু গৃহে অবস্থান করাই যথেষ্ট সাবধানতা নয়। গৃহের অভ্যন্তরেও পর্দার অন্তরালে থাকতে হবে। কাজেই এই আয়াত মুসলীম মহিলা সমাজকে গৃহে নজরবন্দী বন্দিনীতে পরিণত করল।

উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় যে, প্রাক ইসলামী আরব সমাজে যথেচ্ছ যৌনাচারের যে রীতি প্রচলিত ছিল, বহু বিবাহ ও সহজ তালাকের মাধ্যমে ইসলাম বা কোরান তা প্রায় অবিকৃতই রেখে দিল। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে আরবের জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কা। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায় মুসলমান পুরুষদের সামনে যৌন সম্ভোগের প্রলোভনকে জিইয়ে রেখে তাদের জিহাদে উদ্দীপিত করা। এই কারণেই কোরান বিধর্মী নারীকে গনিমতের মাল এবং তাদের সঙ্গে সম্ভোগ বৈধ বলে ঘোষণা করছে। উপরন্তু ইসলাম মুসলমান পুরুষদের হাতে তুলে দিলে নারী জাতিকে দমন করে রাখার একটা শক্তিশালী অস্ত্র, পর্দা।

অনেক মুসলীম বুদ্ধিজীবি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা চার এ বেঁধে দিয়ে বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করার প্রবণতাকে বন্ধ করেছে এবং এই ভাবে নারী জাতিকে সম্মানিত করেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সহজ তালাকের ব্যবস্থা থাকায় হারেম তৈরী করতে যাওয়াটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যে ব্যবসায় মাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রী হয়ে যায় সে ব্যবসায় গুদামের প্রয়োজন হয় না। নবীর নাতি এবং আলি-ফতেমার পুত্র

হাসান (যার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সিয়াপন্থী মুসলমানরা শোকের উৎসব মহরম্ পালন করেন) এক দরজা দিয়ে নতুন বিবি নিয়ে আসতেন এবং অন্য দরজা দিয়ে সমসংখ্যক বিবিকে তালাক দিয়ে বের করে দিতেন। বিবি সংখ্যা বাড়িয়ে আল্লার নির্দেশ অমান্য করতেন না। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এভাবে ৭০ জন (মতান্তরে ৯০ জন) বিবিকে তালাক দেন। এই কারণে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল তালাকের খলিফা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, পর্দা একটি কঠিন সামাজিক অনুশাসন হয়ে ওঠার মূলে বিবি আয়েশা অন্যতম প্রধান কারণ। বিবি আয়েশাকে ঘিরেই সমস্ত রকম কুৎসার সূত্রপাত এবং প্রধানত তাঁর সাথে নবীর অনুচরদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতাকে রোধ করার উদ্দেশ্যেই পর্দা কঠিন অনুশাসনে পরিণত হয়। কিন্তু শুধু আয়েশাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নবীর অন্যান্য পত্নীগণ সহ সমগ্র মুসলীম নারী সমাজ পর্দায় আবৃত হয়ে গেল। উপরন্তু বিবি আয়েশা ইন্তেকাল করার পর পর্দা লুপ্ত হয়ে গেল না, বরং অনাদিকালের জন্য মুসলীম নারী সমাজের মাথায় জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসল। কারণ যা একবার কোরানে লেখা হয়ে গেল তার আর পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। ভবিষ্যতে আর কোন নবীও জন্মাবেন না এবং কোরানের বাণীরও কোন হেরফের হবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা না হলে প্রসঙ্গ অপূর্ণ থেকে যাবে এবং পর্দা না থাকলে মুসলীম সমাজে কি ঘটতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হবে। যায়েদ নামে সীরিয়ার একটি ইহুদী ছেলেকে দুবৃত্তরা চুরি করে নিয়ে আসে এবং খাদিজার এক নিকট আত্মীয়ের কাছে তাকে বিক্রী করে দেয়। পরে সেই আত্মীয় তাকে মক্কায় নিয়ে আসে ও খাদিজাকে দান করে। মহম্মদের সঙ্গে বিয়ে হবার পর খাদিজা তাকে মহম্মদের খাস চাকর নিযুক্ত করে। পরে সে মহম্মদের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে এবং মহম্মদ তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

এদিকে যায়েদের পিতা অনেক খোঁজ খবর করার পর মক্কায় হাজির হয়, মহম্মদের কাছে ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানায়। এবং যায়েদকে ফিরে পেতে গেলে কত মুক্তিপণ লাগবে তা জানাতে বলে। মহম্মদ তখন যায়েদকে নিয়ে কাবা শরীফে যান এবং সকলের সামনে তাকে পালিত পুত্র বলে ঘোষণা করেন। ফলে যায়েদ তার বাবার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে এবং মহম্মদের কাছেই থেকে যায়। যায়েদ বড় হলে নবী নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর এক আপন ফুফুত বোনের সঙ্গে যায়েদের বিয়ে দেন। ঐ পিসতুতো বা ফুফুত বোনের নাম

ছিল জয়নব। জয়নব অতীব সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁর পিসী ও পিসতুতো ভাইদের অমতে একরকম জোর করেই নবী এ বিবাহ দেন। নবী মদিনায় চলে আসার পর যায়েদ জয়নবও মদিনায় চলে আসে।

নবী নানান কাজে প্রায়ই যায়েদের বাড়ী যেতেন। একদিন নবী যখন যায়েদের বাড়ী গেলেন তখন যায়েদ বাড়ী ছিল না। মুসলীম ভাষ্যকারদের মতে ঐ সময় জয়নবের ঘরের পর্দা হাওয়ায় উড়ে যায় এবং নবী স্বল্প বেশবাস পরিহিত জয়নবকে দেখতে পান। এরপর নবী ও জয়নবের মধ্যে কি কথা বার্তা হয়েছিল তা জানা যায় না। কিন্তু যায়েদ বাড়ী ফিরে জয়নবের কাছে সব শুনে বুঝতে পারলেন যে, পূর্বোপকারের স্বার্থে জয়নবকে ত্যাগ করে নবীর হাতে তুলে দেওয়া উচিত। যায়েদ যখন জয়নবকে তালাক দেবার জন্য নবীর অনুমতি প্রার্থনা করল তখন নবী তাকে বললেন, ''ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে রক্ষা কর এবং উত্তমরূপে প্রতিপালন কর, কারণ আল্লা বলেছেন, স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাকে ভয় কর।'' তিনি মুখে এ কথা বললেন বটে, কিন্তু অন্তরে দগ্ধ হতে থাকলেন।

যাই হোক, কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, যায়েদ জয়নবকে তালাক দিয়েছে। এরপর নির্দিষ্ট প্রতীক্ষার সময় বা ইদ্দা (মেয়েদের তিন ঋতুকাল) পার হলে নবীর দূত বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে জয়নবের কাছে উপস্থিত হল। জয়নবও তাতে সানন্দে সম্মতি জানাল এবং যথাকালে সাদী মুবারক সুসম্পন্ন হল।

তৎকালীন আরব সমাজে, যে সমাজ বিমাতা ও শ্বাশুড়ীকেও বিয়ে করতে অভ্যস্ত ছিল, সেখানেও নবী ও তার কন্যা বা পুত্রবধূ স্থানীয়া জয়নবেরও বিবাহ নিন্দিত হল। কিন্তু আল্লাহ্ কাল বিলম্ব না করে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, নবীর সমর্থনে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করলেন, ''স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি তাকে বলেছিলে, ''তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কোরো না, আল্লাহ্ কে ভয় কর।'' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করেছিলে অথচ আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে করে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সে রমনীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে''। (৩৩/৩৭)

উপরিউক্ত আয়াতটি পড়লে মনে হয় যেন, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা মুসলমানদের পক্ষে পরম পূণ্যের কাজ এবং এতদিন তা চালু না হওয়াতে আল্লাহ্‌র মনে একটা দারুণ অস্বস্তি ছিল। মহম্মদ ও জয়নবের বিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌ সে পূণ্যের রাস্তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এবং আয়াত অবতীর্ণ করে বলে দিলেন যে, এই পরম পূণ্যের কাজ যেন বিশ্বাসীরা অবিলম্বে ঘরে ঘরে করতে শুরু করে। এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, সমগ্র কোরান শরীফের মধ্যে একমাত্র (৩৩/৩৭) আয়াতটিতেই কোন মানুষের নাম আছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নবীর এই বিবাহের ব্যাপারে আল্লার কতখানি উৎসাহ ছিল এবং এই কারণেই বিবি জয়নব নিজেকে গর্বিত বোধ করতেন এবং বলতেন যে নবীর সমস্ত বিবাহের মধ্যে একমাত্র তাঁর বিবাহই আল্লা কালামপাকের আয়াত অবতীর্ণ করে সমর্থন করেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, এই সমস্ত আয়াতও দুনিয়াব্যাপী মুসলীম সমাজ স্বয়ং আল্লার বাণী বলে মান্যতা দিয়ে আসছে।

শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত আল্লা নবীকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে বাণী অবতীর্ণ করলেন, "আল্লাহ্‌ কোন মানুষের দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি, তোমরা তোমাদের পত্নীদের মধ্যে যাদের মাতৃ-সম্বোধন করেছ তাদেরকে (আল্লাহ্‌) তোমাদের মাতা করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদের তোমাদের পুত্র করেননি। এ সব তোমাদের মৌখিক বাক্য মাত্র এবং আল্লাহ্‌ সত্য কথা বলেন এবং সরল পথ নির্দেশ করেন" (৩৩/৪)। নবীও আল্লার কথামত পোষ্যপুত্র যে সম্মান যায়েদকে দিয়েছিলেন তা তুলে নিলেন এবং সে যায়েদ বিন মহম্মদ থেকে আগের নাম যায়েদ বিন হারিস-এ ফিরে গেল।

পরবর্তীকালে মুসলমানরা এমন অনেক দেশ জয় করল যে সব দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল যাযাবর, পশুপালক আরব বেদুইনদের সংস্কৃতির থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু সেখানেও তারা ধর্মের নামে এবং তরবারির জোরে কোরানের সমস্ত মধ্যযুগীয় আইন-কানুন ও রীতিনীতি সেই সব বিজিত দেশের লোকেদের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল সেই সব দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা নিজেদের উন্নত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে পশুপালক আরব্য সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে শুরু করে দিল। যে সব সভ্য সমাজে নারী অনেক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিল, সেখান থেকে তাকে টেনে নামানো হল এবং পর্দা দিয়ে আবৃত করে পুরুষের একটা অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা হল। ভারতের মত সমাজ, যে সমাজে পর্দার কোন প্রয়োজন কোনকালেই হয়নি, যে সমাজে নারী মাতৃজাতি হিসাবে বিশেষভাবে

সম্মানিত হত, ইসলামের দ্বারা যে সমাজকে কলুষিত করা হল এবং নারীকে পর্দাবৃত করে একটা ভোগের সামগ্রী এবং সন্তান জন্ম দেবার যন্ত্রে পরিণত করা হল।

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র ইসলামী দেশগুলোতেই কোন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ করা আইনত সিদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে একমাত্র বিত্তবানদের পক্ষেই একাধিক বিবাহ করে হারেম তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শ্রেণী তা পারে এবং তারা হল ধর্মগুরু বা মোল্লা শ্রেণী। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর "নির্বাচিত কলাম"-এ এইরকম কামাতুর মোল্লার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলতে বাধা নেই যে ধর্মের নামে হারেম সৃষ্টি করে যথেচ্ছ যৌনাচারের প্রলোভনই দুনিয়াব্যাপী মোল্লা শ্রেণীকে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে শরীয়তি আইন চালু করার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে।

কিন্তু তাদের এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে প্রধান অন্তরায় হল মুসলীম নারী সমাজ। যদি তারা শিক্ষার আলো পায়, আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং সর্বোপরি প্রতিবাদ করার শক্তি অর্জন করে তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই যে কোন ইসলামীকরণের প্রথম খড়্গ নেমে আসে নারী সমাজের উপর। সবার আগে তাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দাও, ঘরে নজরবন্দী করে রাখ এবং শিক্ষার আলো তাদের কাছে পৌঁছুতে দিও না। সব দিক দিয়ে তাদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখ যাতে যে কোন সময় বিবাহ করে লালসা চরিতার্থ করা যায় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে খুব সহজেই তালাক দিয়ে বিদায় করে দেওয়া যায়। এই বর্বর অত্যাচার যেন তারা চিরকাল মুখ বুজে সহ্য করে।

তাই মুসলীম নারী সমাজকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর পুরুষের বহুবিবাহ, সহজ তালাকের প্রথা ও পর্দার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "Islamic Voice" গত জানুয়ারী (১৯৯৮)র সংখ্যায় দুঃখ করে লিখছে যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলীম দেশগুলিতে দুই লক্ষ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার মাত্র আছেন, যা খুবই কম এবং এই সংখ্যা অন্তত চল্লিশ লক্ষ হওয়া উচিত। মুসলীম সমাজে শিক্ষার এই অনগ্রসরতার মূল কারণই হল নারীজাতির নিরক্ষরতা। কারণ শিক্ষিত মায়ের সন্তান কখনও অশিক্ষিত হয় না। তাই মোল্লাতন্ত্রের হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে নারীজাতিকে পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মুসলীম নারী সমাজকে বিশ্বের একটি প্রগতিশীল নারী সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ইসলামে সংস্কৃতির সংঘাত

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কোলকাতা সহ ভারতের বড় বড় শহরগুলির কোন মুসলীম হোটেল বা রেস্তোরাঁই নিরামিষ খাদ্য পরিবেশন করে না। উপরন্তু ঐ সব হোটেল বা রেস্তোরাঁর প্রায় সব খাবারই মাংস দিয়ে তৈরী। মাংসের কষা, কাবাব, আফগানী, চাপ, রেজালা, বিরিয়ানী আরও কত কি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সুজলা-সুফলা দেশে শাক-সব্জি ও তরিতরকারির এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানদের মধ্যে মাংস খাবার এত প্রবণতা কেন? এর জবাব পাওয়া যাবে আরব দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে, যেই দেশে ইসলাম জন্মলাভ করেছিল।

আরব দেশের জমি মরুপ্রায়। উপরন্তু বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু কৃষিকাজ সেখানে একেবারেই অসম্ভব। এই দুই ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আরব সমাজ আজও পশুচারণের পর্যায়েই পড়ে আছে, কৃষি ভিত্তিক সমাজে উন্নীত হতে পারেনি। সেই কারণে মাংস আজও আরব্য সমাজে একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং আমাদের দেশের মুসলমান সমাজ অতিরিক্ত মাংসাহারের মধ্য দিয়ে প্রথমত নিজস্ব জন্মলব্ধ সংস্কৃতিকে অস্বীকার করছে এবং দ্বিতীয়ত পশুপালক আরব্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ করছে।

আরব্য সমাজ যে আজও মানব প্রগতির ইতিহাসের পশুপালক স্তরে পড়ে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, আজও ঐ সমাজ চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবছর অনুসরণ করে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু কৃষির স্তরে উন্নত হলে সৌরমাস ও সৌরবছর গণনা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না, কারণ সূর্যের বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তনের উপর কৃষি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

মানব-প্রগতির ইতিহাসে কৃষি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং কৃষি-পূর্ববর্তী খাদ্য সংগ্রহকারী বা পশুচারণকারী মানব সমাজের মধ্যে দুটো মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করল। প্রথমত যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে জমি-কেন্দ্রিক স্থায়ী মানুষ্য বসতির সৃষ্টি করল । যা কালক্রমে সুসংগঠিত রাষ্ট্র ও সরকারের জন্ম দিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষি সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষকে জীবনধারণের কঠিন শ্রম থেকে মুক্তি দিতে পারল এবং তার ফলে ঐ অল্প সংখ্যক লোক শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হল। এইভাবে কৃষি বর্তমান মানব সভ্যতার সূচনা করল। পূর্বেকার পশুপালক জীবনে দুটি মূল্যবান উপাদান, স্থায়ী বাসস্থান ও অবসর পাওয়া সম্ভব ছিল না, কাজেই সভ্যতার স্ফুরণ হওয়াও

সম্ভব ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করলে কৃষিকে বলা চলে বর্তমান সভ্যতার সূতিকাগার।

আরব্য সমাজ মূলত পশুপালক হবার দরুন ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে সেই দেশে কোন সরকার, কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, আইন-কানুন কিছুই ছিল না। বেদুইনরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, উপদল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠীরই নিজস্ব কিছু কিছু অলিখিত আইন-কানুন ছিল এবং ঐ গোষ্ঠীর সকলকে তা মেনে চলতে হত। একমাত্র ইসলামের অবির্ভাবের পরই পবিত্র কোরআন সমগ্র আরব জাতিকে একটা কেন্দ্রীয় সংবিধান উপহার দিল যাকে ভিত্তি করে আরব জাতি ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হল। এই দিক থেকে বিচার করলে ইসলাম শুধু একটি ধর্মীয় আন্দোলনই নয়, আরব জাতির প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও বটে। কিন্তু উপরিউক্ত দুটি ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ইসলাম আরব্য সমাজকে কোন উন্নততর জীবনযাত্রায় নিয়ে যেতে পারল না। আরবের জীবনযাত্রা আগের মত যাযাবর পশুপালক স্তরেই পড়ে থাকল। এই কারণেই শ্রীজন ব্যাগট গ্লাব (John Baggot Glub) তাঁর Life and Times of Mohammad গ্রন্থে লিখছেন, "There is no Greek city states, Roman Senate or mediaeval knights in shining armours whom we can interview to ascertain their opinions. But in the deserts of Arabia, the Bedouins have survived into the twentieth century almost as they existed two thousand years ago". – অর্থাৎ আজ গ্রীসের নগর রাষ্ট্র, রোমের সেনেট বা যুদ্ধসাজে সজ্জিত মধ্যযুগীয় নাইট, কারও দেখা পাওয়া সম্ভব নয় যাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দ্বারা ব্যক্ত মতামতের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও আরবের মরুভূমিতে বেদুইনরা দু'হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও ঠিক একইভাবে টিকে আছে।

কিন্তু ঋগ্বেদের যুগের অনেক আগেই যে ভারতীয় সমাজ পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়েছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে বিভিন্ন ধরনের মাটি, বিভিন্ন রকমের কৃষি যন্ত্রপাতি, ধান্য ব্রীহি, যব ইত্যাদি শস্য; কূপ বা অবত থেকে জলসেচ করার পদ্ধতি ও জমিতে সার প্রয়োগ করার বর্ণনা থেকে এটা সহজেই প্রমাণ করা চলে যে, ঐ সময় ভারতীয় সমাজ পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। বেশীরভাগ পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন যে, খ্রীস্টপূর্ব ৪৫০০ বা তারও আগে ঋগ্বেদীয় সভ্যতা প্রসারলাভ করেছিল। কাজেই এটা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, আজ থেকে ৬৫০০ বছরেরও আগে ভারতীয় সমাজ সভ্যতার যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য আরব্য সমাজ আজও সভ্যতার সেই

পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি। (এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার জন্য পাঠক Dr.D. Raghavan রচিত Agriculture in Ancient India গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারেন।)

মহানবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরবেরা তরবারির জোরে বিশ্বের এক বিশাল ভূ-ভাগের মালিক হয়ে বসল এবং সেই সঙ্গে ইসলামের মধ্য দিয়ে তাদের পশুপালক সংস্কৃতি বিজিত দেশগুলোর ধর্মান্তরিতদের উপর চাপিয়ে দিতে শুরু করল। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় হল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশ আরবরা দখল করল, সে সমস্ত দেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু অনেকটাই আরবের মত। এই কারণে সেই সব দেশগুলোর জীবনযাত্রার মধ্যেও বেশ কিছুটা পশুপালক চরিত্র বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে, নীল, টাইগ্রীস, ইউফ্রেটীস, ইত্যাদি নদীর তীরবর্তী বাসিন্দারা জলসেচের সাহায্যে কৃষিকাজ করলেও দূরবর্তী মানুষরা আজও পশুপালন দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে। বর্তমান পাকিস্তানের পশ্চিম অংশেও এই ধরনের পশুপালক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, উপরিউক্ত পশুপালক সংস্কৃতি বর্তমান থাকার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের পক্ষে ইসলামের মধ্যে দিয়ে আরবের পশুপালক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা কোন কঠিন কাজ হল না এবং এই কারণেই ঐ সব দেশগুলোতে ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ সম্ভব হল। এর পিছনে অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে, যেমন জাতিভেদ প্রথা।

কিন্তু লক্ষণীয় হল এই যে, পরবর্তীকালে ইসলামী জগতে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হলো তখন মধ্যপ্রাচ্যের নদীতীরবর্তী কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষরাই তাতে বেশী অংশগ্রহণ করল এবং তাতে মূল আরব ভূ-খণ্ডের পশুপালকদের কোন অবদান থাকল না বললেই চলে। বিশেষ করে এই কারণেই পরবর্তীকালে বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কা-মদিনা থেকে টাইগ্রীস নদীতীরে বাগদাদে স্থানান্তরিত হল। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টী তাঁর The Origin of Islamic State গ্রন্থে বলছেন, "No Student of Arabic literature fails to be impressed by the fact that the bearers of the torch of learning among the Arabs were, in most cases, foreign and particularly of Persian origin." অর্থাৎ আরব্য সাহিত্য অধ্যয়নকারী যে কোন ছাত্রের পক্ষেই এটা নজরে না এসে পারে না যে, আরব্য জগতের শিক্ষাদীক্ষার মশালধারীদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল বিদেশী, বিশেষ করে পারস্য উদ্ভূত।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন ইসলাম ভারতবর্ষের মত দেশে উপস্থিত হল যেখানকার সমাজ বেশ কয়েক হাজার বছর আগেই পশুপালক যাযাবর জীবন

পবিত্যাগ করে কৃষিনির্ভর এক অতিশয় উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মালিক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ কোনদিন সরাসরি আরবদের দ্বারা বিজিত হয়নি, তুরষ্ক, আফগানিস্তান ও পরবর্তীকালে মোঘল ধর্মান্তরিতরাই ভারত দখল করে এবং পশুপালক ইসলামী সংস্কৃতি ভারতে নিয়ে আসে। কিন্তু কৃষিভিত্তিক উন্নত ভারতীয় সংস্কৃতি ও পশুপালক ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ব্যবধান ভারতবর্ষকে ইসলামীকরণের পথে এক অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণীর মত হল এই যে, ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার লোভ, হিংসা, খুনোখুনী ও রক্তপাতকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতো এবং সেই কারণে বিদেশী মুসলমানদের তারা ঘৃণাভরে ম্লেচ্ছ বলতো। এর ফলে হিন্দুদের মুসলমান করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দুও ধর্মত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার চাইতে মৃত্যু বরণ করাকেও শ্রেয় মনে করতো। প্রধানত এই সব কারণেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ৭০০ বছর ভারত শাসন করেও বিদেশী মুসলমান শাসকদের পক্ষে মাত্র ১১ শতাংশ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়। সমগ্র মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাকে পুরোপুরি ইসলামীকরণ করার পর ভারতের মাটিতে ইসলামের এই থমকে দাঁড়ানো বিশ্ব ইতিহাসে এক অতিশয় চমকপ্রদ ঘটনা এবং উপরিউক্ত সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

আরবের বেদুইন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য পশুপালকদের কাছে পশুহত্যা করা এবং তার মাংস খাওয়া আমাদের বাজার হাট করার মতই দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ। কাজেই পশুদের প্রতি তাদের করুণা দেখাতে বলা বা অহিংস হতে বলা নিরর্থক। এই কারণে ইসলামে অহিংসা ও নিরামিষ আহারের কোন স্থান নেই। একমাত্র সুজলা সুফলা এই ভারতের মাটিতেই অহিংসার তত্ত্ব জন্মলাভ করতে পেরেছে কারণ ফলমূল ও শাক-সবজির প্রাচুর্য হেতু মাংসাহার এখানে কোনদিনই অপরিহার্য ছিল না।

উপরিউক্ত দৈনন্দিন পশুহত্যা ও সেই সঙ্গে রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়া আরবের বেদুইন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য পশুপালক জনগোষ্ঠীকে করে তুলেছে নির্দয় ও নিষ্ঠুর। কত সহজেই যে তারা মানুষ খুন করতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে। বেদুইনদের রক্তপণ-এর নিয়ম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। সত্যি কথা বলতে, নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের ব্যাপারে ভারত বা বাংলাদেশ বা থাইল্যান্ডের একজন নিরীহ মুসলমান কৃষকের সঙ্গে কোনমতেই আরবের একজন বেদুইনের তুলনা চলে না। এই নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাত মহানবীর জীবনেও প্রতিফলিত। ভারতের এমন একজনও ধর্মপ্রচারক পাওয়া যাবে না যে এক নাগাড়ে ৬৩টা উট কোরবানী করতে সক্ষম বা সারাদিন ধরে ৮০০ লোকের শিরচ্ছেদ ক্রিয়া পরিচালনা ও

প্রত্যাক্ষ করতে সক্ষম। উকল গোত্রের ৮ জন আপরাধীকে মহানবী নিজহাতে যে বীভৎস সাজা দিয়েছিলেন তাও ভারতের একজন ধর্মপ্রচারকের ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

মুসলমান শাসনের যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশেষ করে পারস্য থেকে অনেক মুসলমান পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতে চলে আসে। ঐ সমস্ত বিদেশী মুসলমানরা ভারতের শাসকদের দ্বারা মর্যাদাশালী খাঁটি বা খানদানী মুসলমান বলে গণ্য হত ও উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হত। এইসব বিদেশী খানদানী মুসলমানরা ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের খুবই হীন নজরে দেখতো এবং কাফেরের সমতুল্য মনে করতো। এইসব ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে এ রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী আজও বিদ্যমান। আজও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা ভারত, বাংলাদেশ ও দূরপ্রাচ্যের মুসলমানদের হীন চোখে দেখে থাকে। কয়েক বছর আগে দিল্লীর এক বিখ্যাত ইমাম হজ উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে আরবের মৌলবীদের হাতে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত ও নিগৃহীত হন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসলাম যতই প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই যেন সে তার কৌলিন্য হারিয়ে ফেলছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ কিএই যে প্রাচ্যের দেশগুলো আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মত রুক্ষ-শুষ্ক ও বন্ধ্যা নয়? এক কারণ কি এই যে, প্রাচ্যের মানুষরা কৃষিজীবী এবং তাবা পশুপালক নয়? কাজেই এই মূল প্রশ্নে উপনীত হতে হয় যে, কৃষি কি প্রকৃত মুসলমান হবার পথে অন্তরায়? অথবা প্রকৃত বা খানদানী মুসলমান হবার অধিকার কি মধ্যপ্রাচ্যের পশুপালকদেরই জন্মগত?

প্রাচ্যের কৃষিভিত্তিক ইসলাম ও মধ্যপ্রচ্যের পশুচারণকারী ইসলামের মধ্যে আরও একটা চোখে পড়ার মত বৈসাদৃশ্য হল নারী জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচ্যের মুসলমান নারীরা যে সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করেন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান নারীদের কাছে তা কল্পনার বাইরে। প্রথমত প্রাচ্যের কৃষিভিত্তিক ইসলাম মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে একেবারেই কঠোর নয়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে দূর প্রাচ্যের কোন মুসলমান মহিলাই কালো বোরখা দ্বারা নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করেন না যা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক। এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, ধানক্ষেতের জলা জমিতে বোরখা পরে কাজ করা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু প্রাচ্যের মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষান্তে চাকুরি বা অন্য কোন পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করার স্বাধীনতা স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইরানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যেখানে পর্দার নিয়ম খুবই

কঠোর। স্মরণ করা যেতে পারে আলজেরিয়ার কথা, যেখানে স্কুলে যাওয়ার মত ইসলামী বিরোধী কাজ করার জন্য নাবালিকা স্কুল ছাত্রীদের গলা কেটে ফেলা হয়। স্মরণ করা চলতে পরে মিশরের কথা, যেখানে আল আঝর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবীর ফতোয়া অনুসারে নাবালিকাদের খৎনা (Circumcision) করা হয় এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে প্রতি বছর বেশ কয়েকশ বালিকা প্রাণ হারায়। স্মরণ করা চলতে পারে আফগানিস্থানের কথা, যেখানে বর্তমান তালিবান সরকার মেয়েদের সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে এবং সমগ্র মহিলা সমাজকে গৃহবন্দী করে ইসলামের প্রতি তাদের চরম নিষ্ঠা প্রকাশ করছে ও পৈশাচিক তৃপ্তি লাভ করছে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেল বিক্রী করে খুবই ধনী হয়েছে এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাসবাদী মুসলীম সংগঠনগুলোর পিছনে সেই অর্থ ব্যয় করছে। এইসব ধ্বংসাত্মক কাজের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামে সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন মসজিদ নির্মান ও পুরানো মসজিদের সংস্কারের কাজেও তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু দেশবাসীকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে একটা প্রগতিশীল জাতি গঠন করার ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই। বিদেশ থেকে শিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী নিয়ে এসে কাজ করিয়ে নিতেই তারা বেশী সচেষ্ট। এটাও অবশ্য সত্য যে, একটা যাযাবর পশুপালক সমাজকে শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করা খুবই কঠিন এবং প্রায় এক অসম্ভব কাজ।

কিন্তু সুখের কথা হল এই যে, প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের উদার মনোভাবাপন্ন পরমত-সহিষ্ণু ও গঠনমূলক কৃষিভিত্তিক ইসলাম আজ মধ্যপ্রাচ্যের ধ্বংসাত্মক, চূড়ান্ত রক্ষণশীল ও ভয়াবহ ইসলামকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানের বীভৎস ইসলাম আজ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার গঠনমূলক ইসলামের কাছে ম্লান হতে শুরু করেছে। দূর প্রাচ্যের এই দুটি দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুসরণ করে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দেশবাসীকে শিক্ষিত করে কারিগরি ও শিল্পের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ‘‘ইসলাম মানেই অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতা’’ এই চলতি ধারণাকে এরা মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। এদের মধ্যে মালয়েশিয়ার অগ্রগতি অত্যধিক চমকপ্রদ। শ্রীমহাথীর মহম্মদের নেতৃত্বে বিগত ১৬ বছরে মালয়েশিয়ার জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মালয়েশিয়া নিজেকে বিশ্বের ২৭তম বাণিজ্যিক দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসিদ্দিক ফাদিল বলেন, ‘‘চিরকালের জন্য মক্কাই থাকবে পবিত্র শহর। কিন্তু সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হতে পারে। পবিত্র কোরান বলছে যে,

বিশ্ব মানবকে পথ প্রদর্শনকারীদের পরিবর্তন ঘটে। তাই মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য দ্বারা মুসলীম জগৎ পরিচালিত হবার দিন শেষ হয়ে গেছে।" থাইল্যান্ডের সঙ্কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীইমতিয়াজ আহ্মদ বলেন, "বর্তমান ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে এটাই মনে হচ্ছে যে, মুসলীম জগৎকে ২১শ শতাব্দীর বিশ্বদরবারে উপস্থিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের হাতেই অর্পণ করেছেন।"

ইন্দোনেশিয়ার মুহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীমহম্মদ আমীন রইস বলেন, "ওরা (মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা) দেখাতে চেষ্টা করে যে ওরাই সমগ্র মুসলীম জগতের রক্ষাকর্তা। কিন্তু আমরা তা মানতে রাজী নই। আমরাও মুসলমান এবং আমরাও কোরআন পাঠ করি। আমরা ওদের সঙ্গে সমান আসনের দাবিদার। আমরা যুদ্ধ ও মারামারিতে নয়, কল্যাণকর বিষয়ে ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চাই।" ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীআমীন রইস (যিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টরেটও বটে) বলেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মত মূর্খদের বিষয় নিয়ে কথা বলে আমি আমার সময় ও শক্তি নষ্ট করতে রাজী নই। আমরা চাই একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো। আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীস্টান, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে নিয়ে সুন্দর ও সমন্বয়পূর্ণ ইন্দোনেশিয়া গঠন করা।" (উৎস) ঃ Time-23.9.96.

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে একটি অতিশয় সহনশীল, শান্তিকামী ও গঠনমূলক ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে যদি এই ধর্মের অনুগামীরা আল্ কোরআনের মাক্কি আয়াৎগুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মাদানী আয়াৎগুলোকে গুরুত্ব না দেন। মদিনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মহানবী নিজেকে আল্লাহ্‌র একজন একনিষ্ঠ সেবক বলেই মনে করতেন। মনে করতেন যে, জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করাই তাঁর একমাত্র কাজ এবং কর্তব্য। তখন আল্লাহ বললেন,"(আল্লাহ্‌র বাণী) প্রচার করা ছাড়া রসূলের আর কোন কর্তব্য নেই। (৫/৯৯)" "তোমাদের ধর্ম তোমার কাছে প্রিয়, আমার ধর্ম আমার কাছে প্রিয়"(১০৯/৬), "আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না" (৩/১৪০), "আল্লা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদের ভালবাসেন না" (৫/৬৪), ইত্যাদি অহিংস ও নিরীহ কথা।

কিন্তু হিজরতের পর মহানবী একাধারে হয়ে গেলেন মদিনার প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক ও প্রধান সেনাপতি। এই সময়েই তিনি ক্ষমতার আস্বাদ পেলেন এবং সেই ক্ষমতাকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগাবার কথা তাঁর মনে উদিত হল। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই তরবারির সাহায্যে ইসলামের প্রসারের নীতি স্বীকৃত হল এবং জিহাদের তত্ত্বের উদ্ভব হল। "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি"(৭/৯৪), এই বাণীর দ্বারা আল্লাহ্

মহানবীকে অত্যাচার ও উৎপীড়নের অধিকার দিলেন। আল্লাহ্ নবীর অনুগামীদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন এবং মদিনার অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে বললেন (২/২১৬) (২২/৩৯)। তখন থেকেই জিহাদের রক্তাক্ত আয়াৎগুলি অবতীর্ণ হতে শুরু করল এবং আল্লাহ্ বলতে থাকলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়" (৮/৩৯), "ওরা পশুর সমান" (৭/১৭৯), "ওদের যেখানে পাও হত্যা কর" (৯/৫), "ওদের গর্দানে আঘাত কর" (৪৭/৪), "ওদের হত্যা কর, শূলবিদ্ধ কর ও হাত-পা কেটে ফেল"(৫/৩৩)। হিজরতের পূর্বে ভয় বলতে ছিল আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় এবং হিজরতের পরে সে ভয় আল্লাহ্‌র অনুগামীদের তরবারির ভয়ে পরিণত হল। মহিলাদের পর্দা দিয়ে আবৃত করে এবং গৃহে বন্দী করে রেখে তাদের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করার আয়াৎগুলিও মদিনাতেই অবতীর্ণ হয়, তাই সেগুলোও মাদানী আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু নৈতিক উন্নতিকে গুরুত্ব না দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নৈতিক উন্নতির স্পৃহা হ্রাস করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে গনিমতের মালকে বৈধ ঘোষণা করে পরদ্রব্যের প্রতি তাদের লোভী করে তুললেন, উপরন্তু জিহাদের মাধ্যমে সেই পরদ্রব্য লুণ্ঠনে উৎসাহিত করলেন।

কিন্তু বিশ্বের আশাবাদী মানুষ আমরা এটাই আশা করবো যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্যের পরমতসহিষ্ণু, সমন্বয়বাদী ও গঠনমূলক কৃবিভিত্তিক ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যের অসহিষ্ণু, ধ্বংসাত্মক ও উগ্র পশুপালক ইসলামের উপর সাংস্কৃতিক বিজয় অর্জন করবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্যের এই মার্জিত ও প্রগতিশীল ইসলাম এই উপমহাদেশের মুসলমানদের সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে চালিত হতে উৎসাহিত করবে। আমরা আরও আশা করবো যে, মুসলীম জগৎ ধীরে ধীরে পবিত্র কোরআনের মাক্কি আয়াৎগুলিকে বেশী গুরুত্ব দেবে এবং ইসলামের এক নবযুগের সূচনা করবে।

চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি এবং পূর্ণিমা অমাবস্যা সাধারণ মানুষের চোখে যত প্রকট, সূর্যের বার্ষিক গতি অত প্রকট নয়। এই কারণে আদিম মানব চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বছর দিয়েই কাল গণনা শুরু করেছিল। কিন্তু কৃষির আবিষ্কারের পর সৌর মাস ও সৌর বছর গণনা জরুরী হয়ে পড়ল। কারণ কৃষির প্রয়োজনীয় ঋতু পরিবর্তন সৌরবছর অনুযায়ী হয়। তিন সৌর বছরে ৩৬ সৌর মাস ও ৩৭ চান্দ্র মাস হয়। তাই ভারত বর্ষের মানুষ প্রতি ৩ সৌর বছর অন্তর একটা চান্দ্র মাস মলমাস হিসাবে বাদ দিয়ে পুরানো চান্দ্র বছর ও নতুন সৌর বছরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করল। ওই পরিত্যক্ত চান্দ্রমাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন শুভ অনুষ্ঠান পূজা ইত্যাদি করে না। এইভাবে একটা চান্দ্রমাস বাদ দিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রথাকে ইংরাজীতে Triennial intercalation বলে এবং বাংলায় একে "ত্রৈবার্ষিক মলমাসকরণ" বলা চলতে পারে। ক্রমে ভারতবর্ষে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি সৌরমাস গণনা শুরু হল। সূর্য তার বার্ষিক

গতিপথে মেষ, বৃষ ইত্যাদি রাশিতে অবস্থানের সময়কে সৌর মাস বলে। মেষ রাশিতে অবস্থানের সময়কে বৈশাখ মাস, বৃষ রাশিতে অবস্থানের সময়কে জ্যেষ্ঠ মাস ইত্যাদি। এইভাবে ভারতবর্ষ থেকে চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বছর গণনা প্রায় উঠে গেল, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে চান্দ্র দিন বা তিথি গণনা চলতে থাকল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সৌর মাস এবং বারো সৌর মাসে এক সৌর বছর গণনা করা হতে থাকল।

প্রাক ইসলামী আরবে ত্রৈবার্ষিক মলমাসকরণের প্রথা চালু ছিল এবং তিন বছর পর পর কোন্ মাসকে মলমাস হিসাবে বাদ দিতে হবে তা মক্কার কোরেশরাই নির্দিষ্ট করে দিত। সমস্ত আরবে কোরেশদের প্রভত্ব করার ব্যাপারে এটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু বিদায় হজের বিদায় ভাষনের সময় নবী বললেন যে ত্রৈবাষিক মলমাসকরনের যে প্রথা এতদিন চলে আসছিল, এখন থেকে সে প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হল, কারণ এর দ্বারা আল্লার স্বর্গীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছিল। এই বলে নবী কোরানের ৯নং সুরা (সুরা তওবা)র দুটি আয়াৎ উদ্ধৃতি দিলেন যাতে বলা হয়েছে—"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লার বিধানে, আল্লার নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি পবিত্র মাস (মহরম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ্জ)। ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান"........ (৯/৩৬)। "নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পেছিয়ে দেওয়া কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করা ব্যতীত নহে। যাতে অবিশ্বাসকারীরা পথভ্রান্ত হয়, তারা ওর এক বছর বৈধ করে ও এক বছর অবৈধ জ্ঞান করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলিকে অবৈধ করেছিল সেগুলোকে বৈধ করতে পারে" (৯/৩৭)।

কিন্তু কথা হল, আরব যদি কৃষিপ্রধান দেশ হত তা হলে নবীর পক্ষে পুরোপুরি চান্দ্র বছর প্রবর্তন করা সম্ভব হত না। আর করলেও গত ১৪০০ বছর তা টিকে থাকতে পারত না। আজ যদি বাংলাদেশে নবীর কথামত চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বছর চালু করার চেষ্টা করা হয় তবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না, কারণ তা হলে কৃষি মার খাবে। তাই তারা বাংলা সালই গণনা করে।

এবার ঘরে ফেরার পালা

দুর্যোগের রাতে কোন নাবিকের পক্ষে নিজ গতিপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া বা লক্ষ্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয় এবং দুর্যোগ পার হলে সেই নাবিক পুনরায় তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে ফিরে আসবে অথবা ফিরে আসার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্যোগের পরেও সে যদি দম্ভভরে সেই বিচ্যুত পথটাকেই আসল পথ বলে দাবি করতে থাকে এবং সেইদিকেই অগ্রসর হতে থাকে তবে তাকে, আর যাই হোক, বুদ্ধিমান নাবিক বলা চলে না। সেই ভ্রষ্ট পথকে অনুসরণ করে সে যে এক ভুল ঠিকানায় উপনীত হবে তা বলাই বাহুল্য।

এই কথাটি আজকের ভারতীয় উপমহাদেশের সমগ্র মুসলমান সমাজের পক্ষে একান্তভাবে প্রযোজ্য। বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা ভারত বিজয়ের পূর্বে এই দেশের মুসলমানদের সকলেই হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন এবং যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা মাত্র, তাই সেই হিসাবে সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুসলমান শাসকদের দ্বারা অত্যাচারের শিকার হয়ে কিংবা প্রলোভনে প্ররোচিত হয়ে তাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান হয়েছিলেন এটাই ইতিহাসের ঘটনা। উপরন্তু এ ঘটনা বেশীদিন আগের নয়। বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে তা ৭০০ বছরের বেশী কখনই হতে পারে না। কারণ ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর দ্বারা নওদীয়হ্ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হলেও শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, "এয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারে নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও মুসলমানদের দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃঃ ২)। এরও প্রায় ১০০ বছর পরে রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌র শাসনকালের সময় থেকেই আজকের মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় ধর্মান্তরকরণের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

কিন্তু তার আগে হাজার হাজার বছর আজকের সকল ধর্মান্তরিত মুসলমানই হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কাজেই নিঃসন্দেহে সেটাই তাদের মূল লক্ষ্যপথ। আজ তাঁরা আরবী অথবা ফার্সী নাম গ্রহণ করে, গোমাংস আহার করে এবং আরও

নানারকম উপায়ে জন্মলব্ধ হিন্দু সংস্কৃতিকে অস্বীকার এবং আরব্য সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে চেষ্টার কোন কসুর করছেন না। কিন্তু কথা হল, শুধু এইসব বাহ্যিক উপায়ে মাতৃসমা হিন্দু সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি অভিন্ন। তাই যিনিই এই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করবেন তিনিই নিজের অজান্তে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হবেন, যাকে অস্বীকার করা কখনই সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা যে কি, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা আর কিছুই নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নতুন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশীদূর যায় না। ...... ইহার চেয়ে পাকা পরিচয়ের ভিত্তি কি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?........অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিতে যদি নিতান্তই কোন লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতে হইবে।'' (প্রবন্ধ ঃ আত্মপরিচয়)। তিনি আরও বলছেন, ''তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্ক মাত্রই নাই। .....ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে মশাই হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান ছিলেন। খ্রীস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা তাহাদের অহর্নিশি হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান'' (ঐ)। ''........... মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।'' (ঐ)।

ঋষি অরবিন্দও ঠিক একই কথা বলেছেন। ইসলাম বা খ্রীস্টধর্মের মত হিন্দু ধর্ম শুধু একটি ধর্মমাত্র নয়, হিন্দুত্ব হল ভারতের জাতীয়তাবাদ। তাই তিনি তাঁর বিখ্যাত ''উত্তরপাড়া অভিভাষণে'' বলছেন, "I say that is the Sanatana Dharma, which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatana Dharma, with it it moves and with it it grows."– অর্থাৎ, সনাতন ধর্মই হল আমাদের জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু জাতি সনাতন ধর্ম সাথে নিয়ে জন্মেছে, সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করেই সে এগিয়ে চলেছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।''

কিছুদিন আগে ভারতীয় সংসদে এ বিতর্ক চরমে ওঠে যে, মহারাষ্ট্রের কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল হিন্দুত্বের কথা বলে জনসাধারণের ভোট প্রার্থনা করে, অর্থাৎ বিশেষ একটি ধর্মের আবেদন সামনে রেখে ভোট চেয়ে খুবই সাম্প্রদায়িক কাজ করেছে। বিবাদ শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যায়। বিগত ১৯৯৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের ৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ তাঁদের ঐতিহাসিক রায়ে এই মত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু শব্দের দ্বারা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্মের মত কোন বিশেষ ধর্মকে বোঝায় না। হিন্দু শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের দ্বারা একটি বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতি, যা বিগত হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষে চলে আসছে তাকেই বোঝায়। কাজেই হিন্দুত্বের কথা বলে ভোট চাওয়া কোন মতেই সাম্প্রদায়িক কাজ নয়। সব থেকে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, যে ৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে উক্ত বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন এবং ঐ প্রধান বিচারপতি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনেকের মনে এই ধারণা হতে পারে যে, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন বলে পক্ষপাতমূলকভাবে হিন্দুত্বের জয়গান করেছেন এবং প্রধান বিচারপতি বাদে সুপ্রীম কোর্টের অন্য দুজন বিচারপতি হিন্দু ছিলেন বলে আদালতের রায়ে হিন্দুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, শুধু রবীন্দ্রনাথ বা অরবিন্দই নন, মক্কার মৌলবীরাও ভারত উপমহাদেশ থেকে আগত হাজীদের হিন্দু নামে অভিহিত করেন। কয়েক বছর আগে দিল্লীর প্রখ্যাত ইমাম মৌলানা আব্দুল বুখারী হজ করতে মক্কায় যান এবং মৌলবীদের উপরিউক্ত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। দিল্লীর জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য জনাব ডঃ রশিদুদ্দিন খাঁ মিশর সরকারের আমন্ত্রণে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং দু বছর সেখানে বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসাবে কাটান। ফিরে আসার সময় কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তাঁর জন্য এক বিশেষ বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেই সভায় বক্তারা এই মত প্রকাশ করতে থাকেন যে, বিগত দু বছর তাঁরা একজন হিন্দুর মধুর সম্পর্ক ও সান্নিধ্য উপভোগ করে আসছিলেন এবং রশিদুদ্দিন সাহেবের চলে আসার ফলে তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হবেন। বিস্মিত ডঃ রশিদুদ্দিন প্রতিবাদ করে বলেন যে, তিনি হিন্দু নন, মুসলমান এবং বক্তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন যে তাঁর আরবী নাম থেকেও কি তাঁরা বুঝতে পারেননি যে তিনি হিন্দু নন, মুসলমান। তাঁর কথা সকলে হেসে উড়িয়ে দেন এবং বলতে থাকেন যে

তাঁর ব্যবহার, জীবনশৈলী, সব কিছুই প্রমাণ করছে যে তিনি একজন হিন্দু। নামে কি এসে যায়। বরং তাঁরা উল্টো যুক্তি দেখিয়ে বলতে থাকেন যে, নেহরু শব্দটিও একটি আরবী শব্দ (আরবী 'নহর' (খাল) থেকে উৎপন্ন)। তাই জহরলাল নেহরু যদি হিন্দু হতে পারেন তাহলে রশিদুদ্দিনের হিন্দু হতে বাধা কোথায়? (Organiser-19/4/98)

গত ১৯৯৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দিল্লীর "Times of India" পত্রিকার নবাব জাফর জঙ ও আখতালুল ওয়াসির লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে লেখকদ্বয় বলেন যে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ এই মত ব্যক্ত করতেন যে, All those who are born in India and live there, drink water from Ganga and Yamuna and rest in peace in the sacred soil of this land, are all Hindus"। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তণ প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব এম. সি. চাগলা নিজের সম্বন্ধে বলতেন যে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে তিনি হিন্দু এবং ধর্মের দিক দিয়ে তিনি একজন মুসলমান (Organiser -19/4/98) । জনাব আনসার হুসেন খাঁ দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান এবং ৩৭ বছর সেখানে কাটাবার পর আবার ভারতে ফিরে আসেন এবং Rediscovery of India নামে একটি বই লেখেন। ঐ গ্রন্থে তিনি লেখেন, "Indian Muslims should accept the facts that the Afghans, Turks and Mughals had heaped untold atrocities on the Hindus in the mediaeval times. ....Muslims should abandon their claim in the site of the Ram Mandir in Ayodhya, a very small price for Hindu Muslim amity" (as quoted in Loksatta-5/10/96)।

ধ্বনিটারে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে

বাঙালী মুসলমানদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলেন সংস্কৃত ভাষাই তার জননী। কাজেই মাতৃভাষাকে আরও গভীরভাবে জানতে বা বুঝতে হলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত থেকে কিভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়েছে তা না জানলে বাংলাভাষার ইতিহাস জানা হয় না। তাই সংস্কৃত ভাষার সাথে সাথে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, চর্যাপদ, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিও অধ্যয়ন করা

আবশ্যক। কাজেই কোন মুসলমান বন্ধু যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থকে হিন্দু গ্রন্থ আখ্যা দিয়ে বিদ্বেষবশত পড়তে অস্বীকার করেন তবে মাতৃভাষার ইতিহাসও তাঁর কাছে অজানা থেকে যাবে। তেমনি একজন দর্শনের ছাত্রকেও ভারতীয় দর্শন হিসাবে যা যা পড়তে হবে তা সবই হিন্দু দর্শন এবং একজন ইতিহাসের ছাত্রকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস হিসাবে যা যা পড়তে হবে তা সবই হিন্দুর ইতিহাস। এই সর্বগ্রাসী হিন্দু সংস্কৃতি থেকে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই হয়তো আমাদের দেশের মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষ এতবেশী এবং কবির ভাষায় "ধ্বনিটারে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" এ প্রসঙ্গে এটা বলাও যুক্তিযুক্ত হবে যে, পূর্ব বা প্রকৃত পরিচয় গোপন করার জন্যই ভারতীয় ইতিহাসের মুসলিম গবেষকরা মুসলমান শাসনের আগে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক এবং ঐ একই কারণে বাংলাদেশের টেলিভিশন ও বেতার অনুষ্ঠানে ইসলামীকরণের পূর্বেকার বাংলাদেশ কেমন ছিল সেই সব বিষয় সযত্নে বাদ দেওয়া হয়। ঐ সব অনুষ্ঠান শুনলে মনে হয় ১৯৭০ বা বড়জোর ১৯৪৭ সালের আগে বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মুসলমান সমাজের আলিমরা সর্বদাই এই মত ব্যক্ত করে চলেছেন যে, যে আরবী ভাষায় কোরান শরীফ নাযেল হয়েছে সে আরবী ভাষা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভাষা। যে আরব দেশে নবী মহম্মদের আবির্ভাব হয়েছিল সেই আরব দেশের মাটি পবিত্র। কিন্তু ক'জন বাঙালী আরবী ভাষা বোঝেন আর ক'জন বাঙালী মুসলমানই বা আরব দেশে যেতে পারেন? যে ভাষা নিতান্তই দুর্বোধ্য সে ভাষা পবিত্র কি অপবিত্র তাতে কি এসে যায়? প্রকৃতপক্ষে যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় আমরা প্রথমে মাকে 'মা' ও ভাইকে 'ভাই' বলে ডেকেছি, কোন ভাষা তার থেকে পবিত্র হতে পারে কি? যে দেশের মাটিতে আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যে দেশের জল- বাতাস গ্রহণ করে আমরা বেঁচে আছি, সে দেশের মাটি থেকে অন্য কোন দেশের মাটি বেশী পবিত্র হতে পারে না। যে সব নদী-নালার জল পান করে আমরা বেঁচে আছি, জমজমের পানি কখনই তার থেকে বেশী পবিত্র হতে পারে না।

আরবের প্রতি প্রজাসুলভ বশ্যতা

১৯৭৯ সালে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ঠিক পরেই প্রখ্যাত ত্রিনিদাদের লেখক V.S.Naipaul ইরানে যান। উদ্দেশ্য ছিল আয়াতুল্লা খোমেইনীর নেতৃত্বে সংঘটিত উপরিউক্ত ইসলামী বিপ্লবকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা। এর পর তিনি আরও তিনটি ইসলামী দেশ, যথাক্রমে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও

ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণ করেন এবং ফিরে এসে "Among the Believers" নামে একখানি বই লেখেন। বইটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর গত ১৯৯৫ সালে তিনি আবার ঐ চারটি ইসলামী দেশ পরিভ্রমণ করতে যাত্রা করেন এবং দু বছর ভ্রমণ করার পর ফিরে এসে, "Beyond Belief" নামে আরও একখানি বই লেখেন। সম্প্রতি বইটি প্রকাশিত হয়েছে। উপরিউক্ত ইসলামী দেশগুলোর ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি উপরিউক্ত গ্রন্থে লেখেন, "Because of its (Islam's) origin in Arabia, Islam demands an emperial loyalty towards Arabia from all the scattered believers of all those Islamic countries".– অর্থাৎ, আরব দেশ ইসলামের জন্মস্থান হবার ফলে ইসলাম ঐ সব দেশের মুসলমানদের কাছ থেকে আরবের প্রতি প্রজাসুলভ বশ্যতা দাবি করে। এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলমান জনসাধারণও নিঃশব্দে ঐ দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে শ্রীনয়পল লিখছেন, "A conver t's world view alters ...... The convert has to turn away from everything that is his own. The resulting disturbance for a society is immense." অর্থাৎ, এর ফলে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীটাই সম্পূর্ণভাবে পালটে যায়। সে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ ও উদাসীন হয়ে পড়ে। এর ফলে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা অপরিসীম, "To a convert, his land is of no religious or historical importance; only the sands of Arabia become sacred." অর্থাৎ নিজের দেশের ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় গুরুত্ব তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং আরবের বালিই তার কাছে কেবলমাত্র পবিত্র বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়ে পড়ে (Time-3/8/98)।

এই প্রসঙ্গে বলা সমীচিন হবে যে শ্রীনয়পল আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করেননি। একজন ধর্মান্তরিত মুসলমানের কাছে কোন বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারী আর আক্রমণকারী শত্রু থাকে না, পরিত্রাণকারী মিত্রে পরিণত হয়। তাই ভারত-আক্রমণকারী দস্যু মহম্মদ ঘোরী পাকিস্তানের মুসলমানদের চোখে আক্রমণকারী শত্রু নয়, সম্মানজনক পরিত্রাতা। এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েই পাকিস্তান সরকার তাদের সর্বাপেক্ষা দূরপাল্লার মিসাইলের নাম "ঘাউরী" রেখেছে। সম্ভবত বাংলাদেশের মুসলমানরাও ঐ একই মনোভাব পোষণ করে থাকেন। এই মনোভাবের সমর্থন পাওয়া যায় যখন বাংলাদেশী বেতার ও টেলিভিশন সেই সব অত্যাচারী মুসলমান শাসক ও সুফী দরবেশদের প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করে, যারা এককালে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের দ্বারা বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। সব থেকে বিচিত্র ব্যাপার হল

আজকের বাংলাদেশী মুসলমান সম্প্রদায় যে সমস্ত সুফী দরবেশ ও মুসলমান শাসকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এটা তাদের মাথায় আসে না যে এককালে ঐ সব লোকেরাই তাদের বাবা, কাকা বা ঠাকুরদার প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ধর্মান্ধতার দ্বারা চালিত হবার ফলে তাঁরা খেয়াল করছেন না যে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে তাঁরা একটি ছিন্নমূল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। জাপানী বনসাই'এ পরিণত হচ্ছেন। যে আরবের মরুভূমির দিকে আজকের বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় তাকিয়ে রয়েছেন তাঁদের অন্তত এটুকু চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তাঁরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বসবাস করছেন সেই দেশ ইসলামী জান্নাতের থেকেও অনেক বেশী শস্যশ্যামল।

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় আজ ইসলামের নামে যে আরব্য সংস্কৃতিকে দিনরাত অনুসরণ করে চলেছেন সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বর্তমান বৃটিশ নাগরিক জনাব আনোয়ার শেখ বলেন যে, ইসলামের নামে আরবীকরণ (Arabization) ভারতীয় মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি করেছে এবং ভারতীয় মুসলমানদের উচিত কোনমতেই তাদের জন্মলব্ধ আর্য সংস্কৃতিকে পরিহার না করা (Organiser-19/4/98) । উপরন্তু যে আরব্য সংস্কৃতিকে তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন তা যদি হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উন্নততর, মার্জিত ও পরিশীলিত হত এবং ঐ সংস্কৃতি অনুসরণ করে যদি শিক্ষা-দীক্ষা, বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মুসলমান সমাজের উন্নতি ঘটত তাহলে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে মুসলীম মহিলাদের মধ্যে, নিরক্ষরতা অত্যন্ত ব্যাপক। ভারতের মুম্বাই শহরে অবস্থিত Rahat Welfare Trust ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলছে, "This darkness makes a mockery of our freedom.......It is only the light of education that can banish this darkness created by ignorance." (Islamic Voice, Feb. 1998)।

শিক্ষা—মুসলিমদের অধিকার—নারীসমাজ :

পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থিত Ministeria. Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (CONSTECH)-এর

বর্তমান সভাপতি জনাব ওয়াসেম সাজ্জাদ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে OIC গোষ্ঠীভুক্ত ইসলামী দেশগুলোতে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ। সাজ্জাদ সাহেব বলেন যে, বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমান যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করে তা খুবই নগণ্য এবং পাশ্চাত্যের যে কোন বড় শহর থেকেও এর থেকে বেশী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। সমস্ত OIC-ভুক্ত দেশগুলোর এ ব্যাপারে অবদান সারা বিশ্বের ১ শতাংশ মাত্র। CONSTECH-এর মতে এ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বছরে ৪৭ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে ঐ খাতে খরচ করা হয় মাত্র ১ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার। (Islamic Voice, Feb. 1998)।

উপরিউক্ত তথ্যাদি থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, ইসলাম জনসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আশির দশকে বসিরহাট, হাসনাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছিল। পর পর পাঁচ বছর পদার্থবিদ্যার পরীক্ষক হিসাবে কাজ করার পর এটা আমাকে খুবই হতাশ করেছে যে ঐ পাঁচ বছরে মুসলমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। অথচ ঐ অঞ্চলে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন অধিবাসী মুসলমান। এটা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, এই অশিক্ষার কারণেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্য ও অপরাধ অনেক বেশী।

উল্লিখিত "Islamic Voice" মাসিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায় সম্পাদক জানাব A. W. Sadathulla Khan তাঁর "Intellectual Stagnation and Its Remedy" শীর্ষক সম্পাদকীয় কলামে বর্তমান মুসলীম সমাজের বৌদ্ধিক নিষ্ক্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের উপায়সমূহ আলোচনা করেছেন। সম্পাদক মহাশয় প্রথমেই বলছেন যে, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই হোক আর সমষ্টিগত দিক দিয়েই হোক, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মধ্যে একটা বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তিনি দুঃখ করে বলছেন যে, যেই মুসলীম সমাজ এককালে সারা পৃথিবীতে তাদের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছিল, সেই মুসলীম সমাজ আজ যেন তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে, ইসলামের ভাবাদর্শ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অন্তিম ও সর্বাধুনিক বাণীর মালিক হয়েও মুসলমানরা সে বাণীকে কার্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাঁর ইসলামী মনস্তত্ত্ব খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ

করেছেন বা যে দেশে তিনি জীবনধারণ করছেন, সেই মাতৃভূমি তাঁর কাছে বড় নয়, বড় হল মুসলীম সমাজ, মুসলীম কওম। তাই দেশের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত নন, তিনি গৌরবান্বিত তাঁর কওমের গৌরবে, তাঁর উম্মার গৌরবে। তিনি আরও গৌরবান্বিত এই কারণে যে, পরমেশ্বরের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক বাণী একমাত্র তাঁরই কওমের হস্তগত।

যাই হোক, মুসলীম সমাজের বর্তমান অনগ্রসরতার মূল খুঁজতে গিয়ে তিনি দুটো কারণ সনাক্ত করেছেন। প্রথম কারণটি হল, "The ailment of Taqlid (blind following), both at the level of the regilious Scholars as well as at that of the masses". তকলিদ বলতে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, মুসলীম্ উম্মা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত এবং সেই কারণে মুসলীম আলিমরাও নিজ নিজ দল উপদলের মতের প্রতি অত্যন্ত গোঁড়া অনুরক্ত। তারা মনে করে যে, একমাত্র তাদের দলের বিধানই কোরান ও সুন্নাহ্ সম্মত, একমাত্র তাদের ব্যাখ্যাই কোরান হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা। এই মনোভাব থেকে জন্ম নিচ্ছে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাধারণ মানুষও সঙ্কীর্ণ ধ্যানধারণায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে এবং এর ফলেই বৌদ্ধিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সম্পাদক মহাশয় বলেছেন, "A complete disregard of the role of human intellect in matters of religion." একে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "Since using one's intellect in understanding religion has long been done away with, the Qur'an is read but not understood. Its greatest utility was providing guidance to mankind; now it is mainly used for reciting for the dead." এখানে সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না যে কোরানের মধ্যে কোনরকম প্রগতিবিরোধী কথা আছে। কোরান ঠিকই আছে কারণ তার ঘাড়েও একটাই মাথা আছে। শুধু লোকে বোঝার ভুল করছে। যে সত্যটি সম্পাদক মহাশয় বলতে পারেননি, তা হল, সে সমাজে মুক্তচিন্তা বাধাপ্রাপ্ত ও নিষ্পেষিত, যে সমাজে চিন্তাকে শুধু কোরান ও সুন্নার খাত দিয়েই বইতে হবে, সে সমাজের বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব রোধ করবে কে? বৌদ্ধিক দিক থেকে যে সমাজের প্রতিটি মানুষ শৃঙ্খলিত জেলের কয়েদী সে সমাজের পক্ষে সামনে অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত। আল্লার যে সর্বাধুনিক বাণীর জন্য সম্পাদক মহাশয় গর্বিত, সেই অত্যাধুনিক বাণীর উদ্দেশ্যই হল সমগ্র মুসলীম সমাজকে মধ্যযুগে দাঁড় করিয়ে রাখা, অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা এবং সমস্ত কল্যাণকর দিক থেকে মানুষের চিন্তাকে স্তব্ধ করে শুধু জিহাদ, গনিমতের মাল ও পরনারীকে

কলুষিত করার দিকে ধাবিত করা। যে তত্ত্ব মানসিক, চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে গুরুত্ব দেয় না, সে তত্ত্ব মানুষকে অন্ধকারেই রেখে দেয়, আলোর পথ দেখায় না।

একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলে কি কি বিশেষ অধিকার অর্জন করে? প্রথমত নিজের এক দুর্বোধ্য আরবী নাম রাখার অধিকার। দ্বিতীয়ত কোন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করার অধিকার। তৃতীয়ত একসঙ্গে চারজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার এবং তিনবার "তালাক" উচ্চারণ করে যে কোন স্ত্রীকে যে কোন সময় বিতাড়িত করার অধিকার। এর পর আছে নারীকে পর্দাবৃত করে গৃহবন্দী ও নিরক্ষর করে রেখে একটা নিরক্ষর সমাজের ভিত্তি পাকা করার অধিকার। যদিও পৃথিবীর অনেক ইসলামী দেশেই উপরিউক্ত অধিকারগুলোর অনেকগুলোকেই আইন দ্বারা রদ করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, ভারতের শাসকবর্গ এর সব অধিকারগুলোকেই টিকিয়ে রেখেছে। কারণ ভারতের একশ্রেণীর রাজনীতিকরা মুসলমান সমাজকে ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্বেষী মৌলবীদের দ্বারা চালিত একটি অজ্ঞ ও নিরক্ষর ভোট দেবার যন্ত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার আর একটি অন্যতম কারণ হল নারীজাতিকে পর্দার খাতিরে গৃহবন্দী করে রেখে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। এবং এটা ধ্রুব সত্য যে শিক্ষিত মায়ের সন্তান কখনও অশিক্ষিত নিরক্ষর থাকতে পারে না।

কোন্ সমাজ মাথাপিছু কত কাগজ ব্যবহার করে সেটা যেমন সেই সমাজের শিক্ষাদীক্ষার অগ্রসরতার পরিচায়ক, তেমনি কোন্ সমাজ নারীজাতিকে কতটা সম্মান করে সেটা সেই সমাজের সভ্যতা, শালীনতা ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। কোরান বলছে, "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর এই শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থব্যয় করে" (৪/৩৪)। কিন্তু কথা হল, একজন পুরুষ টাকা খরচ করে অনেক কিছুর উপরই অধিকার অর্জন করে যেমন স্থাবর সম্পত্তি, ক্রীতদাসী, বারবণিতা, রক্ষিতা, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। কাজেই উপরিউক্ত বাণীর দ্বারা আল্লাহ্ নারীজাতিকে এর থেকে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমামণ্ডিত করেছেন কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। নারী যদি নিজে উপার্জন করতে সক্ষম হয় এবং তার জন্য পুরুষের টাকা খরচের প্রয়োজন না হয় তাহলে কেমন করে আল্লাহ্র বাণীর যথার্থ্য রক্ষা হবে তাও সুধী জন বিচার করবেন। উপরন্তু ইসলামী স্বর্গে নারী জাতিকে যতখানি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এই সব কথার অবতারণা এইজন্য যে, যে সংস্কৃতি বা তত্ত্ব নারীজাতিকে সম্মান

করতে শেখায় না, তা মানুষকে সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য তো করেই না বরং অধঃপতন ঘটায়।

ইসলামী শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে বিধর্মী নারী গনিমতের মাল মাত্র। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন-এর "লজ্জা" উপন্যাসে বর্ণিত মায়াকে গনিমতের মাল হিসাবেই অপহরণ করা হয়েছিল এবং উক্ত কাজে ইসলামী শাস্ত্রের সমর্থন থাকার ফলেই অপহরণকারীদের মনে কোন পাপবোধ ছিল না। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে একজন "মুস্তাহেল"-এর মাধ্যমে পুনরায় গ্রহণ করার যে রীতি মুসলীম সমাজে আছে সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir বলেন, "Many lovers or gallants cause less shame to a woman than one Mostahel." এই সব প্রসঙ্গে সব সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল সেই পশুপালক আরব্য সমাজে, যেই সমাজে পিতার মৃত্যুর পর ছেলে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মত পিতার হারেমেরও মালিক হত। মহানবী তাঁর ৫২ বছর বয়সে ৯ বছরের শিশু আয়েষাকে বিবাহ করে নারী জাতিকে কতখানি মহিমান্বিত করেছিলেন তাও সুধীজনের বিচার্য। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর "নির্বাচিত কলাম"-এ লিখেছেন, " প্রসটেটের পরিবর্ধন এবং তার প্রতিকার আমার বিষয় নয়। আমার বিষয় প্রসটেট হঠাৎ রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে ষাট-সত্তর বছরের সেই সব বুড়ো পুরুষ, যারা কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, অনেকে এই বিয়েকে ন্যায়সঙ্গত করবার জন্য নানা রকম যুক্তি তৈরি করেন। যেমন বুড়ো বয়সে যত্ন করার কেউ নেই অথবা আমাদের রসুলুল্লাহ নবী দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন ইত্যাদি।"

আরব্য বা ইসলামী ধারা অনুসরণ করেই ভারতের মুসলমান শাসকরা এবং তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা হারেম তৈরি করতো এবং এই সব হতভাগিনী হারেমবাসিনীরা যে কি মানমর্যাদা পেত একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে আফজল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন তখন তিনি তাঁর হারেমের ৬৩ জন বিবিকে কোতল করে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফজলের মনে সন্দেহ ছিল যে তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না। তাঁর অবর্তমানে তাঁর বিবিরা পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হবে এটা আফজলের সহ্য হয়নি। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বিবি অবশ্যই পাওয়া যাবে।

এই ইসলামী ধারা অনুসরণ করেই উগাণ্ডার শাসক ইদি আমিন এক বিশাল হারেম তৈরি করে। ঐ হারেমে সবশুদ্ধ কতজন বিবি ছিল তা সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না কারণ কিছুদিন পর পরই আমিন পুরানো বিবিদের কোতল করে নতুন বিবি নিয়ে আসত। শৃঙ্খলিত রোরুদ্যমানা সেই সব বিবির প্রাসাদ থেকে

কোতলখানায় নিয়ে যাবার বিবরণ পড়লে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। সেই ইদি আমিন যখন সৌদি আরবে রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের জন্য যোগ্য বিবেচিত হল তখন এটাই প্রমাণিত হল যে উপরিউক্ত কাজকর্মের দ্বারা সে আর যাই করে থাকুক, ইসলামের অমর্যাদা করেনি। মহম্মদের নাতি এবং আলি-ফতেমার পুত্র হজরত হাসান সামনের দরজা দিয়ে নতুন বিবি নিয়ে আসতেন এবং পিছনের দরজা দিয়ে সমসংখ্যক বিবিকে তালাক দিয়ে বিদায় করতেন এবং এইভাবে ৭০টি (মতান্তরে ৯০টি) তালাক দিয়ে ''তালাকের খলিফা'' খ্যাতি অর্জন করেন। এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এরকম একজন লোকের মৃত্যুকে স্মরণ করে শিয়াপন্থী মুসলমানরা শোকের উৎসব মহরম পালন করেন অথবা ''বিষাদ সিন্ধু'' গ্রন্থ লেখা হয়।

পূর্বোল্লিখিত "Islamic Voice" মাসিক পত্রিকার গত ডিসেম্বর, ১৯৯৮, সংখ্যায় শ্রমতী সাফিয়া ইকবাল নামে একজন স্বনামধন্য লেখিকার, "Muslim Women–Crushed, Suppressed, over Worked" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "In the name of purdah and family status, she is kept chained indoors while purdah or "hijab" is actually meant for outdoors. She is consigned to a life of dull, drab drudgery while Islam grants her a balanced, spiritually rich and socially active life." অর্থাৎ পর্দা ও পারিবারিক অভিজাত্যের খাতিরে তাকে (মুসলীম মাহিলাকে) ঘরে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়, যদিও পর্দা বা হিজাব (বোরখা) বাইরে ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট। তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নিরানন্দ, নীরস ও একঘেঁয়ে এক গ্লানিময় জীবনযাত্রা, যদিও ইসলাম তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, সামজিক দিক দিয়ে কর্মঠ এক সুসমঞ্জস জীবন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, সব মুসলীম লেখক বা লেখিকাকে প্রথমেই এটা বলে নিতে হয় যে, ইসলাম বা কোরান হাদিসে যা আছে তার থেকে উন্নততর আর কিছু হতে পারে না। তাই যা কিছু খারাপ তার উৎস হল প্রয়োগের ভুল।

শ্রীমতী ইকবাল আরও লিখছেন, "She still does not have the right to reject her parents' choice of a partner or to insist on her own choice. The "Mehr" or bridal gift is turned into a "Status-symbol" and mockery and never given to her" .... "Hadees calls her the "delicate crystal", but this delicate Muslim woman is loaded with innumerable burdens which man would never bear, child birth, violence, illiteracy, denial

of rights, physical and mental torture, subjugation, mal-nutrition, financial problems, over-work, miscarriage due to weakness"

প্রবন্ধের শেষে উপসংহার হিসাবে শ্রীমতী ইকবাল লিখছেন, "Unless and until, the women are given their rights in practice, Muslims can never develop as a community even if "all the kings men" shout themselves hoarse about women's glorious status in Islam". অর্থাৎ-ইসলাম নারীজাতিকে যার পর নাই গৌরবান্বিত করেছে, এই কথা বলে ইসলামের কর্তাব্যক্তিরা যতই চেঁচান না কেন, তাতে কোনই ফল হবে না। যতদিন না মুসলীম নারীজাতিকে কার্যক্ষেত্রে তার অধিকার দেওয়া হচ্ছে, ততদিন মুসলমান সমাজও নিজেকে একটি অগ্রসর সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

বহু হাজার বছর আগে বৈদিক যুগেও ভারতীয় সমাজে নারীজাতির কি স্থান ছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কোলকাতার বিখ্যাত গ্রন্থকার জনাব আব্দুল আজিজ আল আমান সাহেব তাঁরই প্রতিষ্ঠান ‘‘হরফ প্রকাশনী’’ দ্বারা প্রকাশিত ‘‘ঋগ্বেদ সংহিতা’’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন, ‘‘সমাজে স্ত্রীজাতির বিশেষ সম্মানের আসন ছিল। স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন।....... স্ত্রীগণও যে ঋষির সমপর্যায়ে এসে বেদের মন্ত্র সঙ্কলন ও রচনার অধিকারিণী ছিলেন তার প্রমাণ পাই (ঋগ্বেদের) পঞ্চম মণ্ডলের আঠাশ সূক্তে, এ সূক্তের রচয়িতা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী। এই সঙ্গে অত্রির দুহিতা অপালা, কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা এবং ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণীর নাম স্মরণযোগ্য। কয়েক হাজার বছর পূর্বে স্ত্রীজাতির এই সম্মানীয় অধিকার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।’’

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের হিন্দু সমাজে নারীর এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানদের দ্বারা অপহৃত হবার ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ঘরে বন্দী করে রাখা এবং খুব অল্প বয়সে পাত্রস্থ করার রীতি চালু হয় এবং ঐ একই কারণে রাতের অন্ধকারে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ খুব কম হবার জন্য সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান এখনও দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর ‘‘নির্বাচিত কলাম’’-এ হিন্দু সমাজেও নারী নির্যাতনের অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন, এমন কি বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেও দৃষ্টান্ত দিতে ছাড়েন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একটি মস্ত ভুল করেছেন। হিন্দু সমাজ যে, সময়ের সঙ্গে নিজেকে সময়োপাযোগী করে নেবার স্বাধীনতা ভোগ করে এবং সময়োপযোগী করে নেয় সেটা শ্রীমতী নাসরিন খেয়াল করেননি।

উপনিষদ, গীতা, মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে আছে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণরাই শিক্ষাদানের অধিকারী। সেই অনুসারে আজ যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকের চাকুরি শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই সুরক্ষিত রাখা হয় তবে তা হাসির ব্যাপার হবে। মনুস্মৃতিতে যে আসুর বিবাহের বিধান আছে আজ কোন হিন্দু তা করলে তাকে নারী অপহরণের দায়ে জেল খাটতে হবে। মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে যে কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহের প্রথা ছিল, আজ তা শুধু নিষিদ্ধই নয়, আইনত অপরাধ। সেই রকম কোন নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়াও আজ আইনত অপরাধ। কিন্তু মুসলমান সমাজের অসুবিধা হল, সময়োপযোগী করে নেবার কোন সুযোগ সেখানে নেই। কোরান বা হাদিসে যা একবার লেখা হয়েছে তার উপর কলম চালাবার বা তাকে লঙ্ঘন করার অধিকার কারও নেই। মহানবী শেষ নবী, তাই আর কোন নবীও জন্মাবে না এবং কোরান হাদিসের কোন পরিবর্তনও হবে না। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর নিজের গ্রন্থেই লিখেছেন যে, কেমন করে একজন নারী নির্যাতনকারী হাসতে হাসতে তাঁকে কোরান খুলে "স্ত্রী শস্যক্ষেত্র" আয়াতটি দেখিয়ে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।

ইসলামে একেশ্বরবাদ

অনেক মুসলমান পণ্ডিত আবার এটা বলতে চান যে, ইসলামের মধ্য দিয়ে তাঁরা গৌরবময় একেশ্বর আল্লাহ্‌র ভজনার রাস্তায় চলেছেন যা হিন্দুর বহু দেবদেবী আরাধনার পথ থেকে বহুগুণ উৎকৃষ্ট। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল আজিজ আল আমান সাহেব পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখছেন, "সুপ্রাচীন কালে সরল আর্যগণ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই বেদে অগ্নি, বায়ু, পূষা ত্বষ্টা, সোম, সূর্য, উষা, সরস্বতী, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যগণই উপলব্ধি করলেন যে, প্রকৃতির সকল কাজই একই নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা এসব কিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন ঃ "এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই।" শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত এবং "হরফ প্রকাশনী" দ্বারা প্রকাশিত "কোরআন শরীফ" গ্রন্থের ভূমিকায় জনাব আল আমান সাহেব আবার লিখছেন, "একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরও ব্যাপক ও গভীর। শঙ্কর ভাষ্যমতে যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাই উপনিষদ।..... সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোরান শরীফ অবতীর্ণ হবার অনেক আগেই একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল, আল আমান সাহেব ইসলামের

একেশ্বর আল্লাকে উপনিষদের সর্বেশ্বর ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করলেও আল আমান সাহেব সঙ্গত কারণেই তাঁর অন্তরের চাহিদা ও দার্শনিক ক্ষুধা উপনিষদ থেকেই মেটাতেন। (বর্তমান লেখকের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিক চেতনায় অগ্রসর সমস্ত শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানই তা করে থাকেন।) তাই তিনি তাঁর "কাবার পথে" গ্রন্থে লিখছেন, "নিখিলের সবত্র অণুতে-পরমাণুতে.আল্লাহ্‌ আছেন" (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬)। আবেগে আপ্লুত হয়ে আল আমান সাহেব উপনিষদের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এর প্রেরণায় উপরিউক্ত মন্তব্য লিখে ফেলেছেন, কিন্তু খেয়াল করেননি যে, ঐ লাইনটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছেন। প্রথমত ইসলামী মতে এই বিশ্বসংসারে যা আছে তা সবই আল্লাহ্‌র কিন্তু তারা আল্লাহ্‌ নয়। বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "Islamic Voice"-এর ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সংখ্যায় ডঃ জাকির নাইক এই বিষয়টিকেই একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুর সর্বেশ্বরবাদ ও ইসলামের একেশ্বরবাদের মধ্যে মূল প্রভেদ হল এই যে, হিন্দু মতে এই বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি অণু-পরমাণু সবই পবিত্র, সব কিছুতে ঈশ্বর আছেন, এবং আরও ব্যাপক অর্থে সমস্ত কিছুই ঈশ্বর, কিন্তু ইসলামী মতে সবকিছু ঈশ্বর নয়, সব কিছুই ঈশ্বরের —"Muslims therefore believe that everything is God's, i.e. God with an apostrophe's'. .... Thus the major difference between the Hindu and the Muslim beliefs is the difference of the apostrophe's.' The Hindus say that everything is God. The Muslims say everything is God's.

দ্বিতীয়ত উপরিউক্ত উক্তির ফলে আল আমান সাহেব স্বীকার করে নিয়েছেন যে, একজন কাফেরের শরীরের অণু-পরমাণুতেও আল্লাহ্‌ আছেন এবং তাই সে আর বধযোগ্য হতে পারে না। শুধু তাই নয়, সেই কাফের যে সব মূর্তির পূজা করে, সেই সব মূর্তির অণু-পরমাণুতেও আল্লা আছেন। কাজেই একজন মুসলমানেরও উচিত সেই মূর্তিকে সিজদা করা। উপরন্তু তিনি, আল্লাহ্‌র দৈর্ঘ-৬০ হাত, তাঁর মুখাবয়ব মানুষের মত, তিনি নিজের আদলে প্রথম মানব হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন, ইত্যাদি ইসলামী সিদ্ধান্তগুলোকে অস্বীকার করে মোরতাদ হয়েছেন।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় মনীষা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নশ্বর এবং ভৌতিক ও ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য জগতের পিছনে যে শাশ্বত সত্য আছে তারই অনুসন্ধান করেছে। ভারতের সাধকরা জাগতিক সুখদুঃখের অতীত যে চির আনন্দময় ব্রহ্মানুভূতি আছে তা লাভ করার জন্যই তপস্যা করেছে। তাঁরা তপস্যার দ্বারা এই সত্যই আবিষ্কার

করে গেছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক ভোগসুখ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়ে, ইন্দ্রিয় দমনের মধ্য দিয়েই সেই চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্ভব। জাগতিক সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী, তার আদি ও অন্ত আছে, তাই তা নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য —"আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।"

যদিও আল আমান সাহেবের কোন পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি আজ আরবী নামধারী একজন মুসলমান, কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসা এই ত্যাগের সংস্কার তাঁর ধমনীতেও ফল্গু নদীর মতই বয়ে চলেছে। তাই ইসলামী স্বর্গের চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নারীসম্ভোগকে তিনি আধ্যাত্মিকতার চরম পুরস্কার বলে মেনে নিতে পারেননি। "কাবার পথে" গ্রন্থে তিনি তাই আল্লার কাছে প্রার্থনা করছেন, "আমি বেহেশত চাই না, বেহেশতি খাদ্য চাই না, হূর চাই না। আল্লাহ্, আমি শুধু আপনাকে চাই।" এ তো আল আমান সাহেবের কথা নয়, এ তো কঠোপনিষদের নচিকেতার কথা। নচিকেতাকে ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য যম যখন বললেন, "পৃথিবীতে যা যা কাম্য ও দুর্লভ বস্তু আছে তা প্রার্থনা কর। এই যে সুখদায়িনী সুন্দরী অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করে আছে, এই রকম রমণী মানুষের মধ্যে লভ্য নয়, তুমি এদের দ্বারা তোমার সেবা করাও।" তখন নচিকেতা বলল,

শ্বোভাবা মর্তস্য, যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।। (১/১/২৬)

—অর্থাৎ, " হে যমরাজ আপনার ভোগ্যবস্তুসমূহ কাল থাকবে কি না তা অনিশ্চিত। উপরন্তু এরা মানুষের ইন্দ্রিয়সকলকে ক্ষয় করে, তেজ নষ্ট করে। যেহেতু সকলেরই জীবন স্বল্প তাই রথ, অপ্সরা ও তাদের নৃত্যগীত আপনারই থাকুক।" কাজেই আল আমান সাহেবের অন্তিম চাওয়া যে একজন ভারতীয় ভক্তের অন্তিম কামনা, "ত্বমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে", তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু আল আমান সাহেবই নন, বিশাল এই ভারত উপমহাদেশের একজন মুসলমানের পক্ষেও কি বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা সম্ভব? বিগত হাজার হাজার বছর ধরে এই সব গ্রন্থই তাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই সব গ্রন্থেই তাদের প্রকৃত পরিচয় লেখা আছে, আরবের কোন গ্রন্থে নয়। তাই দিল্লীর বিখ্যাত রামায়ণ গান মঞ্চস্থকারী আমির রেজা হুসেন বলেন, "The legacy of Ramayana be-

longs equally to the Muslims as to the Hindus" (Organiser : 19.4.98)।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল তারা আজ এসব কিছুই অস্বীকার করতে উদ্যত। কিন্তু ছেলে মাকে অস্বীকার করলে কি মা পর হয়ে যায়? ছেলের মতিভ্রম হলে মা পর হয়ে যায় না, মা মা-ই থাকে। এটাই প্রকৃত সত্য যে, শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিরাই ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষ, মুসা, ইব্রাহীম বা লুতের মত নিরক্ষর পশুপালকরা নয়। এটাই সত্য যে ব্যাসদেব, বাল্মীকি বা কালিদাসরাই তাদের কবি; কণাদ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির বা ব্রহ্মগুপ্তরাই তাদের বিজ্ঞানী; কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ ও মহাবীরের মত পুরুষরাই তাদের সম্মানীয় ব্যক্তি, আরবের লোকেরা নয়।

দিল্লীর একটি মুসলীম সংস্থা Indian Islamic Council, জনাব হিসামুল ইসলাম সিদ্দিকি যার সভাপতি, এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে "Islamic Heritage : Indian Dimension" নামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ঐ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত মুসলীম বিদ্বান ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ রফিক জাকারিয়া ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান নেতৃত্বকে দোষারোপ করে বলেন যে ঐ সব নেতারা মুসলমানদের ভুলপথে চালিত করছে এবং হিন্দু সমাজের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে তুলছে। তিনি বলেন, "Indian Muslims had remained alienated from the Hindus, whose good will was essential for their economic uplift and educational advancement." ডঃ জাকারিয়া আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের ৩৬ শতাংশ শহরে বসবাস করে এবং এরা সবাই শহরে বস্তিবাসী। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার ফলেই মুসলমান সমাজের এই দুর্গতি বলে তিনি উল্লেখ করেন। (Islamic Voice, March,98) ।

সব মুসলমান পণ্ডিতই এই দাবি করেন যে, নবী মহম্মদ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কথা না বললে তাদের গর্দান যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, নবীকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে টিকিয়ে রাখতে প্রতি বছর বেশ কিছু গ্রন্থকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হয় এবং বেশ কিছু কুৎসাকারীকে কোতল করতে হয়। অপরদিকে ভারতবর্ষ যে সব মহামানবদের শ্রদ্ধাভক্তি করে, পুরষ্কার ঘোষণা করলেও তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করার জন্য কুৎসাকারী পাওয়া মুশকিল হবে। পূর্বোল্লিখিত "হরফ প্রকাশনী" দ্বারা প্রকাশিত "হাদিস শরীফ" গ্রন্থের সম্পাদক জনাব রফিকুল্লাহ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন, "প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কোরান শরীফ হল এক অসীম জ্ঞানভাণ্ডার।" একথা না লিখলে হয়তো তাঁর গর্দান যাবে, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা

হয় যে তিনি কোন্ কোন্ জ্ঞানের কথা বলতে চাইছেন। তিনি কি সেই সব জ্ঞানের কথা বলতে চাইছেন যেখানে আল্লাহ্ বলছেন যে তিনি ছয়দিনে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন অথবা আকাশ একটি কঠিন ছাদ যা তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতের সাহায্যে কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, অথবা জলের উপর বসানো নড়বড়ে মাটিকে পাকাপোক্ত করতে তিনি পাহাড়-পর্বতকে পেরেক হিসাবে ব্যবহার করেছেন, অথবা আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছরে আগে হজরত আদমও মা হাওয়াকে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে মানুষের সূত্রপাত করেছেন অথবা আল্লার স্ত্রী নেই ইত্যাদি। বর্তমান লেখকের জানা নেই যে, বাংলাদেশসহ অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোরান-বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বই পড়ানো হয় কি না। তবে স্মরণ করা যেতে পারে যে এককালে মুতাজিলা সম্প্রদায় কোরানের অনেক কিছুই বিশ্বাস করত না। এমন কি কোরানকে স্বয়ং আল্লার বাণী বলা অথবা নবীর মেরাজ ভ্রমণকে সত্য ঘটনা বলা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরানের সঠিক ও বাস্তব মূল্যায়ন করলে এটাই প্রমাণ হবে যে, ঐ গ্রন্থ ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষবাষ্পে এই উপমহাদেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করেছে এবং ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঐ গ্রন্থ তার অনুগামীদের মধ্যে আরব্য পশুপালক সংস্কৃতির বর্বরতা ও নৃশংসতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং তার রক্ত- পিপাসু আহ্বান ভাইকে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে প্ররোচিত করেছে এবং সেই প্ররোচনা শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতী রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে দেশ জননীতে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। বিদেশী মুসলমান শাসকরা উক্ত গ্রন্থ ও ইসলামের মধ্য দিয়ে এই দেশের কিছু সংখ্যক মানুষকে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগে তা পরিণতি লাভ করেছে। তাই দিল্লীর বুদ্ধিজীবী এবং "Organisation of Indian Muslims for Change" নামক সংস্থার সভাপতি জনাব সুহাইল সিদ্দিকী সাহেব লিখছেন, "বিদেশী মুসলমান শাসকরা তাদের ধর্মান্ধ মৌলবীদের সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের ভারতীয় মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে।" (Organiser 18.1.1998)।

দেশভাগের বেদনা ও আক্ষেপ থেকে পাকিস্তানের সাংবাদিক জনাব জাফর আদিম সাহেব লিখছেন, "It (Pakistan) was conceived in Jinnah's puffs of cigarette. There is therefore heat in its every make up. Pakistan was created by a man who was boastful of his suit, boot and tie..... Pakistan is the parting kick of a Europeanised founder who sounded the death knell of Indian Muslims." আদিম সাহেব আরও লিখছেন, "We have never been able to understand that, if even fifty years were not sufficient to make Pakistan fit for receiving a per-

fect Islamic system, then where was the need to create it at all? Even now it is not too late to revert to the old country. If the Islamic system connot be enforced, then why not we go back to the original position, the United India? There is still a heart warming and soul stirring call from across the border devoid of any sectarian heat." অর্থাৎ, আমাদের এটা বোধগম্য হয় না যে, পঞ্চাশ বছরেও যদি পাকিস্তানকে প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা না যায় তবে পাকিস্তান সৃষ্টির কিই বা প্রয়োজন ছিল? যদি ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা নাই যায় তবে কেন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভারতের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব না? সঙ্কীর্ণতা-বর্জিত সীমান্তের ওপার থেকে আজও অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদয় আলোড়নকারী উদাত্ত (পুনর্মিলনের) আহ্বান ক্রমাগত ভেসে আসছে।

অ-বিভক্ত ভারত সম্বন্ধে আদিম সাহেব লিখছেন, "The great land of India is a wonderful gift of God, made fertile and creative by nature in every respect. It is a cradle of a variety of religions and beliefs and a shining example of unity in diversity which our Mumalkate-Khudad lacks."—অর্থাৎ "উর্বরা ও স্বভাবত সৃজনশীল মহান দেশ এই ভারতবর্ষ সব দিক থেকেই পরমেশ্বরের এক অনন্য সুন্দর দান। এই দেশ বহু ধর্ম ও বহু বিশ্বাসের এক মহামিলন ক্ষেত্র এবং বহুর মধ্যে ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যা আমাদের এই মুমালকত-এ-খুদাদ-এ অনুপস্থিত" (Organiser 18.1.1998)।

এক সময় বেবীফুড তৈরি করার কোম্পানীগুলো এই মিথ্যা প্রচার করত যে, শিশুকে স্তন্য পান না করিয়ে বেবীফুড খাওয়ানো উচিত, কারণ তা শিশুর পক্ষে বেশী স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সেই মিথ্যা প্রচারকে স্তব্ধ করতে আজকের ডাক্তাররা বলছেন, যে গরুর দুধ দিয়ে বেবীফুড তৈরি হয়, প্রকৃতিতে সেই গরুর দুধের সৃষ্টি হয়েছে গরুর বাছুরের জন্য, মানব শিশুর জন্য নয়। সেই হিসাবে এটাও ধ্রুব সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে আরবের বেদুইনদের জন্য, সভ্যতায় অগ্রসর ভারতবাসীদের জন্য নয়। কাজেই যে সমস্ত ইসলামী নেতা বা ধর্মগুরুরা ইসলামের মধ্য দিয়ে আরব্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার কথা বলছেন বা আরব্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন তাঁরা ঐ বেবী ফুড তৈরির কোম্পানীগুলোর মতই ভ্রান্ত কথা বলছেন এবং ভ্রান্ত পথে চালিত করার চেষ্টা করছেন। যে সংস্কৃতি বলে, কোন মুসলমান পাহাড় প্রমাণ পাপ করলেও শুধু মুসলমান হওয়ার জন্যই ঈশ্বরের ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাবে, যে সংস্কৃতি পরের দ্রব্য লুঠপাট করতে এবং পরস্ত্রীকে কলুষিত করতে প্রেরণা যোগায়, সে সংস্কৃতি কোনদিন মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক কোন উন্নতিই করতে সক্ষম কি না তা সুধীজনের বিচার্য। যে সংস্কৃতিতে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের দ্বারা আল্লার

সৃষ্টির নকল করা জঘন্যতম অপরাধ এবং তাই তা শুধু ভাঙবার জন্য, গড়বার জন্য নয় অথবা যে সংস্কৃতিতে সঙ্গীতচর্চা করা শয়তানের কাজ, সে সংস্কৃতি মানুষকে সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে না পিছনের দিকে চালিত করে তাও সুধীজনেরা বিচার করবেন।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

—অর্থাৎ, উত্তর থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত যে ভূ-ভাগ, তাই ভারতবর্ষ। কাজেই ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারা ভাগ করলে তার কিছু যায় আসে না। এই ভূ-ভাগে যেই জন্মগ্রহণ করবে সেই ভারতমাতার সন্তান। বৃটিশ যখন ভারতে এসেছিল তখন ভারতবর্ষ ৬৬০টি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু আজ তা ইতিহাস হয়ে গেছে। তাই এটাও অবধারিত সত্য যে, আজ যে সব সীমারেখার দ্বারা ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়েছে তাও একদিন ইতিহাসে পরিণত হবে। এর জন্য কামান, বন্দুক, গোলাগুলি ও রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রেম, মৈত্রী ও উদার ভ্রাতৃত্বের দ্বারাই সেই ঐক্য স্থাপিত হবে। তখন উদারতা ও বিশ্বভাতৃত্বের পীঠস্থান এই ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী, ভারতমায়ের সকল সন্তান আবার মিলিত হবে। সকলে একসঙ্গে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার; গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ও গোবিন্দের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হবার গৌরব অনুভব করবে। বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত দর্শনের; দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের, মহানুভব রাজা শিবির, সর্বত্যাগী বুদ্ধ, চৈতন্য ও শঙ্করের ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারী হবার গৌরব অনুভব করবে।

বিদেশী মুসলমান শাসকরা এই দেশের বহু মন্দির ধ্বংস করেছে এবং বহু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। আজ সেই সব ব্যাপার নিয়ে খুবই হৈ চৈ হচ্ছে। মসজিদগুলোকে আবার মন্দিরে পরিণত করার কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু যে সব কোটি কোটি জীবন্ত মন্দিরকে তারা মসজিদে রূপান্তরিত করে রেখে গেছে তারা আবার মন্দিরে রূপান্তরিত হবে কবে? ভারতমাতা সে দিনের জন্য আকুল আগ্রহে দিন গুণছে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর বৃটিশ পরাধীনতার অনেক চিহ্নই আজ মুছে ফেলা হয়েছে এবং হচ্ছে। বেঙ্গল বাংলাদেশ হয়েছে, ড্যাকা ঢাকা হয়েছে, কৃশনগর কৃষ্ণনগর হয়েছে, সেরামপুর শ্রীরামপুর হয়েছে এবং বার্ডোয়ান বর্দ্ধমান হয়েছে। তাহলে মুসলমান পরাধীনতার চিহ্নই বা কেন মুছে ফেলা হবে না? প্রকৃতপক্ষে আজকের আরবী নামধারী প্রত্যেকটি ভারতীয় মুসলমান সেই মুসলমান গোলামীর এক একটি চলমান স্মৃতিচিহ্ন। তাই আকবর, আলি বা ফজলের নাম কেন সমীর, মিহির বা তরুণ

হবে না ? আয়েশা, রাবেয়া বা আমিনার নাম কেন গায়ত্রী, সন্ধ্যা বা পূরবী হবে না? ভারতের নারী জাতি কেন আবার শাঁখা-সিঁদুরে সাজ্জিত হয়ে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে পাবে না? সর্বোপরি গোলামীর চিহ্ন যে ইসলামী সংস্কৃতি, তা কেন পরিত্যক্ত ও বর্জিত হবে না? যেদিন তা হবে সেদিনই দুই বাংলা আবার জোড়া লাগবে। ভারতমা আবার তার মহিমাময় অখণ্ডরূপ ফিরে পাবে এবং দেশজননী তার হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে আনন্দে চোখের জল ফেলবে। ভারতমাতার সকল সন্তান সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চালিত হবে এবং কবির প্রত্যাশা, "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে" পূর্ণ হবে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে বাসকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। একদিন মহাপ্রভূর ভোজনকালে সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ তাঁকে ব্যঙ্গ করে এবং বলে যে, যা দশজন লোক খেতে পারে তা একা এই সন্ন্যাসী খাবে? মহাপ্রভুর নিন্দা করার ফলে সার্বভৌম ও তাঁর স্ত্রী অমোঘের উপর ভীষণ রেগে যান এবং তার মৃত্যু কামনা করেন। ঈশ্বরের কি লীলা, সেদিন রাত্রেই আমোঘ কলেরায় আক্রান্ত হল। পরদিন সকালে খবর পাওয়া মাত্র দয়াময় মহাপ্রভু তখনই তাকে দেখতে ছুটে গেলেন এবং দেখলেন মৃতপ্রায় অমোঘ শয্যায় শায়িত। মহাপ্রভু তখন অমোঘের বুকে হাত রেখে বললেন, "হে অমোঘ, এই তোমার পবিত্র হৃদয় যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বসাবার কথা সেখানে মাৎসর্য চণ্ডালকে স্থান দিয়ে তুমি তা অপবিত্র করলে?" তারপর বললেন,

উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান।।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় অমোঘ উঠে দাঁড়াল—

শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিল।।

আজও শ্রীমন্মহাপ্রভু সবার অলক্ষ্যে সকল ভারতীয় মুসলমানের বুকে হাত রেখে ঐ একই কথা বলে চলেছেন—

সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।।
মাৎসর্য চ গুাল কেনে ইঁহা বসাইলা।।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।।

পরিশিষ্ট- ১

প্রাক-ইসলামী আরব

আরব শব্দের প্রকৃত অর্থ মরুভূমি। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে অতি প্রাচীনকালে আরব দেশ সাহারা মরুভূমির অংশ ছিল এবং আজও এ দেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে চলে মরুভূমির বহ্নুৎসব। "এখানে মাইলের পর মাইল কোথাও আল-দাহ্‌নার লাল বালির উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অনলবর্ষী কিরণ ধূধূ করে জ্বলছে, আবার কোথাও আল-নাফুদের সাদা বালি প্রখর সূর্যালোকে মরীচিকার মায়া বিস্তার করছে।"

আরব পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ এবং গোলার্ধের শুষ্কতম অঞ্চল। এর মোট আয়তন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা বর্তমান খণ্ডিত ভারতের প্রায় সমান (৩২.৮৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার)। কিন্তু লোকসংখ্যা খুবই কম, সমস্ত আবরভূমিতে মাত্র ২ কোটির মত মানুষ বসবাস করে, যা বর্তমান খণ্ডিত ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৪০ ভাগের এক ভাগ, এবং বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫ ভাগের এক ভাগ। পাকিস্তানের বর্তমান লোকসংখ্যাও প্রায় ১০ কোটি, তাই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মিলিত লোকসংখ্যার মাত্র ১০ ভাগের এক ভাগ মানুষ আরবে বসবাস করে। কাজেই বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যত মুসলমান বাস করে, আরবে বসবাসকারী মুসলমানের সংখ্যা তার মাত্র ২০ ভাগের এক ভাগ।

বর্তমান আরব ভূখণ্ড সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, কাতার ইত্যাদি ৮টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং নিচের সারণীতে এদের আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হল।

দেশের নাম	আয়তন (ব.কি.মি.)	লোকসংখ্যা	প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যা
(১) সৌদি আরব	২১,৪৯,৬৮৭	৮৩,৬৭,,০০০	৩.৮৮
(২) ওমান	৩,১০,৮০০	৮,৯১,০০০	২.৫৪
(৩) ইয়েমেন আরব রিপাব্লিক	২,০০,০০০	৬৪,৫৬,২০০	৩২.২৮
(৪) ইয়েমেন ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক	২,৮৭,৭৫২	৯,৬৯,০০০	৩.৩৬
(৫) সংযুক্ত আরব এমিরাত	৮৩,৬০০	১০,৪০,০০০	১২.৪৪
(৬) কুয়েত	১৬,৯১৮	১৩,৫৬,০০০	৮০.১৪
(৭) কাতার	১১,০০০	২,২০,০০০	২০.০০
(৮) বাহরাইন	৬২২	৩,৫৮,০০০	৫৭৯.০০
মোট	৩০,৬০,৩৭৯	২,০৬,৫৮,১০০	৬.৭৫ (গড়)

(উৎস : Standard World Atlas, Hammond, USA.)

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আরবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৬ থেকে ৭ জন মানুষ বাস করে যেখানে বর্তমান খণ্ডিত ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ২৫০ জন।

আরবের উত্তরে সীরিয়ার মরুভূমি এবং বাকী তিনদিকে লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর। তাই এর আর এক নাম জাজিরাতুল আরব বা আরব দ্বীপ। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এক কালে (জুরাসিক যুগ পর্যন্ত) আরব ভূখণ্ড আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে কোন প্রাকৃতিক কারণে (সম্ভবত উল্কা-পাতের ফলে) লোহিত সাগরের সৃষ্টি হয় এবং আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এই প্রাকৃতিক কারণেই আরবের সমস্ত পূর্বপার জুড়ে হেজাজ (দেওয়াল) পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লোহিত সাগরের প্রায় সমান্তরালভাবে এই পর্বত উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে সীরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপার বা বর্তমান লেবানন পর্যন্ত চলে গেছে। আসির নামে এই পর্বত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান এডেন বন্দর পর্যন্ত চলে গেছে এবং তার পর হাদ্রামত নামে তা দক্ষিণ উপকূল ধরে, ইয়েমেনের মধ্য দিয়ে, পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে।

আরবে বৃষ্টিপাত হতে পারে দুই ভাবে। প্রথমত ভূমধ্যসাগরের জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাসের দ্বারা, দ্বিতীয়ত ভারত মহাসাগরের মোসুমী বায়ুর দ্বারা। কিন্তু সীরিয়া, প্যালেস্টাইন ও লেবাননের পর্বতসমূহ ভূমধ্য সাগরের বাতাসকে আটকে দেয় বলে তা আর আরবে প্রবেশ করতে পারে না। ভারত মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ যে মৌসুমী বাতাস আরবের দিকে অগ্রসর হয়, হাদ্রামত পর্বতে ধাক্কা খেয়ে তা তার জলীয় বাষ্পের সবটাই ওখানেই ঢেলে দেয় এবং মূল আরব ভূখণ্ড তার বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে পরিণত হয়। ঠিক আমাদের পশ্চিমঘাট পর্বতে মৌসুমী বাতাস আটকে গিয়ে যা হয় তাই। এই কারণে আরবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। আমাদের বাংলায় যেখানে ৬০ থেকে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সেখানে আরবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ ইঞ্চিরও কম। মূল আরব ভূখণ্ডে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়।

আরব ভূখণ্ডের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল যে তা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে পারস্য উপসাগরের উপকূলে সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমে হেজাজ পর্বত লোহিত সাগরের গা থেকেই খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে, তাই সেখানে উপকূল ভূমি বলতে কিছু নেই। লোহিত সাগরের পার থেকে ১০০ মাইল পর্যন্ত ভূমির গড় উচ্চতা ২০০০ থেকে ৩০০০ ফুট এবং পরবর্তী প্রায় ৩৫০ মাইল নেজেদ উপত্যকা। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এককালে হেজাজ পর্বতে অনেক আগ্নেয়গিরি ছিল এবং তাদের উৎক্ষিপ্ত লাভাতেই নেজেদ উপত্যাকার সৃষ্টি হয়েছে। বহুদিন আগেই ঐ সব আগ্নেগিরি চিরতরে মৃত হয়ে গেছে। এই নেজেদ উপত্যকাই ক্রমশ ঢালু হয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য আরবভূখণ্ডে কোথাও কৃষিকাজ সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে পুরো আরব ভূখণ্ডই যে ধূ ধূ বালির মরুভূমি তাও নয়। উত্তরে নেফুদ ও দক্ষিণে

রাব-আল খালিই জন প্রাণী শূন্য বালুময় মরুভূমি। রাব-আল-খালির অর্থ জনবসতিহীন স্থান এবং এই মরুভূমির বিস্তৃতি এত বিশাল যে মানুষের পক্ষে তা অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, ১৯৩১ সালে বারট্রান্ড টমাস নামে একজন ইংরাজ তা সর্বপ্রথম অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এই দুই মরুভূমি ছাড়া আরও উত্তরে ত্রিকোণাকৃতি সীরিয়ার মরুভূমি যা ইরাক ও সীরিয়ার জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

এই মরুভূমিগুলিকে বাদ দিলে আরবের বাদবাকী ভূখণ্ড হল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরূদ্যান সমন্বিত মরু সদৃশ অঞ্চল। মরূদ্যানগুলোতে কুয়ো খুঁড়ে ভূ-নিম্নস্থ জলস্তর থেকে জল পাওয়া যায় এবং এই জল দিয়ে সেখানে কিছু চাষাবাদ হয়, যার মধ্যে প্রধান হল খেজুর। এই খেজুরই আরববাসীদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া সামান্য কিছু ফলমূল ও শাকসবজির চাষ হয়। একটু বড় আকারের ও সমৃদ্ধিশালী মরূদ্যানগুলিই ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। দুই মরূদ্যানের মধ্যবর্তী অঞ্চল শুষ্ক ও বন্ধ্যা এবং সেখানে শুধু জল ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন কাঁটা জাতীয় গুল্ম জন্মায়। হঠৎ বৃষ্টি হলে এই সব কাঁটা-গুল্ম সতেজ হয়ে ওঠে, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রখর সূর্যের তাপে তা শুষ্ক ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। মরুভূমি তার পূর্বরূপ ফিরে পায়।

এই মরু অঞ্চলে বেদুইন নামে পরিচিত যাযাবর জাতির লোকেরা বহু উপজাতি ও ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটা গোষ্ঠী এবং কয়েকটা গোষ্ঠী মিলে একটা উপজাতি তৈরি হয়। পশুপালনই হল এই বেদুইনদের প্রধান জীবিকা। পশুদের মধ্যে ভেড়া আর ছাগলই প্রধান এবং উট হল এদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। এইসব ছাগল ও ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি তাঁবুতেই এরা বসবাস করে। এইসব তাঁবু মেয়েরাই তৈরি করে নেয়। পশুর দুধ,মাংস, খেজুর, ময়দা এবং কখনও কখনও চাল এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এরা পশুজাত পণ্যের বিনিময়ে মরূদ্যান বা শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

চারণভূমির স্বল্পতা হেতু তার অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব চারণভূমি নির্দিষ্ট থাকলেও সচরাচরই তা লঙ্ঘিত হয়। বিশেষ করে যে বছর বৃষ্টি একেবারেই হয় না সে বছর বিবাদ চরমে ওঠে। যে টুকু ঘাস-গুল্ম জন্মায়, ছাগল, ভেড়া, উট তা দুদিনেই খেয়ে শেষ করে ফেলে, তাই নতুন চারণভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফলে কারও পক্ষেই সীমানা মেনে চলা সম্ভব হয় না এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর থেকেই জন্ম নেয় চরম ঘৃণা, আক্রমণ ও হত্যা।

একটা লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, যা কিছু ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, সবই নিজেদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূল আরব ভূখণ্ড কোনদিন কোন বৈদেশিক আক্রমণকারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, তাই কোন বিদেশীর সঙ্গে কোনদিনও

এদের যুদ্ধ করতে হয় নি। আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, কোন কেন্দ্রীয় শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা না থাকায় গোষ্ঠীগুলির অলিখিত নিয়ম কানুনই চূড়ান্ত আইন বলে গণ্য হত। প্রকৃতপক্ষে ঐ ছোট ছোট গোষ্ঠী এবং উপজাতিগুলিই ছিল এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমকক্ষ। তাই কোন গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে সেই গোষ্ঠী তথা গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্যই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম শর্ত।

কোন বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বা বিজিত না হবার ফলে এই জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য কোন বিদেশী জাতির সংমিশ্রণ হয়নি এবং তাই এই বেদুইনরা তাদের জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। কোন বৈদেশিক আক্রমণের মূল উদ্দেশ্যই হল আর্থিক লাভ। কিন্তু আরবভূমি এতই বন্ধ্যা এবং তার অধিবাসীরা এতই দরিদ্র যে, কোন বিদেশী আক্রমণকারীকেই তা প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তা ছাড়া জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে একটি অভিযান পরিচালনা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই পৃথিবী থেকে এক রকম বিচ্ছিন্নভাবেই চলে আসছিল অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত পাল্লা দিয়ে, শুধু জীবনধারণের জন্যই, কাঠোর পরিশ্রম আর অনিশ্চয়তায় ভরা এদের কঠিন জীবন সংগ্রাম।

মরুভূমির রুক্ষ্ম জলবায়ু এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কঠোর জীবন সংগ্রাম মরুবাসী বেদুইনদের কতগুলি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এরা যেমন একাধারে ভীষণভাবে অতিথিপরায়ণ, তেমনি বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতেও নির্মম। অতিথি সৎকারের বেলায় এরা এত দিল-খোলা যে অবলীলাক্রমে রাশি রাশি ছাগল-ভেড়া ও উট কোরবানি করে তার আপ্যায়ন করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই কারণে পরবর্তীকালে কোরান এদের অমিতব্যয়িতাকে নিন্দা করেছে এবং মিতব্যয়ী হতে উপদেশ দিয়েছে। অপর দিকে প্রতিশোধ স্পৃহা এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। খুনের বদলে খুন বা রক্তের বদলে রক্ত, এই মতে বিশ্বাসী। কেউ খুন হলে স্বাভাবিক ভাবেই নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের উপর তার বদলা নেবার দায়িত্ব এসে পড়ে। যতদিন না সেই ঘাতককে বা ঘাতকের পরিবারের কাউকে বা নিদেনপক্ষে ঘাতকের গোষ্ঠীর কাউকে খুন করে বদলা নেওয়া হচ্ছে ততদিন তারা মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করে রাখে। অনেক সময় গোষ্ঠীপতিরা মিলে উট বা অন্য কোন মূল্যবান জিনিসের বদলে বিবাদ মিটামাট করে দেয়। যে জিনিসের বদলে বিবাদ মিটমাট করা হয় তাকে রক্তপণ বলে। মিটমাট করা না হলে বহুদিন বা বহু বছর বাদে হলেও ঐ প্রতিশোধ তারা নেবেই। কাজেই ততদিন পর্যন্ত সেই ঘাতকের পরিবার বা গোষ্ঠীকে একটা নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই কারণে পরবর্তীকালে ইসলামে বিধান দেওয়া হয়েছে — একজনের বদলে দুইজনকে খুন নয় এবং ঘাতকের বদলে তার ছেলে, ভাই বা অন্য কাউকে খুন নয়।

মানুষ খুন করা এদের কাছে একটা নিতান্ত মামুলী ব্যাপার এবং এটা কতখানি

মামুলী ব্যাপার একটা উদাহরণ দিলে তা ভাল বোঝা যাবে। আয়াস নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে বিরোধীরা তাকে অকথ্য মারধোর করে এবং শেষ পর্যন্ত তার হাত-পা বেঁধে দুপুর রোদে তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখে। তখন মহম্মদের পালিত পুত্র যায়েদের ছেলে হারীস তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয়। আয়াস যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে হারীসের কথামত ইসলাম ত্যাগ করে। তখন আবার হারীস তাকে বিদ্রূপ করে বলে, "ইসলাম যদি সত্যধর্ম হয় তবে তা ত্যাগ করলে কেন?" এতে হারীস খুব রেগে যায় এবং মনে মনে সংকল্প করে সে সুযোগ পেলে হারীসকে খুন করবে। এর বেশ কয়েক বছর পরে মদিনায় সে একদিন হারীসকে নির্জন স্থানে একা পেয়ে অতর্কিতে হত্যা করে।

ব্যক্তিগত ভাবে বেদুইনরা ভীষণভাবে আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ছাড়া অপরের মঙ্গলের কথা এরা সচরাচর চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। বর্তমান যুগেও আল্লার কাছে তাদের প্রার্থনার সার বস্তু হল, তিনি নবী মহম্মদকে আর তাকে দয়া করুন, অন্য কাউকে নয়। অন্য সকলের প্রতি আল্লা নির্দয় হোন, নিষ্ঠুর হোন এটাই ইচ্ছা। তবে এরা বীরত্বের পূজারী। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সময় আপন গোষ্ঠীর গৌরব বৃদ্ধি করাই হল এদের মূল লক্ষ্য। বন্ধু, প্রিয়জন বা গোষ্ঠীর জন্য, গোষ্ঠীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও এরা কুণ্ঠিত হয় না। অপর দিকে দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষার প্রচলন এদের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। ঐতিহাসিক P.K. Hitti এর কারণ হিসাবে মূলত এদের যযাবর জীবন ও তাঁবুতে বসবাসকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে তাঁবু বইপত্র সংরক্ষণের জন্য উপযোগী নয় এবং যাযাবর জীবন অধ্যয়নের জন্য গভীর মনোসংযোগের প্রতিকূল (The Origin of Islamic State, p-2)।

আর একটা ব্যাপারেও বেদুইনদের কুখ্যাতি আছে, তা হল দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন। যে সমস্ত বণিকরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে চলাচল করত, অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের মালপত্র, টাকা-পয়সা লুঠ করা অথবা মরূদ্যানগুলোতে লুঠপাট চালানো এদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সারা রাত নিঃশব্দে অনুসরণ করার পর খুব ভোরের দিকে এরা আক্রমণ চালাত। আরবী ভাষায় উষাকে বলে সবা এবং বেদুইনরা উষাকালে লুঠপাট ও হত্যা চালাত্রে বলে এই সব ডাকাতি ও লুঠপাটকেও আরবের লোকেরা সবা বলত। প্রাক্-ইসলামী যুগে বছরে চার মাস (মহরম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ) যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল এবং বেদুইনরা, অত্যন্ত বেপরোয়া হওয়া সত্ত্বেও, ঐ চারমাস কোন রক্তপাত ঘটাতো না। কাজেই বণিকরা ঐ চারমাস নির্ভয়ে চলাচল করতে পারতো। বছরের অন্যান্য সময় বণিকরা কোন গোষ্ঠীর এলাকায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতির সঙ্গে একটা রফা করে নিত। টাকা-পয়সার বিনিময়ের মাধ্যমেই যে এই রফা হত তা বলাই বাহুল্য। গোষ্ঠীপতি তখন বণিকদের কাফেলার সঙ্গে একজন লোক দিত এবং সে তাদের এলাকা পার করে

দিয়ে আসত। পরবর্তী গোষ্ঠীর এলাকাতেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক সময় আক্রমণ ও লুঠপাট হত।

সুদূর অতীতকাল থেকে আরবের বেদুইনরা যেভাবে জীবন যাপন করে আসছিল আজও তার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সৈন্যরা আরবমরুর বেদুইনদের মধ্যে হাজার হাজার বছর আগেকার একই রকম জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিল। এরজন্য দায়ী আরবের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু, যা একটা কৃষিভিত্তিক উন্নতমানের সভ্যতা গড়ে ওঠার পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল।

মরূদ্যান বা শহরবাসীদের জীবনযাত্রা মরুবাসী বেদুইনদের থেকে অনেকাংশে আলাদা। প্রথমত তারা যাযাবর নয় এবং দ্বিতীয়ত পশুপালন তাদের প্রধান জীবিকা নয়। মরূদ্যানবাসীদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম দলে পড়ে কৃষক, যারা খেজুর ফলায়, ছোট ছোট ফলের বাগান করে বা কিছু কিছু শাক সবজির চাষ করে। দ্বিতীয় দলে পড়ে ছোট ব্যবসায়ী। একই ব্যক্তি একাধারে কৃষক এবং ব্যবসায়ী হওয়াও বিচিত্র নয়। মরুবাসীরা পশু ও পশুজাত পণ্য নিয়ে মরুদ্যানে আসে এবং ঐ সকল পণ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আবার মরুভূমিতে ফিরে যায়। তবে অতিথি পরায়ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা রক্তের বদলে রক্তের প্রতিশোধ স্পৃহা মরুবাসীদের মত এদের মধ্যেও সমানভাবে বিদ্যমান। এ ছাড়া মক্কা, ইয়াসরিব (মদিনা) ইত্যাদি বড় শহরগুলিতে বসবাস করত বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ধনী ব্যবসায়ীরা। এদের মধ্যে মক্কার কোরেশ বংশের লোকেরা ছিল অগ্রগণ্য এবং এরাই ছিল মক্কার কাবাগৃহের প্রধান অধ্যক্ষ বা পুরোহিত। পরবর্তী কালে এই কোরেশ বংশেই নবী হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়।

ইসলামে সূর্যের কোন প্রশংসা নেই কারণ সূর্য তাদের কিছু দেয় না, শুধু প্রখর কিরণে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে চাঁদ আরববাসীদের প্রিয় কারণ তার স্নিগ্ধ আলোতে উষ্ণতা নেই। বিশেষ করে শুক্ল প্রতিপদের চাঁদ তাদের খুবই আদরের জিনিস কারণ এইদিন নতুন মাস শুরু হয় এবং এক পক্ষ কাল জোৎস্নাময় রাত্রির সূচনা করে।

আরব দেশ যে কেমন তা আমরা যারা এই সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষে বাস করি তাদের পক্ষে কল্পনা করাই সম্ভব নয়। এটা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন যে, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকতে পারে যেখানে কোন গাছ জন্মায় না, তাই সেখানে গাছের ছায়া বলতে কিছু নেই এবং কাঠ নামক বস্তুও সেখানে নেই। একবার মক্কার কাবাগৃহের চৌকাঠ ভেঙে পড়ে এবং তার মেরামতের জন্য কাঠের দরকার হয়। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর বিদেশ থেকে সেই কাঠ প্রথমে ইয়েমেন বন্দরে এবং সেখান থেকে উটের পিঠে করে মক্কায় নিয়ে আসা হয়। কাঠের অভাবের জন্যই প্রথম

দিকে কাবাগৃহের ছাদ তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ("ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কাজেই প্রাক্-ইসলামী আরবের ইতিহাস শুধু দারিদ্র্যপীড়িত, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী কতিপয় মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস। সেখানে না আছে কোন কেন্দ্রীয় সরকার, না আছে কোন বিচার ব্যবস্থা, না আছে কোন সৈন্য বাহিনী বা শান্তিরক্ষী বাহিনী। মানুষ সেখানে নিজের হাতেই আইন তুলে নেয়। গোষ্ঠীর অলিখিত নিয়ম-কানুনই সেখানে চূড়ান্ত আইন। সেখানে আছে দুর্বলের উপর সবলের শাসন আর অভাব ও দারিদ্র্য। এত অভাব যে পিতা সদ্যজাত শিশু সন্তানকে হত্যা করতে বা জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বনি তামিম বা বনি নাজির উপজাতির লোকদের মধ্যে সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া একটা সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কোরান দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হয়। সেই সময়কার আরব সমাজে গোষ্ঠীচ্যুত ব্যক্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। ঐ রকম কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর বসতির মধ্য গিয়ে পড়লে সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা তার পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যদি সে দৌড়ে গিয়ে তাদের কোন তাঁবু ছুঁয়ে ফেলতে পারত বা ঐ গোষ্ঠীর কেউ দয়াপরবশ হয়ে প্রাণভিক্ষা করত তবেই তার জীবন রক্ষা পেত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রাচীন পৃথিবীর মানচিত্রে আরবের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল এশিয়া, ইয়োরোপ ও আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশের মিলনক্ষেত্রে আরব দেশের অবস্থিতি। আমেরিকার আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে আরবই ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। প্যালেস্টাইন ও সীরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রসারিত এবং নীলনদের অববাহিকা থেকে পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর অঞ্চলের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এই অঞ্চলেই নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা এবং ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া বা সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে আসীরিয়, ব্যাবিলনীয় ও কালদীয় জাতির লোকেরা একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তার ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। অপরদিকে এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঞ্চলের পশ্চিম-দিকে বা ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে সীরিয়, ফিনিসীয় ও ইহুদী জাতির লোকেরা বসবাস করতে শুরু করে। ঐ সময়ে উত্তর আরবের মরুবাসী যাযাবর গোষ্ঠীভুক্ত সেমিটিক জাতির লোকেরাও দলে দলে ঐ সব উর্বর অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসে।

কিন্তু মূল আরব ভূখণ্ডের অধিবাসীরা ঐ সব উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে সুমেরীয় অঞ্চলের সাথে মিশর ও ভারতের ব্যবসা বণিজ্যের প্রধান রাস্তা আরবের মধ্য দিয়ে হবার দরুন ঐ সব বণিকদের মাধ্যমে আরবের লোকেরা মিশরীয় ও ভারতীয় উন্নত সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার কিছুটা সুযোগ পায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সিন্ধু

উপত্যকার লোকদের সঙ্গে সুমেরীয় অঞ্চলের লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিছুটা জলপথ ও কিছুটা স্থলপথে ঐ বাণিজ্য চলত। ভারতীয় পণ্য সিন্ধু নদের মোহনা থেকে সমুদ্রগামী জাহাজে করে ইয়েমেনের উপকূল বা বর্তমান এডেন বন্দরে পৌছাত এবং সেখান থেকে হেজাজ পর্বত ও নেজেদ উপত্যকার মধ্য দিয়ে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত স্থলপথ দিয়ে তা সুমেরে পৌছাত। ইয়েমেন থেকে তায়েফ, মক্কা, ইয়াসরিব, খয়বর ও তেইমা হয়ে এই পথ বর্তমান ইরাক পর্যন্ত এবং আর একটি শাখাপথ সীরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইয়েমেন থেকে আর একটি পথ লোহিত সাগর হয়ে সুয়েজ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে স্থলপথে মিশর পর্যন্ত চলে যেত।

ভারতীয় বণিকরা তাদের পণ্যসম্ভার ইয়েমেন পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে আরবের বণিকরা তা সুমেরে নিয়ে যেত। প্রধানত মক্কার কোরেশ সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং ইয়েমেনে বসবাসকারী কিছু ইহুদী এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত ছিল। ইসলামী শাস্ত্র মতে মক্কার কোরেশরা বছরে দুইবার বণিজ্যে যেত। শীত ঋতুতে তারা ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে তারা শামদেশ বা ইরাকে বাণিজ্য করতে যেত। মধ্য আরবের বেদুইন অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই বাণিজ্য পরিচালনা করা যে এক বিপদ সঙ্কুল কাজ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

যে সব ইহুদীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবে আসে তারা বিশেষ করে ইয়েমেনের বন্দরগুলিতে এবং উপরিউক্ত বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত শহরগুলিতে বসবাস করতে শুরু করে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয় এবং কিছু সংখ্যক আরবের উপজাতিদের মধ্যে মিশে যায়। হজরৎ মহম্মদের জন্মের বহু আগে, এই ইহুদী সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ইয়েমেনে একটি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এখানে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, মধ্য আরবের যাযাবর মরুবাসীরা বাহির্বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করলেও সীমান্ত অঞ্চলের আরবদের বেলায় সে কথা খাটে না। উত্তর সীমান্তের বাসিন্দারা হাজার হাজার বছর ধরে সীরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শে থাকার ফলে এবং দক্ষিণ আরবের ইয়েমেনবাসীরা মিশর ও ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে বেদুইনদের থেকে অনেকটা উন্নত ও সভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। উপরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ইয়েমেনবাসীরা অর্থিক দিক দিয়েও অনেক সচ্ছল হয়ে ওঠে। তাছাড়া হাদ্রামত পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত হবার ফলে ইয়েমেন উপকূলে বৃষ্টিপাতও অনেক বেশী হয় এবং ইয়েমেনবাসীরা বাঁধের সাহায্যে ঐ জল ধরে রেখে স্থায়ীভাবে কৃষিকাজের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

এই সমস্ত কারণে যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে মিনিয়ান সাম্রাজ্য নামে ইয়েমেনে একটা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের পত্তন হয় এবং খৃঃ পূঃ ৭০০ সাল পর্যন্ত তারা ইয়েমেনে তাদের অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ইসলামী ইতিহাস মতে রানী সীবা, যিনি রাজা সুলেমান (বাইবেলের সলোমন) এর সঙ্গে দেখা করতে প্যালেস্টাইনে

এসেছিলেন, তিনি এই মিনিয়ান সাম্রাজ্যেরই রানী ছিলেন। পরে সাবাইয়ানরা মিনিয়ানদের হাত থেকে ইয়েমেন দখল করে নেয়। তেমনি উত্তর আরবের পেত্রা শহরকে কেন্দ্র করে, উত্তর আরব ও বর্তমান জর্ডানের দক্ষিণের কিছু অংশ নিয়ে নাবাটিয়ানদের একটা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পরে নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তা লাখমিড উপজাতির লোকদের হাতে চলে যায়। পরবর্তীকালে এই লাখমিডদের মধ্য দিয়েই পারস্য সভ্যতা আরবে বিস্তারলাভ করে।

খ্রীস্টপূর্ব ২৪ সালে রোমান সম্রাট অগাস্টাস সীজার আরবে এক অভিযান প্রেরণ করেন যা ইয়েমেন পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সাবাটিয়ানদের পরাজিত করে ইয়েমেন দখল করে নেয়। ঐ সময় রোমানরা ইমেনের বাঁধ ভেঙে দিয়ে তাদের কৃষিকার্যের মূল ভিত্তিকেই নষ্ট করে দেয়। এর পরেও নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ইয়েমেনের সাম্রাজ্য ৬৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ঐ বছর মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হবার ফলে তার পৃথক অস্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতারও অবসান ঘটে। ঠিক একই ভাবে ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণের ফলে রাজা ৫ম নামনের মৃত্যুর সাথে সাথে উত্তর আরবের লাখমিড সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ আরবের এই সব সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ ইত্যাদির কোন প্রভাবই মূল ভূখণ্ডের বেদুইনদের উপর পড়ল না। আরবের মরুভূমিতে কোন উন্নত সভ্যতার পদচিহ্নও পড়ল না।

কাজেই ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে নবী মহম্মদের আবির্ভাব পর্যন্ত আরবের অধিবাসীদের ইতিহাস হল ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, অভাবক্লিষ্ট, দারিদ্র্যপীড়িত, অশিক্ষিত, নানা উপজাতিতে বিভক্ত পশুপালনকারী একটি যাযাবর মানব সমাজের ইতিহাস, যে সমাজে দু বেলা দু মুঠো খাবারের সংস্থান করতে উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অভাবের তাড়নায় যে সমাজ সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করে। যে সমাজে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, রক্তপাত ও হত্যা একটা মামুলী ঘটনা। একটা উটকে কেন্দ্র করে যে সমাজে দুই উপজাতি বনি বক্‌র ও বনি তাঘলির মধ্যে ৪০ বছর ধরে যুদ্ধ চলে। একটা ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে অন্য দুটি উপজাতি বনি আবিস ও বনি ধুবিয়ান-এর মধ্যে কয়েক দশক ধরে যুদ্ধ চলে। যে সমাজে নারীর কোন সম্মান ছিল না। ব্যভিচার যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল।

সেই সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে " হরফ প্রকাশনী" দ্বারা প্রকাশিত "হাদিস শরীফ" গ্রন্থের সম্পাদক জনাব রফিক উল্লাহ্ সাহেব লিখছেন "ব্যভিচার তখন একটা প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। একই পুরুষ অসংখ্য নারীকে দখলে রেখে বীরত্বের প্রকাশ ঘটাত, একই রমণী একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে সঙ্গ দান করে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো। পিতা সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে দ্বিধা করতো না। বৃদ্ধ পিতা-

মাতাকে জঞ্জালের মত পরিত্যাগ করতেও পুত্রের কোন বেদনাবোধ ছিল না। বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করা বৈধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল" (পৃঃ ৫০)। "নারীজাতিকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই ব্যবহার করা হত। কোন কিছুতেই তার কোন অধিকার ছিল না, না স্বামীতে, না স্বামীর ধন-সম্পত্তিতে। প্রয়োজনে পুরুষ তাকে ব্যবহার করত, আবার দাসীর মত তাড়িয়েও দিত"(পৃঃ ৫১)।

ইতিমধ্যে ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের অনুমতি লাভ করেছে এবং ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে তা রোমের রাজকীয় ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে সীরিয়া অঞ্চলে এবং উত্তর আরবের উপজাতিদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অপর দিকে আবিসিনিয়া হয়ে তা ইয়েমেনেও প্রবেশ করতে শুরু করে। কাজেই হজরৎ মহম্মদের জন্মের সময় পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদি ও খৃস্টান ছাড়া আরবের বেশীরভাগ মানুষ তৎকালীন মূর্তিপূজার ধর্মকেই অনুসরণ করছিল। যদিও ইয়োরাপীয় ঐতিহাসিকরা তাকে জংলী বা pagam ধর্ম আখ্যা দিয়ে থাকেন, কিন্তু আসলে সেই ধর্মমত কি ছিল তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত।

তখনকার দিনে আরবের লোকেরা ৩৬০ রকম দেবদেবীর পূজা করতো এবং তাদের প্রধান ধর্ম মন্দির মক্কার কাবাগৃহ বা মসজিদুল হারামের ভিতরে ঐ সকল দেবদেবীর মূর্তি চতুর্দিকে সাজানো থাকত। এঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি দেবদেবীর নাম আল-মনাৎ, আল্লাৎ, আল-উজ্জা, গরি, যেবৎ, তাজৎ ইত্যাদি। মূর্তিপূজক কোরেশরা ঐ সব মূর্তিতে সুগন্ধি আতর ও মধু মাখিয়ে রাখত। আল-মনাৎ ছিলেন ভাগ্যের দেবী এবং ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা এঁকে দেবী Tyche Soteira-'র পরিবর্তিত রূপ বলে মনে করেন। আল্লাৎ হলেন সকল দেবতার মা এবং উত্তর আরবে, বিশেষ করে তায়েফে ইনি আর-রাব্বাহ্ নামে পূজিত হতেন। গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাস এঁকে গ্রীক দেবী Uranis-এর রূপান্তর বলে মনে করতেন। আল-উজ্জা ছিলেন বীরত্বের দেবতা, অনেকটা ঋগ্বেদের ইন্দ্রের মত। এ ছাড়া ঐ সময় আরবের নূহীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষ ও নানারকম জীবজন্তুর আকৃতি বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজা করতো। এদের কয়েকটি দেবদেবীর নাম হল, মানবীর আকৃতি বিশিষ্ট সোত্তয়া, বাঘের আকৃতি বিশিষ্ট ইউগুস, ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট ইয়উক, শকুনের আকৃতি বিশিষ্ট নসর ইত্যাদি। এই সব দেবদেবীর সঙ্গে যে মিশরীয় দেবদেবীর খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের প্রসারের আগে সমগ্র মানব সমাজেই মূর্তি পূজার চল ছিল। প্রাচীন গ্রীস, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার লোকেরাও মূর্তি পূজক ছিল।

কিন্তু তৎকালীন আরবের লোকদের মধ্যে কিছু কিছু ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা ছিল যেগুলোর সঙ্গে অনেক হিন্দু প্রথার মিল লক্ষ্য করা যায়। আরববাসীরা তখন ছাগল বা ভেড়া কখনও কখনও দেবতার নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত এবং ঐ

সমস্ত পশু বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারতো। সাধারণ লোক এদের কোন ক্ষতি করত না। উৎসর্গ করার সময় বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এদের কান ফুটো করে দেওয়া হত। চিহ্নিত ঐ সব পশুকে তারা বহিরা, সায়রা বা উসিলা বলত। এই রীতি অনেকটা হিন্দু রীতি বলে মনে হয়। আজও হিন্দু সমাজে দেবতার (সূর্যের) নামে ষাঁড় উৎসর্গ করে ছেড়ে দেবার রীতি চলে আসছে। ঐ সময় কোরেশরা কখনও কখনও কোন বালিকার মাথায় একটা সিক্কা (মুদ্রা বিশেষ) বেঁধে দিয়ে তাকে দেবতার মত পূজা করত। এ প্রথার সঙ্গে হিন্দুর কুমারী পূজার প্রথার মিল লক্ষ্য করা চলে। ইসলামের আগে আরবে এই নিয়ম চালু ছিল যে, কোন রমণী বিধবা হলে অন্তত এক বছর তাকে নানা রকম ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি করতে হত। ঐ এক বছর তার পক্ষে জাঁকজমক পোশাক পরা, সাজগোজ করা বা অলঙ্কার পরা নিষেধ ছিল।

তখনকার আরব সমাজ তথা বর্তমান মুসলীম সমাজে প্রণাম করার দু রকম রীতি প্রচলিত, যথা রুকু ও সিজদা। বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা নত করে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে প্রণাম করার নাম রুকু করা এবং হাটু গেড়ে বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করাকে সিজদা করা বলে। এই সিজদা করা ও হিন্দুর প্রণাম করা প্রায় অভিন্ন। মুসলমানদের নামাজ পড়ার সময় এই সিজদা করা অনেকই লক্ষ্য করে থাকবেন।

মক্কা দখল করার পর মহম্মদ কাবার ভিতরকার দেবদেবীর সমস্ত বিগ্রহ ধ্বংস করেন। কথিত আছে যে কাবাগৃহে ঢুকে তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে অনেক প্রতিমা ভূপাতিত করেন। কিন্তু কোরেশদের সঙ্গে সম্পাদিত বিখ্যাত হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুসারে তাদের প্রধান দেবতা একখণ্ড কালো পাথর বা হাজরে আসোয়াদ'কে স্বস্থানে রাখতে বাধ্য হন। Sir W. Muir-এর The Life of Mahomet গ্রন্থে হাজরে অসোয়াদ-এর যে ফটো দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় যে প্রায় ডজন খানেক ছোট ছোট পাথরের টুকরা লাল রঙের সিমেন্ট জাতীয় কিছু দিয়ে জুড়ে হাজরে আসোয়াদ তৈরি (পূর্ববর্তী "হজ্জ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কালো পাথর বললেই হিন্দুর মনে শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলার কথা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা ছোট ছোট পাথরের টুকরা জোড়া দিয়ে কখনও তৈরি হয় বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। তা ছাড়া হাজীরা হজের সময় হাজরে আসোয়াদকে চুম্বন করেন, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে দেবদেবীকে চুম্বন করার কোন প্রথা নেই। ঐতিহাসিকদের মতে সেমাইট (Semite) জাতির লোকদের মধ্যে অনেক পুরানো কাল থেকেই গাছ, পাহাড়, ঝরনা, পাথর ইত্যাদির পূজা চলে আসছিল। তারা মনে করত এ সবেরও আত্মা আছে। আরব, আর্মানী, হিব্রু, ফিনিসীয়, আসিরীয় ইত্যাদি জাতিগুলোকে একত্রে সেমাইট বলা হয় এবং পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এরা শেম (shem) নামে এক আদিম জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, তৎকালীন আরবের পেত্রা ও অন্যান্য শহরেও এরকম কালো পাথর পূজা করার চল ছিল। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে কাবাগৃহ এককালে মক্কেশ্বর শিবের মন্দির ছিল এবং হাজরে আসোয়াদ প্রকৃতপক্ষে

শিবলিঙ্গ। তারা এও বিশ্বাস করেন যে, কোন হিন্দু যদি কাবায় ঢুকে হাজরে আসেয়াদের উপর গঙ্গার জল ঢেলে দিতে পারে তবে পৃথিবী থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং এই কারণেই মুসলমানরা কোন অ-মুসলমানকে কাবায় ঢুকতে দেয় না।

তবে হজ ক্রিয়ার অঙ্গ হিসোবে হাজীদের সেলাই বিহীন কাপড় পরা, মস্তক মুণ্ডন করা এবং কাবাগৃহকে পরিক্রমা (তাওয়াফ) করাকে হিন্দু রীতি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে উপনয়নের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। মুসলমানরাও হজ করে হাজী উপাধি ধারণ করে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করলেন বা দ্বিজ হলেন, এরকম একটা মনোভাবে পোষণ করে থাকেন। তবে এটাও ঠিক যে পুরাণো যুগে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেও সেলাইবিহীন কাপড় পরার রীতি ছিল। এ প্রসঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে, হজ ক্রিয়া ইসলামের অবদান নয়। ইসলামের অনেক আগে থেকেই তা আরবের লোকদের মধ্যে চলে আসছিল। এখানে এটাও বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, রমজান মাসে উপবাস করার প্রথাও ইসলামের অবদান নয়। ইসলামের অনেক আগে থেকেই এই প্রথা আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে চলে আসছিল এবং তখন এর নাম ছিল তহন্নুত। কোরেশরা ঐ এক মাস শুধু উপবাস নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান, জুয়াখেলা, স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি থেকেও নিজেদের বিরত রাখত বা বিরত রাখার চেষ্টা করত। এই সংযম রক্ষা থেকেই এর আর এক নাম সিয়াম হয়। সর্বোপরি মহম্মদ হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে যে তপস্যা করেন এবং যে তপস্যার ফলস্বরূপ জিব্রাইল কর্তৃক কোরান-আদিষ্ট হন, সেই তপস্যাও তিনি তৎকালীন পৌত্তলিকদের অনুসরণ করেই করেছিলেন। মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব পুরো রমজান মাস হেরা পর্বতের গুহায় উপবাস, তপস্যা ও উপাসনা করে কাটাতেন। তাঁকে অনুকরণ করেই মহম্মদ সেই একই গুহায় তপস্যা শুরু করেছিলেন।

মহম্মদের পিতৃব্য আবু তালেবও একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই মাতৃ-পিতৃহীন মহম্মদকে লালন পালন করে ছোট থেকে বড় করেন। মহম্মদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আবু তালেব তাঁর পুরানো পৌত্তলিকতার ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে অস্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও মহম্মদ তাঁর মৃত্যুশয্যায় অঙ্গীকার করেন যে তাঁর সদগতির জন্য তিনি আল্লার কাছে প্রার্থনা করবেন। একজন মুসলমানের পক্ষে একজন পৌত্তলিক (অংশীবাদী) কাফেরের মঙ্গল কামনা করে আল্লার কাছে মোনাজাত করা ভীষণভাবে ইসলাম-বিরুদ্ধ কাজ। কাজেই মহম্মদের উপরিউক্ত অঙ্গীকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবু তালেবের চরিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্যই তিনি তা করতে রাজী হয়েছিলেন। কথিত আছে আবু তালেব তীর্থ করতে ভারতে আসার ইচ্ছা মনে পোষণ করতেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে তৎকালীন পৌত্তলিক আরব সমাজ এবং বর্তমান মুসলীম সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতি বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের কিছু মিল থাকলেও এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না যে প্রাক্-ইসলামী আরব সমাজ হিন্দু

ছিল বা তা হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এটাও ঠিক যে, হুদায়াবিয়ার চুক্তির দ্বারা তারা কৃষ্ণ প্রস্তর হাজরে আসোয়াদ-এর সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছিল। অন্যান্য মূর্তির অপসারণ মেনে নিলেও, হাজরে আসোয়াদ এর অপসারণ মেনে নিতে পারেনি। ঐ প্রস্তরখণ্ড শালগ্রাম শিলা হলে ঐ পরিস্থিতিতে একজন হিন্দুর পক্ষেও তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, তৎকালীন আরবে বহুরকম দেবদেবীর আরাধনা প্রচলিত থাকলেও আরবদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তারূপী একজন ঈশ্বর বা আল্লার ধারণাও প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Carl Brockelmann তাঁর History of Islamic People গ্রন্থে বলেন, "In addition to all gods and godesses of the Arabs, like many other primitive people, believed in a God, Who was creator of the world, Allah, Whom the Arabs did not, as has often been thought, own to the Jews and Christians". (p-9). এমন হতে পারে যে হাজরে আসোয়াদ প্রাক্-ইসলামী যুগের পরমেশ্বর আল্লার প্রতীক ছিল এবং সেই কারণেই কোরেশরা তার আপসারণ মেনে নিতে পারেনি এবং নবী মহম্মদের পক্ষেও তাকে অশ্রদ্ধা করার সাহস হয় নি। সম্ভবত এটাই হাজরে আসোয়াদের প্রকৃত পরিচয়। কাজেই হাজরে আসোয়াদ ইসলামী আল্লারও প্রতীক।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। পৌত্তলিক বলে তৎকালীন আরবের কোরেশরা ইহুদী, মুসলমান বা খ্রীস্টানদের দ্বারা যতই ঘৃণিত নিন্দিত হোক না কেন, বেশ একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার অধিকারী ছিল। এ ব্যাপারে তারা পরবর্তীকালের মুসলমানদের থেকে কোন অংশে হীন তো ছিলই না, বরং অনেক উন্নত ছিল বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে John Bagot Glubb বলেন "It seems as if those idolators, whom we regard with so much contempt, were moved by spiritual promptings as genuine as those of religious people of our times" (Life and Times of Mohammad, p-48).

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই ঐ সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক যোগাযোগ চলে আসছিল। তার ফলে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পড়েছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট আশোকের দ্বারা সীরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণের ফলে ঐ যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে চন্দন কাঠের আরবী নাম 'অলমুগ' সংস্কৃত ভল্গু থেকেএসেছে। সেইরকম হিব্রু 'কফ্' সংস্কৃত কপি (বানর) থেকে, আরবী 'সাটিন' ও গ্রীক ''সিন্দন' (কার্পাস বস্ত্র বিশেষ) সংস্কৃত সিন্দু থেকে, হিব্রু করপস' সংস্কৃত কার্পাস থেকে এবং আরবী 'শেন হাবিস' সংস্কৃত ইভাদন্ত (হাতীর দাঁত) থেকে এসেছে।

এই ব্যাপারে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত খুবই প্রণিধান যোগ্য। তাঁর মতে সেই সময় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐ সমস্ত অঞ্চলে এতটা বিস্তার লাভ করেছিল যে, কোন সংস্কৃত জানা লোক অনায়াসে ঐ সব অঞ্চল ঘুরে আসতে পারতো। ব্যাবিলনে প্রাপ্ত ঐ সময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকেও উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। খ্রীস্ট -পূর্ব ১৭৬০ সালের যে শিলালিপি সেখানে পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, যে কাসাইট রাজারা তখন সেখানে রাজত্ব করতেন তাঁরা সূর্য, মরুত্স্, বুগস্ প্রভৃতি দেবতার পূজা করতেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই কাসাইটিদের কাছ থেকেই ব্যবিলনের লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার শিখেছিল এবং ঘোড়ার ব্যাবিলনীয় নাম 'শুশু' সংস্কৃত অশ্ব থেকে তাদের মাধ্যমেই এসেছে।

টেল-এল-অমর্ণা থেকে ১৪৬০ খৃস্ট পূর্বাব্দের যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে ঐ সময় আপার (upper) ইউফ্রেটিসের পারে মিটানী বংশীয় যে সব রাজারা রাজত্ব করতেন তাদের নাম ছিল অর্ততম, সুক্তর্ণ, দুস্তর্ণ ইত্যাদি। ১৩৬০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের একটি বোগাস কিউ লিপি থেকে জানা যায় যে, ঐ মিটানী বংশীয় রাজারা ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য ইত্যাদি দেবতার পূজা করতেন। ঐ স্থানে প্রাপ্ত অন্য আরেকটি ফলক থেকে জানা যায় যে ঐ মিটানী রাজারা ঐক, তেরস্, পঞ্জস্, সত্ত, নব এইভাবে এক দুই গণনা করতেন। এই সকল নিদর্শন আকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে সেমিটিক জাতির ঐ দুর্গের মধ্যেও তখন তথাকথিত আর্যদের একটি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরা স্বীকার করতে চান না যে ঐ মিটানীরা ভারতীয় বংশোদ্ভব ছিলেন। তাদের মতে আর্য জাতির একটি শাখা মধ্য ইয়োরোপ থেকে ভারতে পাড়ি দেবার সময় ঐ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কাজেই ভবিষ্যতে কোনদিন যদি এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা তথাকথিত আর্যরা ভারতেরই মূল অধিবাসী ছিলেন তাহলে এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে ভারতীয় বংশোদ্ভবরাই অতি প্রাচীন কালে ঐ সুদূর দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। যেমন পরবর্তীকালে তাঁরা করেছিলেন শ্যাম, কম্বোজ ইত্যাদি দেশে।

কিন্তু আরব থেকে এমন কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারে যে, কোন সময়ে ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে ঐ দেশে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে হাজার হাজার বছর ধরে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও বেদুইনদের যাযাবর ও বিচ্ছিন্ন জীনযাত্রার জন্য ঐ সব সভ্যতা মূল আরব ভূখণ্ডে তেমন প্রবেশ করতে পারেনি। কাজেই এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ঐ একই কারণে ভারতের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূল আরব ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

পরিশিষ্ট- ২

শেষ নবী হজরৎ মহম্মদ

কোরেশ বংশ

হজরৎ ইব্রাহীম যেখানে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমালইকে নির্বাসিত করেছিলেন, জম জম কূপের সৃষ্টির পর [১] ইয়মনবাসী জুরহুম গোত্রের কিছু লোক সেখানে বসতি স্থাপন করে। পরে ইব্রাহীম যখন কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করলেন এবং হজ প্রথা প্রবর্তিত হল তখন কাবাকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে শুরু করল। এইভাবে প্রধানত তীর্থকেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্তমান মক্কা নগরীর পত্তন হয়। জুরহুম গোত্রের লোকেরা ছিল বণিক ও ব্যবসায়ী। কালে হজরৎ ইসমাইল ও তাঁর বংশধরগণ তাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকেই তাঁদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইসমাইলের ৬০তম পুরুষ ফিহির আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কোরেশ উপাধি লাভ করেন। আরবী কোরেশ শব্দের অর্থ বণিক এবং কালক্রমে ফিহিরের বংশধরগণ কোরেশ নামে পরিচিতি লাভ করে।

এইভাবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফিহিরের সপ্তম উত্তরপুরুষ কোসাই মক্কার কাবা সহ সমস্ত হেজাজ উপত্যকায় কোরেশ বংশের পূর্ণ কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি কোরেশ বংশের সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন এবং ঐ সমিতির মিলিত হবার জন্য একটি সভাগৃহ (দারুণ নাদওয়া) তৈরি করেন। তাদের শাসন-কার্যের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল কাবায় হজ্ব করতে আসা তীর্থযাত্রীদের খাদ্য ও পানিয় জল সরবরাহ করা।

কোশাই-এর তৃতীয় পুরুষ হাসেম তাঁর শাসনকার্যে বিশেষ দক্ষতার জন্য অতিশয় সুনাম অর্জন করেন এবং এই কারণে তাঁর বংশধরেরা বনি হাসেম বা হাসেম গোষ্ঠী নামে পরিচিত হতে থাকে। হাশেমের ছেলের নাম ছিল আবদুল মোত্তালেব এবং তাঁর উপর ভার ছিল কাবায় আগত তীর্থযাত্রীদের জলপান করাবার। একবার মক্কায় ভীষণ জলাভাব দেখা দিলে আবদুল মোত্তালেব জম জম কূপ খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং উদ্দেশ্য সফল হলে তাঁর

(১) পূর্ববর্তী 'হজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২ (মতান্তরে ১৩) ছেলের মধ্যে একজনকে আল্লার কাছে কোরবানী দেবেন প্রতিজ্ঞা করেন। পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী 'হজ' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহম্মদের পিতা আবদুল্লাকে কোরবানী না করার জন্য যে মহম্মদকে দুই কোরবানীর পুত্র বলা হত তাও বলা হয়েছে।

মহানবীর জন্ম ও শৈশব

আবদুল্লার সাথে মদিনা-নিবাসী খাজরাজ গোত্রের ওয়াহাব নামক ব্যক্তির কন্যা আমিনার বিবাহ হয়। বিবাহের পর কিছুদিন শ্বশুরবাড়ীতে কাটাবার পর আবদুল্লা সীরিয়ায় বাণিজ্যযাত্রা করেন এবং সেখান থেকে ফেরার পর মদিনাতে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। এই সময় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

ইয়মন তখন আবিসিনিয়ার সম্রাট হাবসার অধীন ছিল এবং তিনি আবরাহা নামক এক ব্যক্তিকে ইয়মনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। প্রথম জীবনে আবরাহা ছিল একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। মক্কার কাবা তখনও সমগ্র আরবের প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল এবং প্রতি বছর সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হজ করতে আসে দেখে আবরাহার মনে ঈর্ষা হল। সে ইয়মনে এক বিশাল গীর্জা তৈরি করল এবং সবাইকে কাবায় না গিয়ে সেখানে হজ করতে আসার জন্য আদেশ জারি করল। কিন্তু আরবরা তা মানতে পারল না। উপরন্তু কয়েকজন আরব রাতের অন্ধকারে সেই গীর্জায় মলমূত্র ত্যাগ করে এল। কিছু আরব আবার তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এতে আবরাহা ভীষণ ক্ষেপে গেল এবং কাবা ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করল। ষাট হাজার সৈন্য এবং বিশাল এক হাঁতীর বাহিণী নিয়ে সে মক্কায় উপস্থিত হল। প্রথমে হাতীর বাহিনীকে কাবার দিকে চালিত করতে চেষ্টা করল কিন্তু হাতীর দল কিছুতেই সে দিকে যেতে চাইল না (১০৫/১)। বরং হাতীর দল উল্টো দিকে পালাতে গিয়ে আবরাহার সৈন্যদেরই আহত করতে লাগল (১০৫/২)। এমন সময় দেখা গেল লোহিত সাগরের দিক থেকে আরাবিল নামে ছোট ছোট পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে তিনটি করে পাথরের নুড়ি, দুপায়ে দুটো এবং মুখে একটা। আবরাহার সৈন্যদের উপর তারা নুড়ি-পাথর বৃষ্টি করতে শুরু করল। সেই নুড়ি যেখানেই লাগল সেখানেই ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে যেতে লাগল (১০৫/৩,৪)। সৈন্যদল তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল, আর হাতীরা পাগল হয়ে গেল[২]।

এই অলৌকিক ঘটনার মাত্র ৫৫ দিন পরে, ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট বা ১২ই রবিউল আউল, সোমবার মক্কা নগরীতে হজরৎ মহম্মদ জন্মগ্রহণ

---

(২) কাবার পথে, (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৯০

করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লা বলছেন, "আমি তোমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও শতর্ককারী রূপে প্রেরণ করছি (৩৪/২৮)। যে বাড়ীতে মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন তা মক্কার সুগুল্লাইল বা গাজা এলাকায় অবস্থিত। বাড়ীটি এখনও আছে। সৌদি সরকার সেখানে একটি পাঠাগার এবং কোরান ও হাদিসের গবেষণাগার স্থাপন করেছেন।

জন্মের সপ্তম দিনে পিতামহ আবদুল মোত্তালেব শিশুর নামকরণ করলেন মহম্মদ বা প্রশংসিত। এর আগে আর সকলে শিশুর জন্য আহম্মদ বা প্রশংসাকারী নাম রাখার কথা ভেবেছিল কাজেই আহম্মদের বদলে মহম্মদ নাম রাখার মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল যে বড় হয়ে ঐ শিশু বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসিত ব্যক্তি হবেন। তাছাড়া তত্তরাৎ, ইঞ্জীল, ঝিন্দ আবেস্তা তো বটেই, এমন কি "ইদঃ জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তবিষ্যতে" বাক্যের দ্বারা হিন্দুর অথর্ব বেদও মহম্মদের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল বলে মুসলমান পন্ডিতদের বিশ্বাস।(৩)

তখনকার দিনে একজন নবজাত কোরেশকে একজন ধাত্রীমায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত করার রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণত বেদুইন রমণীদের এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হত এবং বদলে তারা পারিশ্রমিক ও বখশীশ পেত। প্রথম কয়েকদিন শিশু মহম্মদ মা আমিনার স্তন্য পান করেন এবং তারপর চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সোয়াইবা তাঁকে স্তন্য পান করায়। লাহাব কথার অর্থ অগ্নিশিখা এবং আবু লাহাব কথার অর্থ অগ্নিশিখার পিতা। মহম্মদের এই চাচার প্রকৃত নাম ছিল ওজ্জা এবং তিনি খুব উগ্র প্রকৃতির ছিলেন বলে তাঁকে ঐ নামে ডাকা হত। পরবর্তীকালে আবু লাহাব মহম্মদ তথা ইসলামের চরম শত্রুতে পরিণত হন এবং আল্লা তাঁকে উদ্দেশ্য করে সুরা লাহাব (১১১ নং সুরা) অবতীর্ণ করেন। কথিত আছে যে একদিন আবু লাহাব মহম্মদকে পাথর ছুঁড়ে মারতে যান এবং তখন ঐ সুরা অবতীর্ণ হয়। উক্ত সুরায় আল্লা বলেন, "আবু লাহাবের দু হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং তার উপার্জন কোন কাজে আসবে না এবং অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে ইত্যাদি।" (১১১/১-৫)। আবু লাহাবের স্ত্রীও শত্রুতাবশত মহম্মদের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে আবু লাহাবের মৃত্যু হয়। সোয়াইবার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পরে মহম্মদ তাকে আবু লাহাবের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করতে চান কিন্তু আবু লাহাবের বিরোধিতায় উদ্দেশ্য সফল হয় না। মক্কা

---

(৩) হাদিস শরীফ, রফিক উল্লাহ, (হরফ), পৃঃ ৭৭

বিজয়ের পর মহম্মদ যখন সোয়াইবার খোঁজ খবর করেন তখন জানা যায় যে সে ও তার একমাত্র ছেলে দুজনেই মারা গিয়েছে।

এরপর বেশ কয়েকজন বেদুইন রমণী শিশু মহম্মদের দায়িত্ব নেবার জন্য উপস্থিত হল। কিন্তু যখন তারা শুনল যে মহম্মদ পিতৃহীন তাই তারা ভাবল যে এঁকে পালন করে তেমন বখশীশ পাওয়ার আশা নেই। তাই হালিমা নামে এক মহিলা ছাড়া আর সকলেই চলে গেল। শিশু মহম্মদকে তখন হালিমার হাতেই তুলে দেওয়া হল এবং সে মহম্মদকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। এইভাবে মহম্মদের বয়স যখন চারবছর হল তখন তিনি তাঁর দুই ভাই বা হালিমার ছেলে আবদুল্লার সঙ্গে পশু চরাতে শুরু করলেন। একদিন তিনি পশু চরাচ্ছেন, এমন সময় ফেরেস্তারা সেখানে উপস্থিত হন এবং মহম্মদের বুক চিরে জমজমের পানিতে তাঁর হৃদয় ধুয়ে পরিস্কার ও পবিত্র করে দেন। এ ঘটনা "ছিনাচাক" নামে খ্যাত (৯৪/১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে নবুয়ৎ প্রাপ্তির পর তাঁর মেরাজ বা স্বর্গভ্রমণের দিন ফেরেস্তারা তাঁকে আরও একবার ছিনাচাক করেছিলেন। পূর্ববর্তী নবীদেরও ফেরেস্তারা ছিনাচাক করেছিলেন কি না তা জানা যায় না। সম্ভবত এই অভিনব পন্থা ফেরেস্তাগণ শুধু মহম্মদের জন্যই উদ্ভাবন করেছিলেন। যাই হোক হালিমা মহম্মদের বুকে ছিনাচাক জনিত ক্ষত দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং মহম্মদকে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে এলেন।

মহম্মদের বয়স যখন ছয়বছর তখন মা আমিনা স্বামীর কবরে জিয়ারৎ করার জন্য মদিনা যাত্রা করেন এবং মহম্মদও মার সঙ্গে মদিনা যান। মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য কবরে বিশেষ প্রার্থনা ইত্যাদি করাকে জিয়ারৎ বলে। এই সময় কিবলার দিকে পিছন ফিরে কবরের দিকে মুখ করে দোয়া পাঠ করতে হয়। বর্তমান মুসলীম রীতি অনুসারে[৪] কোন স্ত্রীলোক শুধু তার বাবা ও মা'র কবরে জিয়ারৎ করার অধিকারী কিন্তু কোন পুরুষ যেকোন ব্যক্তির জন্য যে কোন কবরেই জিয়ারৎ করতে পারে। এ থেকে মনে হয় প্রাক্-ইসলামী যুগে নারীরা স্বামীর কবরে জিয়ারৎ করার স্বাধীনতা ভোগ করত। যাই হোক, মদিনা থেকে ফেরার পথে আল আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনা দেহত্যাগ করেন। গর্ভে থাকতেই পিতা আবদুল্লা ইন্তেকাল করেন, এখন মা মারা যাওয়াতে মহম্মদ সম্পূর্ণ অনাথ হলেন। এরপর থেকে চাচা আবু তালেব অনাথ মহম্মদের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কথিত আছে যে আবু তালেব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পৌত্তলিক ছিলেন

---

(৪) মুসলীম পঞ্জিকা (বাংলা ১৪০০ সন), হরফ, পৃঃ ২১০

এবং পৌত্তলিক হিসাবেই ৬২০ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণে মহম্মদ তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং একজন কাফের হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকালে তাঁর জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। মহম্মদ তাঁর সমস্ত অ-মুসলমান পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অস্বীকার করতেন এবং বলতেন তাঁরা সবাই যন্ত্রণাময় নরকে যাবে (মুসলীম-৪১৭)। শুধু আবু তালেবের প্রতি কিছুটা সদয় ছিলেন এবং বলতেন যে, তিনি সর্বাপেক্ষা কম আগুনের নরকে যাবেন এবং আগুনের পোশাকের বদলে তাঁকে শুধু আগুনের জুতো পরানো হবে (মুসলীম- ৪১৩)। শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন তাঁর "কোরআন শরীফ" (হরফ পৃঃ ৪৪০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে মৃত্যুকালে আবু তালেব কলেমা উচ্চারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মহম্মদ আবু তালেবের মেয়ে উম্মে হানিকে বিবাহের প্রস্তাব দেন কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

এই সময় থেকে মহম্মদ আবু তালেবের পশু চরাতে শুরু করেন। বালক মহম্মদ লোকজনের সঙ্গে বেশী মেলামেশা পছন্দ করতেন না, একা থাকতেই পছন্দ করতেন অর্থাৎ বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জ নসংসদি। যখন তাঁর বয়স বারো বছর তখন আবু তালেব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সীরিয়ায় বাণিজ্যযাত্রা করেন। পথে বসরা নামক স্থানে নেস্তোরীয়পন্থী খ্রীস্টান সাধু বুহায়রা রাহিব-এর সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং প্রথম দর্শনেই বুহায়রা তাঁকে আরবের ভবিষ্যৎ নবী বলে সনাক্ত করেন এবং আবু তালেবকে বালকের প্রতি যত্নবান হতে পরামর্শ দেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে মহম্মদের প্রাণ সংশয় হতে পারে বলে বুহায়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং এই মর্মে আবু তালেবকে সাবধান থাকতে বলেন।

মক্কায় তখন প্রতিবছর জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম মাসে ওকাজের মেলা বসত। অনেকে এই মেলাকে হিন্দুদের কুম্ভমেলার সঙ্গে তুলনা করেন। তৎকালীন আরবে বেদুইনদের মধ্যে খুনখারাপি একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং এই মেলায় সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই বিশাল হত্যাকাণ্ড ঘটে যেত। এই খুনখারাপিকে "হরব-ই-ফুজ্জার" বা অন্যায় সমর বলা হত। ওকাজের মেলাতে আমাদের কবিগানের মত একরকমের কবির লড়াই হত। মহম্মদের কিশোর বয়সে একবার এক কবির লড়াইয়ে কোন এক গোত্রের কবি অন্য এক গোত্রের প্রতি অপমানসূচক কবিতা রচনা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া, মারামারি ও রক্তারক্তি এবং ক্রমে তা সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বন্ধ করার জন্য এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহম্মদ তাঁর অন্য এক চাচা যুবায়েব-এর সঙ্গে হলফুল ফজুল নামে এক সমিতি তৈরি করেন।

যৌবন ও খাদিজার সঙ্গে বিবাহ

কোরেশদের পূর্বপুরুষ কোসাই-এর বংশের একটি শাখার পঞ্চম পুরুষ ছিলেন খোয়ালেদ। তিনি বনি তামিম ও কাব গোষ্ঠীর নেতা এবং একজন ধনবান ও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মেয়ের নাম ছিল খাদিজা। রূপে, গুণে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে খাদিজা ছিলেন অতুলনীয়া। প্রথম জীবনে নাব্বাস (অন্য নাম আবু হালা) নামক বনি তামিম গোত্রের এক ধনী যুবকের সঙ্গে খাদিজার বিবাহ হয় এবং তার ঔরসে হিন্দ ও হারেস নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে হারেস ইসলামের প্রথম শহীদ হন এবং হিন্দ বদর ও ওহুদ যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু উক্ত বিবাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না এবং আবু হালার মৃত্যু হলে আতিক বিন যায়েদ নামে আর এক যুবকের সঙ্গে খাদিজার পুনর্বিবাহ হয়। কিন্তু আতিকের অকালমৃত্যুর ফলে এ বিবাহও বেশীদিন স্থায়ী হয় না।[৫]

ইতিমধ্যে পিতা খোয়ালেদের মৃত্যু হলে তাঁর ব্যবসায়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব খাদিজার উপর এসে পড়ল। এই ব্যবসা খুবই বড় আকারের ছিল এবং বাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে সুদে টাকা খাটান বা তেজারতির কারবারও এর অন্তর্গত ছিল। কাজেই খাদিজা একজন বিশ্বস্ত লোকের খোঁজখবর করতে শুরু করলেন। মহম্মদ উক্ত কাজের জন্য আবেদন করলে তা মঞ্জুর হয়। প্রথম দিকে খাদিজা তাঁর এক বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মায়সারাকে মহম্মদের কাজকর্মের উপর নজর রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে মহম্মদ মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে শামদেশ বা সীরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান। সীরিয়ায় বাণিজ্য সম্ভার বিক্রী করে যে টাকা আমদানি হয় মহম্মদ তাই দিয়ে সেখান থেকে বাণিজ্য সম্ভার কিনে আনেন এবং মক্কার বাজারে তা বিক্রী করে দ্বিগুণ মুনাফা আয় করেন। পরে এই বাণিজ্যের সমস্ত হিসাব মহম্মদ খাদিজাকে পাই পয়সা পর্যন্ত বুঝিয়ে দেন এবং নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন না। এর ফলে তিনি খাদিজার বিশ্বাসভাজন হন এবং তাঁর সততায় খাদিজা মুগ্ধ হন।

উপরিউক্ত বাণিজ্যযাত্রাকালে মায়সারা মহম্মদের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক গুণ দেখতে পায়। একদিন সে দেখতে পেল সে দুপুরের তপ্ত রোদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য দুজন ফেরেস্তা মহম্মদের মাথায় ছায়া বিস্তার করেছে। আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার সে লক্ষ্য করে, তা হল মহম্মদকে কিছু খেতে দিলে তিনি যতই খান না কেন, খাবার যেমন ছিল তেমনই থাকে, ফুরায় না। মক্কার ফিরে একথা মায়সারা খাদিজাকে জানালে তিনি তা পরীক্ষা

---

(৫) আতিকের ঔরসে মেয়ে হিন্দ-এর জন্ম হয় (Mohammad Encychopaedia, Secrah Foundation (London), Vol-II, P-160)

করার জন্য একদিন ছোট বোন হালা ও মহম্মদকে একটা থালায় করে কিছু খেজুর ও খাবার খেতে দেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখেন যে তারা খেয়ে যাবার পরও খাবার যেমন ছিল তেমনই আছে।(৬)

ইতিমধ্যে মহম্মদের রূপ-গুণ ও সততায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং বিশ্বাসী দাসী নফিদার মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। প্রথমে মহম্মদের পক্ষে তা বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটা সত্যি, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা চাচা আবু তালেবকে জানালে তিনিও খুশিমনে সম্মতি দিলেন এবং ৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের কোন এক দিনে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। নিকাহ্‌নামায় ২০টা উট দেনমোহর হিসাবে ধরা হয়। তখন বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ এবং মহম্মদের বয়স ছিল ২৫ বছর। মহম্মদের ঔরসে খাদিজার গর্ভে এক ছেলে কাসেম ও চার মেয়ে জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফতেমা জন্মগ্রহণ করে। কাশেম দু বছর বয়সেই মারা যায় এবং ফতেমা বাদে অন্য তিন মেয়েও মহম্মদের জীবদ্দশাতেই মারা যায়।

মহম্মদের বয়স যখন ৩৫ বছর তখন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মক্কার কাবা গৃহে কোন ছাদ না থাকায় একটা চোর সমস্ত দেবদেবীর মূর্তির সোনার অলঙ্কার চুরি করে পালায়। এই প্রসঙ্গে এটা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, আরবে কোন গাছ জন্মায় না বলে উপযুক্ত কড়ি বরগার অভাবে কাবায় ছাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। যাই হোক, ঠিক ঐ সময়ে গ্রীকদের একটি যুদ্ধ জাহাজ বর্তমান জেদ্দা নগরীর অদূরে লোহিত সাগরে ডুবে যায়। সেই জাহাজের কাঠ, তক্তা ইত্যাদি মক্কায় নিয়ে এলে ছাদ তৈরির মালমশলাও জোগাড় হয়ে যায় এবং কোরেশরা কাবার আমূল সংস্কারের কাজে হাত দেয়। এই সময় কৃষ্ণ প্রস্তর হাজরে আসোয়াদকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু সংস্কারের কাজ শেষ হলে তাকে আবার কাবায় পুনঃস্থাপনের সময় ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সকলেরই এক দাবি যে এই গৌরবময় কাজের দায়িত্ব তার গোত্রকেই দেওয়া হোক। মতান্তর ক্রমে এমন জায়গায় পৌঁছাল যে, রক্তারক্তি হবার উপক্রম। কিন্তু মহম্মদের বুদ্ধিমত্তায় সেযাত্রা রক্ষা হল। হাজরে আসোয়াদকে একটা চাদরের উপর রাখা হল এবং সকল গোত্রের দলপতিরা চাদরের কানা ধরে তাকে কাবার ভিতরে নিয়ে এল। এই ঘটনার ফলে মহম্মদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি আল আমীন বা চির

(৬) ibid, Vol-II, P-159.

বিশ্বাসী, এই উপাধিতে ভূষিত হলেন। অনেকে আবার তাঁকে আল সাদিক বা বিশ্বাসী বলেও ডাকতে শুরু করল।[৭]

নবুয়ৎ প্রাপ্তি

এই সময় থেকেই মহম্মদের মনে সৃষ্টিকর্তা আল্লা সম্বন্ধে নানারকমের চিন্তা ভাবনা আসতে থাকে। তিনি বেশী করে নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। দ্বিতীয় বার সীরিয়া যাত্রাকালে তিনি সেখানে বেশ কিছু খ্রীস্টান ও ইহুদী সাধু প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ সালাপ করেন। তিনি তাদের আসমানী কেতাব তওরাৎ ও ইঞ্জিল দেখে নিজেকে ছোট ভাবতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবতে থাকেন যে, তাদের যদি এরকম একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ থাকত তবে কতই না ভাল হত। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সঙ্গে মাথা উচু করে কথা বলা যেত। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, যাদের তওরাৎ জ্ঞান নেই ইহুদীরা তাদের খুবই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। কাজেই ঐরকম একখানা কেতাব লাভ করাই যে তাঁর আল্লার আরাধনার মূল উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণা তা সহজেই অনুমান করা চলে।[৮]

যাই হোক, মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব খুবই ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পুরো রমজান মাস তিনি নিজেকে জাগতিক বিষয় থেকে মুক্ত রাখতেন এবং মক্কা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে, হেরা পর্বতের এক নির্জন গুহায় জপতপের মধ্যে কাটাতেন। ঐ সময় থেকে মহম্মদও হেরা পর্বতের সেই গুহায় যেয়ে তপস্যা করতে শুরু করেন। তিনি কিছুদিনের খাবার ও জল সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং খাবার ফুরিয়ে গেলে ঘরে ফিরে আসতেন।

পর্বর্তের গুহায় গিয়ে তপস্যা শুনলেই হিন্দুর মনে ধ্যান, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদির কথা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সমস্ত যৌগিক প্রক্রিয়া আরবের লোকদের জানা ছিল বলে মনে হয় না। তাহলে মহম্মদ তপস্যা করেছিলেন বলতে কি বোঝায় তা অনুসন্ধান করার বিষয়। মুসলমানদের উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গ নামাজ, দোয়া, মোনাজাত তখনও অজ্ঞাত ছিল। সুরা তাহা'র প্রথম আয়াতে আল্লা বলছেন, "শরীরকে ক্লেশ দেবার জন্য ইসলাম অবতীর্ণ হয় নি", এবং এর টীকা হিসাবে তফসীর হোসেনী বলছে যে, মহম্মদ প্রথমে একপায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করতেন। ফলে তাঁর পা ফুলে যায়। তখন এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লা তাঁকে দু পা'ই মাটিতে রাখতে বলেন।[৯]

---

(৭) Mohammad Encyclopaedia, Seerah Foundation (London), Vol-II, P-161

(৮) পূর্ববর্তী অধ্যায় 'মহাগ্রন্থ কোরান' দ্রষ্টব্য।

(৯) কোরআন শরীফ, গিরিশচন্দ্র সেন (হরফ), পৃঃ ৩৪৪

ইতিমধ্যে মহম্মদ চল্লিশে পা দিয়েছেন এবং নবীত্ব প্রাপ্তির দিনও আগতপ্রায় হল। তারপর এল সবেবরাত-এর সেই পুণ্য রাত্রি। অনুমান করা হয় যে ৬১০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে রমজান এই সবেবরাত হয়েছিল। হেরা পর্বতের গুহায় মহম্মদ তখন উপাসনায় মগ্ন। এমন সময় ফেরেস্তা জিব্রাইল সেখানে উপস্থিত হলেন। ডাকলেন, 'ইয়া আনতা রসুলুল্লা'' হে আল্লার রসুল। সেদিন জিব্রালই তাঁর ছয়লক্ষ ডানা বিশিষ্ট স্বমূর্তিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এক একটি ডানা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [১০]। প্রথম দর্শনে মহম্মদ অজ্ঞান হয়ে যান এবং জ্ঞান ফিরতে দেখেন যে জিব্রাইল পাশে বসে আছেন এবং মহম্মদের এক হাত তাঁর হাতে আর এক হাত তাঁর বুকে। তারপর জিব্রাইল বললেন, ''আপনি পড়ুন''। মহম্মদ বললেন, ''আমি উম্মী (নিরক্ষর)''। এই কথা জিব্রাইল আরও দুবার বললেন এবং মহম্মদও ঐ একই জবাব দিলেন[১১]। তারপর জিব্রাইল পাঠ করলেন সত্য ও অসত্যের পৃথককারী আসমানী কেতাব কোরানের প্রথম বাণী।'' আপনি পাঠ করুন আপনার মহিমাময় প্রভুর নামে ইত্যাদি''(৯৬/১-৫)। জিব্রাইল চলে গেলে ভয়ে বিস্ময়ে মহম্মদ আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে আসেন এবং খাদিজাকে গায়ে কম্বল চাপা দিতে বলেন (৭৩/১) (৭৪/১)।

ক্রমে তিনি খাদিজাকে সব খুলে বললেন এবং আল্লা তাঁর উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে চাইছেন তা পালন করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। খাদিজা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং আপন চাচাত ভাই আলিম ওয়াকার কাছে নিয়ে গেলেন। সব শুনে ধার্মিক পণ্ডিত ওয়াকা বলে উঠলেন, ''কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন'' (পবিত্র পবিত্র)। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর নবীত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলেন।

এর পর কিছুদিন ওহী (প্রত্যাদেশ) আসা বন্ধ থাকল। মহম্মদ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। অন্যান্য লোকেরাও উপহাস করতে শুরু করল যে আল্লা তাঁর নবীকে পরিত্যাগ করেছেন। এইভাবে যখন খুবই বিষণ্ণতার মধ্যে দিন কাটছে এমন সময় একদিন জিব্রাইল আবার আল্লার বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, ''শপথ পূর্বাহ্ণের, শপথ নিস্তব্ধ রাত্রির। আপনার প্রতিপালক আপনার উপর বিরূপ হননি বা আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। আপনার পরকাল ইহকাল

---

(১০) ঐ, পৃঃ ৫৯৩

(১১) পূর্ববর্তী 'মহাগ্রন্থ কোরান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অপেক্ষা শ্রেয়। অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এরূপ দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হবেন" (৯৩/১-৫)। অনেকের মতে দ্বিতীয় দিন অবতীর্ণ হয় সুরা মোদাচ্ছের (বসনাবৃত)-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত, "হে মোদাচ্ছের, ওঠ সতর্ক বাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা কর, তোমার পোশাক পবিত্র কর, অপবিত্রতা হতে দূরে থাক" (৭৪/১-৫)। এর কিছুদিন বাদে ওহী এল, "হে আল্লার রসুল, আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি না করেন তবে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না। এবং আল্লা আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না" (৫/৬৭)। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর থেকেই তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিজেকে আল্লার রসুল বলে প্রচার করতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা" কলেমাও এসে গেছে। হজরৎ জিব্রাইল নবীকে নামাজও শিক্ষা দিয়েছেন। বিবি খাদিজা সর্বপ্রথম কলেমা গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করলেন। তারপর ইসলাম কবুল করলেন চাচাত ভাই ৮ (মতান্তরে ১০) বছরের বালক আলি। এর মধ্যে একদিন তিনি বন্ধু আবু বকরকে তাঁর নবুয়ত লাভ, ওহী প্রাপ্তি ইত্যাদির কথা বললেন এবং সব শুনে আবু বকর তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আবু বকরের আসল নাম ছিল আবদুল কাবা এবং মহম্মদ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন আবদুল্লা বিন আবুকুয়াফা। তারপর একে একে ইসলাম কবুল করলেন যায়েদ বিন হারিস, উসমান বিন আফ্‌ফান, আবদুর রহমান, তালহা, যুবায়ের, আবু বকরের মেয়ে আসমা, ওমর-এর ভগিনী ফতেমা, ওমর এবং আরও অনেকে।

যায়েদ বিন হারিশ প্রথম জীবনে খাদিজার ক্রীতদাস ও মহম্মদের স্নেহের পাত্র ছিলেন। পরে মহম্মদ তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিজের পোষ্যপুত্র করেন। উসমান মুসলমান হন কারণ মহম্মদের মেয়ে রুকাইয়ার সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। রুকাইয়া মারা গেলে মহম্মদ তাঁর অপর মেয়ে উম্মে কুলসুমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। মুসলমানরা বদর যুদ্ধে জিতে যেদিন মদিনায় ফিরে আসে ঠিক সেই দিনই রুকাইয়ার মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে উসমান মুসলীম জগতের তৃতীয় খলিফা হন এবং গুপ্ত আততায়ীর হাতে মৃত্যু হয়। আবদুর রহমান ইসলামের শত্রু উমাইয়ার পরম বন্ধু ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। এই আবদুর রহমান মদিনায় গেলে বন্ধু সাদ তার

একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার সঙ্গে শয়ন করতে পাঠান।[১২] ওমর যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবীর কাছে গেলেন তখন নবীর অনুচরেরা ভাবল যে ওমর বুঝি নবীকে খুন করতে এসেছেন। যাইহোক শেষে অস্ত্র পরিত্যাগ করে মহম্মদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকর, উসমান ও ওমর তৎকালীন মক্কার বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং এঁদের ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের সঙ্গে আরও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং এইভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির তিন বছরের মধ্যে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়ে গেল।

প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার

এই সময় আয়াত অবতীর্ণ হল, "ফাসদায় বিমা তুমারু"—অর্থাৎ "আপনার উপর প্রদত্ত আদেশ প্রকাশ্যে প্রচার করুন। আপনার আত্মীয়-স্বজনকে আপনি সতর্ক করে দিন এবং যে সব বিশ্বাসী আপনাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি বিনয়ী হোন" (২৬/২১৪-১৫)। এই বাণীর দ্বারা আল্লা যেমন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার আজ্ঞা দিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে ইসলাম-বিরোধী কাফেরদের দ্বারা দমন-পীড়নের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত করে আসন্ন বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। তারপর একদিন মক্কার নিকটবর্তী সাফা পর্বতে উঠে কোরেশ বংশীয় বিভিন্ন গোত্রের লোকদের এক এক করে ডাকতে শুরু করলেন। যখন তারা এসে জমা হল তখন তিনি বললেন, "যদি তোমরা আল্লার শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে চাও তবে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে একেশ্বর আল্লার ভজনা কর। অবশ্যই আল্লা আমাকে তোমাদের সতর্ককারীরূপে পঠিয়েছেন।" তখন তারা বলল, "যদি তুমি এই পর্বত থেকে একটা ছোট পর্বত বার করে আনতে পার তবে তোমার কথা বিশ্বাস করব।"[১৩] এই ঘটনা পৌত্তলিকদের নেতা আবু লাহাব, আবু জাহাল, আবু সুফিয়ান ইত্যাদিকে উত্তেজিত করে তুলল এবং পৌত্তলিকদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূচনা করল। এই ঘটনার পর থেকেই তারা যে ভাবেই হোক, ইসলামের প্রসার বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হল।

আবু লাহাবের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং তার মত মহম্মদের সম্পর্কে

---

(১২) 'ইসলামে নারীর স্থান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১৩) The Koran, Georage Sale, P-367.

চাচা আবু জাহালও মহম্মদের চির শত্রুতে পরিণত হয়। কথিত আছে যে একদিন আবু জাহাল প্রতিজ্ঞা করে যে, নামাজের সময় মহম্মদ যখন সিজদা করবে তখন সে তরোয়াল দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলবে। যখন আবু জাহাল তার প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করতে গেল তখন দেখতে পেল একটা ভীষণাকৃতি সাপ উদ্যত ফণায় গর্জন করছে। সে তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। পরে বদর যুদ্ধে বন্দী হলে একে হত্যা করা হয়।

উপরিউক্ত ঘটনার পর থেকে পথেঘাটে চলাফেরা করাই মহম্মদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। লোকে তাকে শয়তান যাদুকর বলে উপহাস করতে লাগল। আবু লাহাবের স্ত্রী চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী গায়ে জঞ্জাল ছুঁড়ে মারল, চোখে-মুখে ধুলো ছুঁড়তে শুরু করে দিল। একদিন তিনি কাবার সামনে নামাজ পড়ছেন এমন সময় উকবা নামে এক ব্যক্তি একটা উটের পচা দুর্গন্ধময় নাড়ীভুঁড়ি এনে তাঁর পিঠের উপর ফেলে দিল। মেয়ে ফতেমা দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল (বুখারী-৩৫৬৭)। আর একদিন উকবা তাকে হত্যা করার জন্য গলায় চাদর পেঁচিয়ে পাক দিতে শুরু করল। সেই সময় আবুবকর সেখানে উপস্থিত না হলে সে তাঁকে মেরেই ফেলত (বুখারী-৩৫৬)। আর একদিন মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কাবার সামনে কোরান আবৃত্তি করছেন এমন সময় আবু জাহালের দল তাদের আক্রমণ করল। ছোটখাট একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল এবং তাতে খাদিজার পূর্বস্বামী আবু হালার ছেলে হারেস প্রাণ দিয়ে ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন। পরবর্তীকালে উকবা বদর যুদ্ধে বন্দী হলে তাকে হত্যা করা হয়।

মুসলমানদের মধ্যে ছয় ব্যক্তি খুবই সম্মানিত কারণ তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন আবু বকর, বিলাল, খাব্বাব, সোহাইব, সুমাইয়া ও আম্মার এবং আবুবকর বাদে আর সকলেই নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। বিলালকে খেজুর পাতার চাটাই দিয়ে মুড়ে ধোঁয়া দেওয়া হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে। খাব্বাবকে জ্বলন্ত আগুনের উপর শুইয়ে রাখা হয় এবং সোহাইবের দুই পায়ে দুটো উট বেঁধে দুদিকে চালিয়ে বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়। সোহাইবের ছেলে আম্মারকে নৃশংসভাবে প্রহার করা হয় এবং স্ত্রী সুমাইয়াকে আবু জাহাল বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করে। এইভাবে সুমাইয়া ইসলামের প্রথম নারী শহীদ হন। বিলাল ক্রীতদাস ছিল এবং আবু বকর তাকে কিনে মুক্ত করেন। বিলাল ছিল যেমন দীর্ঘদেহী তেমনি ছিল তাঁর গলার জোর। এই কারণে তাঁকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জীন করা হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরৎ

ক্রমে অত্যাচার এত বৃদ্ধি পেল যে মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বললেন। ইসলামে এটাই হল প্রথম হিজরৎ বা ধর্মের জন্য দেশত্যাগ। নবীত্বপ্রাপ্তির পঞ্চম বছরে রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম দল আবিসিনিয়া যাত্রা করল। এর পর ৮৩ জনের দ্বিতীয় দল এবং ১০০ জনের তৃতীয় দল যাত্রা করল।[১৪] এই দলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আবু তালেবের ছেলে জাফর, উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া। আবিসিনিয়ার খ্রীস্টান রাজা নাজ্জাসী জাফরের কাছে ইসলামের মূল কথা শুনে মুগ্ধ হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। জাফর খুবই বাগ্মী ছিলেন এবং তাঁর বাগ্মীতার ফলেই নাজ্জাসী মুগ্ধ হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। কোরেশরা এই দলটিকে পথে আটকানোর চেষ্টায় জেদ্দা পর্যন্ত ধাওয়া করে কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখে যে আবিসিনিয়ার জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। পরে তারা নাজ্জাসীর কাছে প্রচুর উপঢৌকন সহ দূত পাঠাল এবং মুসলমানদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু নাজ্জাসী রাজী না হওয়ায় তাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল। তাদের এই ব্যর্থতাকে লক্ষ্য করে আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, "যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর কেহ জয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ব্যতীত কে সে, যে তোমদের সাহায্য করবে? বিশ্বাসীগণ আল্লার উপরেই নির্ভর করে থাকে"(৩/১৬০)।

এর পর কোরেশরা মহম্মদকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করার জন্য অন্য রাস্তা ধরল। উৎবা বিন রাবিয়া নামে একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মহম্মদের কাছে পাঠাল এবং সে তাঁকে নানারকম প্রলোভন দেখাতে থাকল। সে মহম্মদকে অনেক সম্পদ, সুন্দরী নারী এমন কি সমস্ত আরবের অধীশ্বর বানাবার লোভও তাঁকে দেখালো। কিন্তু মহম্মদ সে সব কথায় কান না দিয়ে সুরা অম্বিয়া অবৃত্তি করতে থাকলেন এবং কোরান তিলয়োয়াতে মুগ্ধ উৎবা ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে গেল। শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে কোরেশরা আরও মরিয়া হয়ে উঠল। একদিন সাফা পর্বতে মহম্মদকে একা দেখতে পেয়ে আবু জাহল তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারল। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন মহম্মদের অপর এক চাচা হামজা বর্শা দিয়ে আবু জাহলের মাথা ক্ষতবিক্ষত

(১৪) কাবার পথে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭

করে দিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন বাদেই হামজা ইসলাম গ্রহণ করেন। হামজা ইসলাম গ্রহণ করাতে মুসলমানরা শক্তিশালী হল, সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকদের দলও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সময় তারা মুসলমানদের একঘরে করল এবং আবু তালেব সব মুসলমানদের নিয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এর নাম হল "শিআবে আবু তালেব" বা আবু তালেবের শিবির। এই সময় মুসলমানরা খিদের জ্বালায় গাছের পাতা ও চামড়া সিদ্ধ করে খেতে বাধ্য হয়। এই সময়েই বিবি খাদিজা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্প কিছুদিন পরে মারা যান।

এইভাবে মক্কায় বসবাস করা যখন একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন মহম্মদ তাঁর পালিতপুত্র যায়েদকে সঙ্গে করে মক্কার নিকটবর্তী তায়েফ নগরে চলে যান। কিন্তু তায়েফবাসীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে মক্কার কোরেশদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তারা মহম্মদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল। উপরন্তু তারাও কোরেশদের মতই অত্যাচার শুরু করে দিল।

আল আকাবার শপথ

ইতিমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। নবীত্ব লাভের দশ বছর পরে, ৬২০ খ্রীস্টাব্দে ইয়াসরিব (মদিনার পূর্বনাম)-এর খাজরাজ বংশীয় কিছু ইহুদী মক্কায় হজ করতে এসে মহম্মদ ও তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মের কথা শুনতে পেল। যেহেতু তাদের তত্তরাৎ গ্রন্থে আরবে এরকম একজন নবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বাণী ছিল তাই তারা বুঝতে পারল যে মহম্মদই সেই নবী। ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা মহম্মদের নবীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল। পরের বছর আবার খাজরাজ গোত্রের দশজন ও আউস গোত্রের দুইজন হজ করতে এসে মহম্মদের সঙ্গে আল আকাবা নামক স্থানে গোপনে মিলিত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করার শপথ নিল। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা আল আকাবার প্রথম শপথ নামে খ্যাত। এর পরের বছর সংঘঠিত হল আল আকাবার দ্বিতীয় শপথ এবং সেই সময় তারা মহম্মদকে ইয়াসরিবে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাল। এই ঘটনার পরই মহম্মদ ইয়াসরিবে হিজরৎ করবেন বলে মনস্থির করলেন।

মেরাজ

উপরিউক্ত আল আকাবার দুই শপথের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মহম্মদের জীবনে মেরাজ বা আকাশপথে স্বর্গ ভ্রমণের ঘটনা ঘটে। কোরানের ১৭ নং সুরা বা সুরা বনি ইসরাইল-এর প্রথম আয়াতে এই মেরাজভ্রমণের

উল্লেখ আছে বলে অনেকে ঐ সুরাকে সুরা মেরাজ বলেন। সম্ভবত ৬২১ খ্রীস্টাব্দের রজব মাসের ২৭ তারিখে এই অপার্থিব ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐদিন তিনি ফেরেস্তা জিব্রাইল আনীত অতি দ্রুতগামী বোরাক-বাহনে করে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন স্বর্গে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের দেখতে পান। তারপর তিনি আল্লার কাছে যান। তিনি আল্লার এত কাছে যান যে উভয়ের মধ্যেকার দূরত্ব দুই ধনুকের থেকেও কম হয়ে যায়।[১৫] ঐ দিনই আল্লা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। ফেরার পথে মহম্মদ নরকও ঘুরে দেখেন এবং পাপীদের সাজা প্রত্যক্ষ করেন। নরকে এক জায়গায় তিনি দেখেন যে একটা লোক নদীতে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করছে কিন্তু ফেরেস্তারা পাথর ছুঁড়ে আবার তাকে জলে নামিয়ে দিচ্ছে। জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করে নবী জানতে পারেন যে লোকটা সুদ খেয়েছিল তাই এই শাস্তি। নরকে তিনি আবু তালেব সহ অন্যান্য পৌত্তলিক কোরেশদেরও শাস্তি ভোগ করতে দেখতে পান। ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে কেয়ামতের পরেই কেউ স্বর্গে কেউ নরকে যাবে। কাজেই তার আগে স্বর্গ ও নরক জনশূন্য থাকারই কথা। কিন্তু নবী যখন নরকে লোকজন দেখেছেন তখন তাকেও মিথ্যা বলা চলে না। স্বর্গ ভ্রমণকালে নবী আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ধনীদের থেকে গরীব লোকের সংখ্যাই সেখানে বেশী।[১৬] কিন্তু ইসলামী শাস্ত্রমতে স্বর্গে প্রবেশ করার পর সকলেই ৬০ হাত দীর্ঘ ও পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল দেহকান্তি পাবে এবং স্বর্গীয় রেশমী পোশাক পরে থাকবে। সেই অবস্থায় নবী কেমন করে গরীব ও ধনী স্বর্গবাসীদের সনাক্ত করেছিলেন তাও চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।

ঐদিন রাত্রে নবী চাচা আবু তালেবের মেয়ে উম্মে হানির বাড়ীতে ছিলেন এবং সেখান থেকে ফেরেস্তারা তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ছিনাচাক করে এবং তারপর বোরাকে চাপিয়ে জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দেশ বা মসজিদুল আকসায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে যাত্রা করে তিনি সপ্তস্বর্গ পরিভ্রমণ করেন। তিনি প্রথম স্বর্গে হজরৎ আদমকে, দ্বিতীয় স্বর্গে হজরৎ ঈশাকে, তৃতীয় স্বর্গে হজরৎ ইউসুফকে, চতুর্থ স্বর্গে হজরৎ মুসাকে এবং সপ্তম স্বর্গে হজরৎ ইব্রাহীমকে দেখতে পান এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। তিনি

---

(১৫) তখনকার দিনে বেদুইনদের মধ্যে রীতি ছিল যে, কোন দুই ব্যক্তি অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের শপথ নিলে দুজনে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আকাশে তীর ছুড়ত। তখন তাদের মধ্যেকার দূরত্ব দুই ধনুকের চেয়ে কম হত। আল্লা ও মহম্মদের মধ্যেকার দূরত্ব দুই ধনুকের থেকে কম হয়েছিল বলতে কোথায় তাঁদের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল।

(১৬) মুসলীম-৬৫৯৭

স্বর্গের সদরতোল মন্তহা, বায়তুল মামুর, হওজ্জ কওসর ও নহরোন রহমত ইত্যাদি পুণ্যস্থান, সরোবর, নদী ইত্যাদি দর্শন করেন। হেজাবে নূর বা জ্যোতির আবরণ পর্যন্ত গিয়ে জিব্রাইল আর যেতে চাইল না। তারপর তিনি জ্যোতি ও অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হলেন যেখানে বোরাকও যেতে পারল না। তারপর রফ রফ নামক এস্রাফিল (এক জন ফেরেস্তা)-এর মন্দিরে আরোহণ করে তিনি আল্লার আরসের নিকটবর্তী হন। তিনি একের পর এক উচ্চ থেকে উচ্চতর, পবিত্র থেকে পবিত্রতর স্থানে আরোহণ করতে করতে আল্লার সঙ্গ লাভ করেন। স্বর্গের বিভিন্ন স্থান দর্শন করার পর ফেরার পথে নরক দর্শন করে বায়তুল মোকাদ্দেসে ফিরে আসেন। সেখান থেকে শেষে মক্কায় ফিরে আসেন। এই ভ্রমণ কারো মতে তিন ঘণ্টা, কারও মতে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। নবীর এই স্থূল শরীরে স্বর্গভ্রমণ যারা অসম্ভব মনে করে তারা আল্লার অলৌকিক ক্ষমতায় অবিশ্বাস করে, কাজেই তারা কাফের। নবীর এই স্বর্গভ্রমণের সত্যতার স্বপক্ষে সর্বপ্রধান ও অকাট্য প্রমাণ হল এই যে, নবী জেরুজালেমে এর আগে না গিয়েও সেখানকার বায়তুল মোকাদ্দেস বর্ণনা করতে সক্ষম হন।

উপরিউক্ত মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। কোরান শরীফে আল্লাতায়লা যখন নিজের মুখে মেরাজের ঘটনা স্বীকার করেছেন (১৭/১) তখন এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকার কথা নেই। কিন্তু কথা হল সময় নিয়ে। কোরানে আল্লা নিজেই বলেছেন স্বর্গের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বছরের সমান (২২/৪৭)। কাজেই পার্থিব তিন বা চার ঘণ্টার মধ্যে যদি মেরাজ হয়ে থাকে তবে তা স্বর্গের কয় সেকেন্ড বা কয় মুহূর্ত সময় হবে তা হিসাব করে বলা যেতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে নবী সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করেছেন, আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, অন্যান্য নবীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছেন, আল্লা ও মুসার সঙ্গে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। উপরন্তু নরকে পাপীদের শাস্তি দেখেছেন, এটা একটু অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া কেয়ামতের আগেই স্বর্গে ও নরকে পৃথিবীর লোকজন পৌঁছে যাবার বিস্ময়কর ঘটনা তো আছেই। নবী পিতা আবদুল্লাকে নরকে দেখেছেন (মুসলীম-৩৯৮) এবং আল্লার কাছে দরবার করে চাচা আবু তালেবকে গভীর যন্ত্রণাদায়ক নরক থেকে কম যন্ত্রণাকর নরকে নিয়ে এসেছেন (মুসলীম-৪০৯)। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কৌতূহলের ব্যাপার হল, নবী মহম্মদ বর্তমানে কোথায় আছেন? অন্যান্য নবীদের মত তিনি কি কেয়ামতের আগেই স্বর্গে চলে গেছেন? এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু ইসলামী শাস্ত্রে আরও বলা হচ্ছে যে, কেয়ামতের দিন ৭০ হাজার উম্মত সহ তিনি সর্বপ্রথম পুল সেরাত পার হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেবেন।[১৭]

ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের শাস্ত্রমতে পৃথিবীর উপরে প্রথমে চন্দ্র-মণ্ডল, তারপর সূর্যমণ্ডল এবং তারপর স্বর্গীয় গোলক বা নক্ষত্র মণ্ডল। এই নক্ষত্রমণ্ডলের উপরেই স্বর্গের অবস্থান। কাজেই বিজ্ঞান যদি আজ ১ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে কোন নক্ষত্র অবিষ্কার করে তবে স্বর্গও অতটা দূরে সরে যেতে বাধ্য। এবং এই কারণেই ঐসকল শাস্ত্রে বিশ্বকে অসীম বলা যায় না, কারণ তা হলে স্বর্গের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে ১৭শ শতাব্দীতে যখন ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা এবং ফরাসী দার্শনিক ডেকার্তে তাঁর Le Monde গ্রন্থে বিশ্বকে অসীম বলে উল্লেখ করলেন তখন তাঁর খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্মান্ধদের রোষানলে পতিত হলেন এবং হল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন। কাজেই হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরের স্বর্গে নবী মহম্মদের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভ্রমণ করে ফিরে আসাটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। এই সমস্ত প্রসঙ্গে হিন্দু-শাস্ত্র বলে,

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে।।

—অর্থাৎ, শুধু (অন্ধের মত) শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয় করা চলে না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি জন্মলাভ করে, অথবা,

অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যাক্তং পদ্মজন্মনা।

—অর্থাৎ, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন তবে তাও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে। সব থেকে বড় কথা হল, অনুশাসনের দ্বারা মানুষের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তব্ধ করে রাখলে মানবসভ্যতার অগ্রগতিও স্তব্ধ হয়ে যায়। বর্তমান মুসলীম সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার পিছনে এটাও একটা অন্যতম প্রধান কারণ।

মদিনায় হিজরৎ

যাই হোক, ইতিমধ্যে পৌত্তলিক কোরেশদের দল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোসাই নির্মিত দারুণ নাদওয়া সভা কক্ষে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে মহম্মদকে হত্যা করা হবে। প্রথমে অনেকে এই প্রস্তাব দিল যে, তাঁকে একটা ঘরে বন্দী করে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে মেরে ফেলা হোক। অন্য অনেকে প্রস্তাব দিল যে তাঁকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু

(১৭) হাদিস শরীফ, রফিক উল্লাহ (হরফ), পৃঃ ২৯৬।

আবু জাহল সব প্রস্তাব নাকচ করে হত্যার প্রস্তাব দিল। উপরন্তু এও ঠিক হল যে, সব গোত্রের লোক একসঙ্গে মিলে এই হত্যা কার্য সম্পন্ন করবে এবং তাহলে হাসেম গোত্র (মহম্মদ যে গোত্রভূক্ত)-এর লোকেরা কোন গোত্রের উপর রক্তপণ দাবি করতে পারবে না। দেরী করলে খবর পেয়ে মহম্মদ গা ঢাকা দিতে পারে, তাই সেই রাত্রেই হত্যার পরিকল্পনা করা হল। কিন্তু এ খবর গোপন থাকল না এবং মহম্মদ সেইদিনই রাতের অন্ধকারে প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে সঙ্গে করে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করলেন। সেটা ছিল ৬২২ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন। দাসীপত্নী মারিয়া নীচু হলে তার পিঠে পা দিয়ে পাঁচিল টপকে নবী বাড়ি থেকে বাইরে আসেন। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে হিজরত নামে খ্যাত এবং এইদিন থেকেই হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। প্রথমে তাঁরা মক্কা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে সুর পর্বতের এক গুহায় আত্মগোপন করেন এবং সেখানে ৩ দিন ও ৩ রাত অবস্থান করেন।

ইতিমধ্যে কাফেরের দল পূর্বপরিকল্পনা মত মহম্মদের বাড়ীতে হামলা করল এবং মহম্মদের বিছানায় আলিকে শুয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারল যে আসল লোক পালিয়েছে। আলিকে তারা খুব মারধর করল তারপর চলে গেল আবু বকরের বাড়ী। সেখানেও তারা আবু বকরকে না পেয়ে আসমাকে মারধর করল এবং চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে তারা ঘোষণা করে দিল যে, মহম্মদ ও আবু বকরকে যে মৃত বা জীবিত অবস্থায় উপস্থিত করতে পারবে তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। পরদিন তারা এক পদচিহ্ন বিশারদকে নিয়ে এল এবং তাকে অনুসরণ করে সুর পর্বতে পৌছে গেল। যে গুহায় মহম্মদ ও আবু বকর লুকিয়ে ছিলেন তারা তার এত কাছে পৌছাল যে তাদের ছায়া গুহার মধ্যে এসে পড়ল। এ সময় এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ একটা মাকড়শা এসে সেই গুহার মুখে জাল বুনে দিল। সে জাল দেখে আবু সুফিয়ানের দলের লোকেরা গুহার ভিতরে মানুষ আছে সন্দেহ না করে চলে গেল। এই ঘটনাকে স্মরণ করে পরে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করলেন, "ঘরের মধ্যে মাকড়শার ঘরই তো সর্বাপেক্ষা দুর্বল" (২৯/৪১)। অথচ সেই দুর্বলতম অস্ত্র দিয়েই তিনি তাঁর নবীর প্রাণরক্ষা করলেন। এই সময় ভয়ের চোটে আবুবকর মহম্মদকে বলেন, "আমরা তো মাত্র দুজন, ওরা তো অনেক"। উত্তরে আল্লানির্ভর মহম্মদ বলেন, "ভুল করছ আবু বকর, আরও একজন আমাদের সঙ্গে আছেন, তৃতীয় ব্যক্তি আল্লা"(৯/৪০)।

এই তিন দিন আসমা রাতের অন্ধকারে তাঁদের খাবার পৌছে দিত। চতুর্থ দিন পূর্বপরিকল্পনা মত একজন পথপ্রদর্শক দুটি উট হাজির হল। তিনটি উটকে

এই উদ্দেশ্যে বিগত চারমাস ধরে বাবলাগাছের তাজা পাতা খাইয়ে তরতাজা করা হয়েছিল। নবী মহম্মদ যে উষ্ট্রিটির সওয়ার হলেন তার নাম ছিল আল কাসোয়া। এই আল কাসোয়া ছিল আরবের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী উট। প্রতি বছর মদিনায় উটের দৌড় অনুষ্ঠিত হত এবং সমস্ত আরব দেশের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী উট তাতে অংশগ্রহণ করতো। সেই উটের দৌড়ে আল কাসোয়া প্রতিবছর জয়ী হতো। শুধু একবার মাত্র সে এক বেদুইনের উটের কাছে পরাজিত হয়েছিল (বুখারী-৪০৩)। নবীর জীবনের সাথে আল কাসোয়ার নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নবী আল কাসোয়াকেই তাঁর বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর আল কাসোয়ার পিঠে চড়েই তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। বিদায় হজের সময় এই আল কাসোয়াতে চড়েই তিনি তাওয়াফ করেন এবং বিদায় হজের ভাষণ দেন।

সুর পর্বত ত্যাগ করার পর তাঁরা প্রচলিত সোজা রাস্তা ছেড়ে হেজাজ পর্বতের মধ্য দিয়ে, যে রাস্তায় সচরাচর কেউ যাতায়াত করে না, সেই রাস্তা ধরলেন। যাত্রা করার সেইদিন রবিউল আওয়ল মাসের ৪ তারিখ এবং খ্রীস্টীয় ৬২২ সালের ২০শে জুন ছিল। সুতরাং নবীর বয়স তখন ৫৩ বছর ছিল। আবু বকরের মেয়ে আসমা পথের খাবার তৈরি করে দিয়েছিল এবং আবু বকরের ছেলে আবদুল্লা ও চাকর ফুহেরা যাত্রার অন্যান্য বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে মক্কার লোকালয়ের পাশ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে দ্রুতবেগে উট চালিয়ে ভোর ভোর সময় তাঁরা সমুদ্রতীরবর্তী ওসফান নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন।

ঐ সময়টা (জুন মাস) ছিল আরবের প্রচণ্ড গরমের সময় এবং সেই কারণে দিনের বেলা পথ চলা সম্ভব ছিল না। ভোরবেলা তাঁরা বেদাই নামক এক বসতিতে উপস্থিত হলেন এবং নিকটবর্তী কোদেদ নামক স্থানে আহার ও বিশ্রাম করে বিকালবেলা আবার রওনা দিলেন। মক্কা থেকে এত দূরে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেবে এবার তাঁরা প্রধান পথ ধরলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই সুরাকা নামে এক দুর্বৃত্তের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। এরকম গল্প প্রচলিত আছে যে সুরাকা নবীকে চিনতে পারে এবং কোরেশদের দ্বারা ঘোষিত পুরস্কারের আশায় তাদের দিকে ধাওয়া করে। কিন্তু অলৌকিকভাবে তার ঘোড়ার সামনের দু পা মরুভূমির বালিতে বসে যায় (বুখারী- ৩৬১৮)। অন্য মতে, সুরাকা একা ছিল বলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। বরং নবী ও

আবু বকর তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, নবীকে পালিয়ে যেতে দেখার কথা সে যেন কাউকে প্রকাশ না করে।

নবী ও আবু বকরের পরিবারের লোকজন আরও কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে এবং তাদের উপর আর কোন অত্যাচার করা হয়নি। নবীর কন্যা রোক্যো তার স্বামী ওসমানের সঙ্গে নবীর আগেই মদিনায় পৌছে গিয়েছিল। আলি ৩ দিন পরে মদিনা যাত্রা করে। নবীর অন্য দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফতিমা নবীপত্নী বিবি সৌদার সঙ্গে আরও কয়েক সপ্তাহ পর মদিনা যাত্রা করেন। নবীর বাগদত্তা স্ত্রী শিশু বিবি আয়েশা বেশ কিছুদিন পরিবারের সঙ্গে মক্কাতেই থাকলেন। এরা একে একে সকলেই মদিনায় উপস্থিত হলেন এবং কোরেশরা তাদের আটকাবার কোন চেষ্টা করেনি। এদিকে বারিদা নামে এক দুর্ধর্ষ দলপতি নবীকে চিনতে পেরে ৭০ জন অনুচর সহ নবীকে অনুসরণ করে এবং নবী অলৌকিকভাবে সেযাত্রা রক্ষা পান (কাবার পথে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২)। সীরিয়া যাবার প্রচলিত পথ ধরেই তাঁরা অগ্রসর হতে থাকলেন। লোহিত সাগরের তীরবর্তী এই পথ ধরেই বণিকরা যাতায়াত করে। বদর প্রান্তর পর্যন্ত এই পথ ধরে অগ্রসর হবার পর তাঁরা পূর্ব দিকের মদিনার পথ ধরলেন। মদিনা পৌছুতে যখন মাত্র দু দিনের পথ বাকী তখন একটা উট পথশ্রমে কাতর হয়ে পড়ল। কাছের লোকালয় থেকে একটা নতুন উট ও পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে আবার শুরু হল যাত্রা। এইভাবে মক্কা ত্যাগ করার আট দিন পরে সোমবার নবী মদিনার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আকিক নামক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং মদিনার সুবজ মরূদ্যান তাদের দৃষ্টিগোচর হল সেদিনই, অর্থাৎ ২৮শে জুন সোমবার তাঁরা মদিনার উপকণ্ঠে, সবুজ খেজুর গাছ ও সবুজ ঘাসে ঢাকা কোবায় উপস্থিত হলেন।

কোবায় আমর, খাজরাজ ও আউস গোত্রের লেকেরা বসবাস করত। মদিনায় পৌছে কি রকম অভ্যর্থনা পাবেন এ ব্যাপারে নবীর সন্দেহ ছিল। তাই তিনি ঠিক করলেন যে কোবায় কিছুদিন অবস্থান করার পর মদিনায় প্রবেশ করবেন। তাই তিনি পথপ্রদর্শককে আমর গোত্রের বসতির দিকে অগ্রসর হতে বললেন। ইতিমধ্যে নবীর মদিনায় আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন এসে নবীকে ঘিরে ভীড় জমিয়ে ফেলল এবং আনন্দোল্লাস করতে শুরু করে দিল। সোমবার থেকে শুক্রবার, নবী কোবায় অবস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে আলিও মদিনায় পৌঁছে গেল। নবী কোবায় একটা মসজিদের জন্য ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করলেন। শুক্রবার সকালে তিনি আবার আল কাসোয়ায় সওয়ার হলেন এবং মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথে দুপুরবেলা আরও প্রায় ১০০ জন মুসলমানের সঙ্গে যোহরের নামাজ সারলেন। পরে এখানে একটা সৌধ নির্মাণ করা হয় যার নাম 'মসজিদ আল জুমআ' বা শুক্রবারের মসজিদ। এইদিন থেকেই জুমআর বিশেষ জামাতের নামাজের প্রচলন শুরু হয়।

মদিনায় পৌঁছে বেশ বড় একটা উঠোনের মত জায়গায় উট থেকে নামলেন। পাশেই ছিল আবু আইয়ুব নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী। এই আবু আইয়ুবের বাড়ীতেই নবী আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই বাড়ীতে নবী তার পরিবার-পরিজন সহ সাত মাস অবস্থান করেন। আবু আইয়ুব নবীকে পুরো একতলাটা ছেড়ে দেয়। পরিত্যক্ত যে উঠোনের মত জায়গাটায় নবী উট থেকে নামেন সেটা ছিল দুজন অনাথ বালকের জমি। নবী সেই জায়গাটা কিনে মসজিদ তৈরি করবেন স্থির করেন। জমির দাম দশ স্বর্ণমুদ্রা ধার্য হলে আবু বকর তা দিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের লাগোয়া জমিতে আরও দুটো কোঠা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। একটা নবীপত্নী সৌদা অন্যটা বাগদত্তা-পত্নী আয়েশার জন্য। ইতিমধ্যে নবী তাঁর পালিত পুত্র যায়েদের সাহায্যে তাঁর পরিবারের সবাইকে মদিনায় নিয়ে আসলেন এবং সেই সঙ্গে আয়েশা ও তাঁর মা'ও মদিনায় চলে এলেন। এর প্রায় ৬ মাস পরে, শীতকালে, মদিনার উপকণ্ঠে সুন নামক অঞ্চলে, আবু বকরের বাড়ীতে নবীর সাথে বিবি আয়েশার সাদীমুবারক সুসম্পন্ন হয়।

কথিত আছে যে, নবী কার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করবেন এই নিয়ে মদিনাবাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আবু আয়ুবের বাড়ীর সামনে আল কাসোয়া হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং নবী বলে ওঠেন, "ইনসাল্লা, এটাই আমার আবাসস্থল"(বুখারী -৩৬১৮)। অনেকের মতে আবু আয়ুবের যে বাড়ীতে নবী আতিথ্য গ্রহণ করেন সেই বাড়িটি নবীর জন্মের হাজার বছর আগে ইয়মনের বাদশা ৪০০ জন ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নবীর হিজরৎ যাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি করে রেখেছিলেন। উপরন্তু কথিত আছে যে আউস ও খাজরাজ বংশ এবং আবু আয়ুব স্বয়ং ঐ পণ্ডিতদের বংশধর ছিলেন। আতিথ্যের প্রথম দিন আবু আয়ুবের পত্নী নবীকে যে খাদ্য পরিবেশন করেছিল তাতে অত্যধিক পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ থাকায় নবী তা না খেয়ে ফেরত দেন।

এব্যাপারে নবী বলতেন যে, কাঁচা পেয়াজ রসুন বা ঐ ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে কেউ যেন মসজিদে না আসে।

তৎকালীন মদিনায় ইহুদী, খ্রীস্টান এবং পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদী (হানিফিয়া) আরবরা বসবাস করত। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দলাদলি, কলহ, বিবাদ লেগেই থাকত। প্রায়ই তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। যে বছর নবী তায়েফে আশ্রয় না পেয়ে ফিরে এলেন সেই বছরই ছয়-সাত জন মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক মক্কায় হজ করতে আসে। সৌভাগ্যক্রমে মিনায় নবীর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় এবং তারা নবীকে মদিনায় আসার আমন্ত্রণ জানায় এবং আশা প্রকাশ করে যে নবী মদিনায় গিয়ে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করলে তাদের অন্তর্কলহ দূর হবে এবং মদিনায় শান্তি ফিরে আসবে। আগামী বছর হজের সময় তারা আসবে এই কথা বলে তারা সে বার মদিনায় ফিরে যায়।

খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে কালদীয় সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুজালেম দখল করে বেশীরভাগ ইহুদীকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। ঐ সময় তাড়া খেয়ে ইহুদীদের কয়েকটি গোষ্ঠী উত্তর আরবে পালিয়ে যায়। নজির কানুইকা ও কুরাইজা গোষ্ঠীর ইহুদীরা তখন মদিনায় বসতি স্থাপন করে। অপর দিকে ইয়েমেন থেকে দুটি আরব গোষ্ঠী, খজরাজ ও আউস, সীরিয়ায় বসতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত মদিনায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করে। প্রথমে বসতি স্থাপন করার ফলে মদিনায় ইহুদীদেরই প্রাধান্য ছিল। অন্য দিকে খাজরাজ ও আউস গোষ্ঠীর আরবরা নিজেদের মধ্যেকার রেষারেষি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ক্রমে আউস ও খাজরাজদের মধ্যেকার ঝগড়া ইহুদীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয় এবং নজির ও কুরাইজারা আউসদের পক্ষ নেয় এবং কানুইকারা খাজরাজদের পক্ষ নেয়। নবীর মদিনায় আসার চার বা পাঁচ বছর আগে এই দুই দলের মধ্যে "বোয়াস"-এর যুদ্ধ হয় এবং তাতে আউসদের জয় হয়। নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত এই ঝগড়া-বিবাদ তাদের নিজেদের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় তারা ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে শান্তিতে বসবাস করার চেষ্টা চালাচ্ছিল এবং খাজরাজ গোত্রের সম্মানীয় ব্যক্তি আবদুল্লা বিন ওবেকে মদিনা সর্বসম্মত শাসনকর্তা নিযুক্ত করার কথা ভাবছিল।

পরের বছর মদিনা থেকে ১২ জন তীর্থযাত্রী এল, যাদের মধ্যে ১০ জন খাজরাজ ও ২ জন আউস গোত্রের লোক ছিল। এখানে বলে নেওয়া উচিত হবে যে, নবী মহম্মদের মা আমিনা খাজরাজ গোত্রের মেয়ে হবার দরুন নবীর শরীরেও

খাজরাজ গোত্রের রক্ত ছিল। যাই হোক, খুব সম্ভবত ৬২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবীর সঙ্গে ঐ ১২ জন তীর্থযাত্রীর মিনার কাছা কাছি আকাবা নামক একটি গোপন স্থানে কথা বার্তা হয়। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং নবীকে আল্লার রসুল বলে মান্য করবে। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনা "আল আকাবার প্রথম অঙ্গীকার" নামে খ্যাত। ইতিমধ্যে মদিনাতেও ইসলামের অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে গেছে। এই সময় মদিনায় যে সব ধর্মান্তরকরণ হয় তা স্ব-ইচ্ছাতেই হয় এবং তখন বল প্রয়োগের দ্বারা ধর্মন্তকরণের কোন প্রশ্নই ছিল না।

এইভাবে আরও এক বছর কেটে গেল। হজের সময় আগত হল। নবী ইতিমধ্যে মদিনায় ইসলামের অগ্রগতির খবর পাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুসাব নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে মদিনার মুসলমানদের একটি দল মক্কায় হজ করতে এল। পূর্ব পরিকল্পনা মত মিনার অনতিদূরে আকাবা নামক সেই নির্জন স্থানে নবী রাতের অন্ধকারে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই দলে মোট ৭৩ জন ছিল, ৬২ জন খাজরাজ ও ১১ জন আউস। তারা এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, নবী মদিনায় গেলে তারা প্রাণদিয়েও নবীর প্রাণ রক্ষা করতে প্রস্তুত। এই ঘটনা "আল আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার" নামে খ্যাত। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই নবী মক্কার মুসলমানদের মদিনায় চলে যেতে আদেশ করলেন। মক্কা থেকে মদিনা ১৮০ মাইল পথ এবং সাধারণ ভাবে এই পথ অতিক্রম করতে ১১ দিন লাগে। দ্বিতীয় অঙ্গীকারের দু থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে, মহরম মাস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরৎ শুরু হয়ে যায়। প্রায় ১০০ থেকে ২০০ লোক প্রথম মদিনায় পৌছে যায়। কয়েক মাসের মধ্যে মক্কার এক-চতুর্থাংশ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ল। আগেই বলা হয়েছে যে মক্কা থেকে আগত এই সব মুসলমানদের "মুহাজীর" (উদ্বাস্তু) ও মদিনার মুসলমানদের "আনসার" (সাহায্যকারী) বলা হত। সবশেষে নবী বন্ধু আবু বকরের সঙ্গে মদিনায় পৌছলেন যা আগেই বলা হয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে উপরিউক্ত আকাবার দুই অঙ্গীকারের মধ্যবর্তী রজব মাসে নবীর মেরাজভ্রমণ সম্পন্ন হয়।

যাইহোক, নবীর মদিনা আগমনের কালে এবং ইসলামের প্রভাবে আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যকার অন্তর্কলহ অনেকটাই প্রশমিত হল। এর ফলে মদিনা-বাসীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে, আল্লার রসুল সত্যি সত্যিই মদিনায় শান্তি স্থাপন করতে সমর্থ হবেন। তাই সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিত ভাবে আবদুল্লার বদলে নবীকেই মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান মনোণীত করল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মদিনার পুরানো নাম ইয়াসরিব-এর বদলে নতুন নামকরণ করল "মদিনাতুন্নবি" বা "নবীর নগরী মদিনা।" নবীও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এক সনদ তৈরি করলেন এবং

সকল সম্প্রদায়ের দলপতিদের দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করিয়ে তাকে একটা সংবিধানের রূপ দিলেন। মুসলমানরা এই সনদকে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ ও গৌরব অনুভব করেন। উপরিউক্ত সনদের মূল বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হল।

"বিসমিল্লা রহমানির রহিম" (পরম করুণাময় আল্লার নামে শুরু হল)।

আল্লার রসুল মহম্মদ, বিশ্বাসিগণ ও তাদের সাহায্যকারীদের তরফ থেকে এই সনদ বলবৎ করা হল। (১) মুহাজীরদের মধ্যেকার হত্যার রক্তপণ মুহাজীররাই বহন করবে। মদিনার অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম চলবে। (২) যদি কেহ বিদ্রোহ করে বা শত্রুতা করে (বিশেষ করে মক্কার কোরেশদের পক্ষ অবলম্বন করে) তবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে মিলিত হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। (৩) কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য কোন বিশ্বাসীর প্রাণদণ্ড হবে না এবং কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সমর্থন করা চলবে না। (৪) যদি কোন ইহুদী বিশ্বাসীদের অনুসরণ করে তবে বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা হবে এবং তাকে আহত করা বা তার শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না। (৪) কোন অবিশ্বাসী মক্কার কোন ব্যক্তিকে টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে বা আশ্রয় দিতে পারবে না। (৫) যে কেউ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করলে সমস্ত মুসলমান তার বিরুদ্ধে একত্রিত ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। (৬) যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহুদীরা মুসলমানদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলে গণ্য করবে। ঐ সময়ে ইহুদীরা মদিনার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের সাহায্য করবে। (৭) মুসলমান ও ইহুদীদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে। (৮) নবীর প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া কোন ইহুদী বা তাদের মিত্র-সম্প্রদায়ের কেউ কোন যুদ্ধে যোগদান করতে পারবে না। (৯) আক্রান্ত হলে মুসলমানরা ইহুদীদের ও ইহুদীরা মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য করবে। (১০) এই সনদে স্বাক্ষরকারী সকলের কাছেই মদিনা পবিত্র নগরী বিবেচিত হবে এবং তা লঙঘন করা চলবে না।......... (১১) সমস্ত রকম বিবাদের মীমাংশা করবে আল্লা ও তাঁর রসুল। (১২) কোন ব্যক্তি মক্কার লোকজন বা তাদের মিত্রপক্ষে যোগ দিতে পারবে না। (১৩) যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন পরিস্থিতি সকলের পক্ষেই সমান হবে। যে যুদ্ধে যাবে আর যারা গৃহে অবস্থান করবে, তারা সকলেই সুরক্ষিত থাকবে। এর অন্যথা হলে তা অপরাধ বলে গ্রাহ্য হবে। আল্লাই হলেন সকলের রক্ষাকর্তা ও ন্যায় বিচারক এবং মহম্মদই আল্লার রসুল।

উপরিউক্ত সনদের কোন লিখিত অনুলিপি কোথায়ও পাওয়া যায়নি। পরবর্তী কালের লোকেরা যতটা স্মরণ করতে পেরেছেন তার ভিত্তিতেই ইবন্ হিসাম ও

W.Muir লিপিবদ্ধ করেছেন। যাই হোক, উপরিউক্ত সনদ থেকে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে। প্রথমত, এই সনদের বলে নবী মহম্মদ মদিনার একচ্ছত্র অধিপতি ও প্রধান বিচারপতি হলেন। দ্বিতীয়ত মুসলমানরা মদিনার প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পেল এবং ইহুদীরা সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাগরিক বলে স্বীকৃত হল এবং নানাভাবে তাঁদের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হল। মদিনার ইহুদীদের মনে এই আশা ছিল যে, যেহেতু ইসলাম ইহুদীদের ধর্ম বা আব্রাহামের ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে তাই নবী মহম্মদ মদিনার ইহুদীদের একটু সুনজরেই দেখবেন। অপর দিকে নবী মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন যে ইহুদীরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নতুন ধর্মকে গ্রহণ করবে। এই কারণে বা ইহুদীদের হৃদয় জয় করার ইচ্ছাতেই নবী মদিনায় এসেও জেরুজালেমের সলোমনের মন্দিরকেই মুসলমানদের কিবলা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে ইহুদীরা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অনমনীয় এবং কোনক্রমেই তাদের মুসলমান করা যাবে না তখন তিনি মক্কার কাবাগৃহকেই মুসলমানদের কিবলা বলে নির্দিষ্ট করবেন ঠিক করলেন। পূর্ববর্তী ''নামাজ'' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে এই কিবলা পরিবর্তনের মধ্যে মক্কার কোরেশদের হৃদয় জয় করার রাজনীতি লুকানো ছিল। যাই হোক, উপরিউক্ত কারণে ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা দিনকে দিন বাড়তে থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত তা গণহত্যা ও বিতাড়নের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করল।

হিজরতের প্রথম দুই বছর

নবীর মদিনায় হিজরতের সময় থেকে মুসলমানী হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। কাজেই হিজরতের প্রথম দুই বছর বলতে ১ম ও ২য় হিজরী বোঝায়। এই দুই বছরে ইসলামের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়ম প্রবর্তিত হয় তা হল দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। দিনের নামাজ মসজিদেই পড়া হত এবং যেহেতু নবী মসজিদের পাশেই বাস করতেন তাই সেই সব নামাজের ইমামতি নবী নিজেই করতেন। তখনও আজান দেবার প্রথা চালু হয়নি। রাতের নামাজ যে যার নিজের বাড়ীতেই আদায় করে নিত। রমজান মাসে রোজা চালু হবার পর কিছু কিছু উৎসাহী রাতের নামাজও মসজিদে আদায় করতে শুরু করল। একদিন নবী তাদের বললেন যে, রাতের নামাজ মসজিদে পড়ার জন্য তিনি এখনও কোন প্রত্যাদেশ পাননি এবং এই প্রত্যাদেশ পেলেও লোকের পক্ষে তা পালন করা কঠিন হবে। কাজেই সকলে যেন রাতের নামাজ তাদের বাড়ীতেই পড়ে নেয়।

ইতিমধ্যে শুক্রবার বা জুমআ'র জামাতে নামাজ গুরুত্ব পেতে শুরু

করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জুমআর জামাতের নামাজে যোগ দেওয়া একটি অবশ্য পালনীয় রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছে। খ্রীস্টানদের ও ইহুদীদের পবিত্র দিন যথাক্রমে রবিবার ও শনিবার। মুসলমানদের পৃথক একটি পবিত্র দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নবী শুক্রবারের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। শুক্রবারকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার পিছনে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি কোন শত্রুতার ভাব প্রথম দিকে একেবারেই ছিল না। এমন কি যতদিন জেরুজালেম মুসলমানদের কিবলা ছিল ততদিন অনেক ইহুদী মুসলমানদের প্রার্থনায় এবং অনেক মুসলমান ইহুদীদের প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করতো। অনেক সময় নবী নিজেও ইহুদীদের প্রার্থনায় যোগ দিতেন। কিবলা পরিবর্তনের পর এই হৃদ্যতা ও সহনশীলতার অবসান হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কাবা গৃহকে মুসলমানদের কিবলা ঘোষণা করার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। এই প্রসঙ্গে আরও বলা সঙ্গত হবে যে, যখন মক্কার কাবাকে কিবলা ঘোষণা করা হয় তখন কাবার অভ্যন্তরে ৩৬০ রকমের দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। কাজেই তখনকার কাবাকে কিবলা করার মধ্য দিয়ে পৌত্তলিকতার সঙ্গে আপসের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মক্কার কোরেশদের হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যেই এই আপোষ করা হয়েছিল। অবশ্য এর জন্য মদিনার ইহুদীরা মুসলমানদের সুযোগ পেলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ছাড়তো না।

এই সময়ই নবী তার অনুগামীদের মধ্যে খৎনা প্রথার (circumcision) প্রবর্তন করেন। আগেই বলা হয়েছে (নামাজ অধ্যায়) যে এই প্রথা তখন শুধু ইহুদীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং নবী কেন তা মুসলমানদের মধ্যেও চালু করেছিলেন তা বলা মুশকিল। আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, এ ব্যাপারে কোরান দ্বারা আল্লার কোন নির্দেশ নেই। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল এ প্রথা অনুসরণ করলে মানুষের শৌর্য-বীর্য বৃদ্ধি পায় এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ আছে যে ইহুদী নেতা জশুয়া জেরিকো নগরী আক্রমণ করার পূর্বে সমস্ত ইহুদীদের উপরিউক্ত কারণে নতুন করে আবার খৎনা করার আদেশ দেন (Joshua -5/2) । সম্ভবত এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়েই নবী মুসলমানদের মধ্যে তা প্রবর্তন করেন।

ইহুদীরা তাদের সপ্তম মাসের দশম দিন ২৪ ঘন্টার উপবাস পালন করে যাকে আশুরের উপবাস বলে। কথিত আছে যে এইদিন মোজেস ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে এবং লোহিত সাগর পার করে ইহুদীদের সিনাই মরুভূমিতে নিয়ে আসেন এবং ঐদিনই গড মিশরের ফারাওর সৈন্যদের লোহিত সাগরের জলে ডুবিয়ে মারেন। এই কথা শোনার পর নবী বললেন যে, মুসা বা মোজেস মুসলমানদেরও নবী, তাই মুসলমানদেরও অধিকার আছে উক্ত উপবাস পালন

করার। এই হিসাবে তিনি তার অনুগামীদের মধ্যেও আশুরের উপবাস চালু করেন। কিন্তু এর প্রায় মাস ছয়েক বাদে আল্লা কোরান মারফৎ মুসলমানদের রমজান মাসের রোজা পালনের আদেশ দেন। ফলে আশুরের উপবাস মুসলমানদের কাছে এক ঐচ্ছিক রীতিতে পরিণত হয়। কেউ উপবাস করে, কেউ করে না। প্রথম যে বছর রমজানের রোজার আদেশ আসে সেই বছর রমজান মাস শীতকালে হবার দরুন বিশ্বাসীদের পক্ষে সারাদিন পানাহার বর্জন করা তেমন কষ্টকর হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন গ্রীষ্মকালে রমজান মাস চলে এল তখন আরবের ঐ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে জলপান না করে রোজা রাখা মুসলমানদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু কোরান দ্বারা পানাহার বর্জনের রীতি একবার বৈধ বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে তাই তার কোন হেরফের করার আর কোন সুযোগ থাকল না।

রোজা পালনের সঙ্গে সঙ্গে রোজা সমাপ্তির উৎসব ঈদ উল ফিৎরও চালু হল। ফিৎর কথার অর্থ হল ভিক্ষা। কাজেই মূলত দরিদ্রদের ভিক্ষা দেওয়াই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। প্রথম যে বছর এই উৎসব পালিত হয় তখন বিশ্বাসীরা ফজরের নামাজের পর স্নান করে পাক সাফ হয়ে যার যেমন ক্ষমতা সেই হিসাবে গরীবদের ফিৎরা দেয়। এর পর সবাই উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে নবীর কাছে উপস্থিত হয়। নবীও উৎসবের সাজে সজ্জিত হযে সকলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে নবী মদিনা নগরীর বাইরে মক্কা যাবার রাস্তার পাশে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হলেন। সেখানে ঈদের জামাতের নামাজ অনুষ্ঠিত হল। নামাজের পর নবী খুৎবা দিলেন। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল। মসজিদে নবী একটা ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে গরীব মুসলমানরা খাওয়া-দাওয়া করল এবং এভাবে ঈদ উল ফিৎর পালিত হল।

ঠিক একইভাবে কোরবানীর ঈদ বা ঈদ উল আঝা পালনের সূত্রপাত হল। ইসলামের অনেক আগে থেকেই এই উৎসব আরবে প্রচলিত ছিল এবং হজক্রিয়ার সময় মক্কার নিকটবর্তী মিনা নামক স্থানে আরবরা পশু কোরবানী করতো (হজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নবীর মদিনায় আগমনের পর প্রথম বছরের কোরবানীর ঈদ সকলের অলক্ষ্যে পার হয়ে গেল। পরের বছর নবী ঐদিন দুটো তরতাজা ছাগলের বাচ্চা কোরবানী করলেন। প্রথমটি জবেহ্ করার সময় তিনি বললেন, "ইসলাম ও সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এটি কোরবাণী করলাম।" দ্বিতীয়টি জবেহ্ করার সময় বললেন, "মহম্মদ ও মহম্মদের পরিবারের সকলের তরফ থেকে এই কোরবানী করা হল।" এখানে লক্ষণীয় যে, ইহুদীদের মধ্যেও এই রকম দুটো পশু কোরবানীর প্রচলন আছে। ইহুদীরা প্রথম কোরবানীটি তাদের পরিবারের সকলের পাপ স্খালনের জন্য করে এবং দ্বিতীয়টি সমস্ত ইহুদী জাতির

পাপ স্খালন ও মঙ্গলের জন্য করে থাকে। যাই হোক, এর পর থেকে প্রতি বছর কোরবানীর ঈদ পালিত হতে থাকে।

হিজরীর দ্বিতীয় বছরে অপর আরেকটি যে ধর্মীয় প্রথার প্রচলন করা হয় তা হল আজান। পূর্ববর্তী "নামাজ" অধ্যায়ে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। প্রার্থনার সময় সকলকে ডাকার জন্য কেউ কেউ ইহুদীদের মত শিঙা বাজাবার কথা বলল। আবার কেউ বা খ্রীস্টানদের মত ঘন্টা বাজাবার পরামর্শ দিল। কিন্তু কোনাটাই নবীর তেমন পছন্দ হল না। তিনি মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ত্র প্রথার কথা চিন্তা করছিলেন। এই সব ব্যাপারে যখন আলাপ-আলোচনা চলছে তখন নবীর এক অনুচর বলল যে, সে স্বপ্নে দেখেছে যে সবুজ রঙের পোশাক পরা এক ব্যক্তি তাকে বলছে যে শিঙা বা ঘন্টার থেকে উত্তম প্রথা তার জানা আছে। সে ব্যক্তি তখন বলল, "জোরে চীৎকার করতে পারে এমন একজন লোক যোগাড় কর এবং তাকে বলতে বল- আল্লাহু আকবর ইত্যাদি।" ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি নবীর কাছে হাজির হয়ে তার স্বপ্নের কথা বলল। তার কথা শোনা মাত্র নবী তার হাবসী অনুচর বিলালকে ডেকে পাঠালেন এবং সেই স্বর্গীয় আদেশ কার্যকর করতে বললেন। বিলাল তৎক্ষণাৎ মসজিদের নিকটস্থ একটা উঁচু বাড়ীর ছাদে চড়ে বসল। তখনও ভোর হতে বাকী ছিল। ভোরের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিলাল তার বিকট গলায় ফজরের আজান শুরু করে দিল। বিলাল ছাড়া আরও দুজন ব্যক্তিকে নবী মুয়াজ্জীন নিযুক্ত করেন এবং বিলালের অনুপস্থিতিতে তারা মুয়াজ্জীনের কাজ করতো। কারও কারও মতে নবী প্রথমে শিঙা বাজিয়ে লোক ডাকার প্রথা অনুমোদন করেন এবং পরে মত পালটিয়ে খ্রীস্টানদের মত ঘন্টা বাজিয়ে লোক ডাকার পক্ষে মত দেন। অনেকের মতে বিশাল এক কাঠের ঘন্টা বানাবার কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। পরে উপরিউক্ত স্বপ্নের বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে আজান প্রথা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

হিজরতের পর প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু বা মুহাজীরদের রমণীরা একটিও সন্তানের জন্ম দিল না। এর ফলে এই গুজব চালু হল যে ইহুদীরা তুকতাক করে মুসলমান রমণীদের বন্ধ্যা করে দিয়েছে। এই সময় জুবায়ের নামে একজন মুহাজীরের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। এর কিছুদিন পরে মদিনার এক আনসারের স্ত্রীও একটি সন্তানের জন্ম দেয়। এই দুই সন্তান প্রসবের ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে খুবই আনন্দের সঞ্চার করে এবং ইহুদীদের তুকতাকের গল্পও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

বদর যুদ্ধ

নবীর মদিনায় হিজরতের পর প্রথম ছয়মাস শান্তিতেই কাটল এবং তার পর থেকেই মক্কার কোরেশদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়তে থাকল। এই শত্রুতা বৃদ্ধির পিছনে

কোরেশদের দিক থেকে কোন উস্কানী ছিল না এবং এর জন্য নবীর প্রতিশোধ স্পৃহাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। নবীকে যারা মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সেই কোরেশদের সমুচিত শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত নবীর মনে শান্তি ছিল না। কিন্তু মক্কা আক্রমণ করার মত এক বিশাল বাহিনীও নবী তখন গড়ে তুলতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে মদিনার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অত্যন্ত অনুগত মুহাজীরদের সংখ্যা তখন খুবই কম ছিল। এবং মদিনার আনসারদেরও তখনও মক্কার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা নবীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কাজেই যে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নবীর মনে স্থান পেল তা হল মদিনার সুলমানদের দ্বিধাহীন আনুগত্য আদায় করা এবং এইভাবে তাদের সাহায্যে এক সুসংগঠিত বাহিনী তৈরি করা। কিন্তু এ কাজে অর্থের ভীষণ প্রয়োজন তাই মক্কার বাণিজ্য কাফেলাকে লুঠ করে সেই অর্থের সংস্থান করা।

আগেই বলা হয়েছে যে মক্কার কোরেশরা বছরে দু বার বাণিজ্য যাত্রা করতো, শরৎকালে তারা ইয়মন ও আবিসিনীয়ায় যেত এবং বসন্তকালে শামদেশ বা সীরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেত। মক্কার বাণিজ্য কাফেলা যে পথে সীরিয়ায় যেত তা লোহিত সাগরের পার দিয়ে হেজাজ পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল এবং এই পথ মদিনার কাছ দিয়ে যাবার দরুন মদিনা থেকে কাফেলার উপর হামলা করছিল খুবই সহজ। মক্কার কোরেশরা যখন বাণিজ্য যাত্রা করতো তখন মক্কার যে কোন নাগরিক তার সামান্যতম মূলধনও এই বাণিজ্যে নিয়োগ করতে পারতো এবং সেই নিয়োগের উপর লভ্যাংশ পেত। অনেক সময় এই বাণিজ্য কাফেলা এত বড় হত যে কয়েক হাজার উট তা বহন করত এবং মোট বাণিজ্যের পরিমাণ আজকের মূল্যমানে বেশ কয়েকশ কোটি টাকা হত। কাজেই এই সব বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা ও লুণ্ঠন যে মদিনার মুসলমানদের, বিশেষ করে নবীর পক্ষে খুবই লোভনীয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

হিজরীর সপ্তম মাসে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৩০০ জন কোরেশ এর একটি বাণিজ্য কাফেলা সীরিয়া থেকে মক্কা ফিরছিল এবং মহম্মদ তাঁর চাচা হামজার নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজীরের একটি দলকে তার উপর হামলা করতে পাঠালেন। সেটা ছিল রমজান মাস এবং ইংরাজী ৬২২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। কিন্তু জুহিনা গোত্রের এক দলপতির মধ্যস্থতার ফলে কোন হামলা করা সম্ভব হল না। হামজা তাঁর দলবল নিয়ে মদিনায় ফিরে আসলেন। এর প্রায় মাস খানেক পরে, ৬২৩ সালের জানুয়ারী মাসে ২০০ জন কোরেশদের আরেকটি কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা ফিরছিল। মহম্মদ ৬০ জনের একটি দলকে ওবেদার নেতৃত্বে পাঠালেন তার উপর হামলা করার জন্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ অনেক বেশী শক্তিশালী

হবার দরুন ওবেদা কোন সংঘর্ষ না করেই ফিরে আসে। এর পরের মাসে নবী আর একটি দলকে পাঠান। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তারা দেখতে পেল যে বাণিজ্য কাফেলা তার আগেই সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। তাই তারাও শূন্য হাতেই মদিনায় ফিরে এল।

ঐ বছরই গ্রীষ্ম ও শরৎকালের মধ্যে নবী স্বয়ং তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম অভিযানে তিনি আল আবোয়া পর্যন্ত ধাওয়া করেন কিন্তু বাণিজ্য কাফেলাকে ধরতে না পেরে ফিরে আসেন। এর পরের মাসে ২০০ জনের বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। নবীর কাছে খবর ছিল যে উমাইয়া বিন খালাফেব নেতৃত্বে প্রায় ২৫০০ উট ও ১০০ জন রক্ষীর একটি দল ঐ পথে আসছে। কিন্তু মহম্মদের পৌঁছুবার আগেই কাফেলা বিপদসীমার বাইরে চলে যায় এবং তাকে বিফল মনোরথেই ফিরতে হয়। এর দুই কি তিন মাস পরে মহম্মদ ১৫০ কি ২০০ জনের একটি দল নিয়ে আবার যাত্রা করেন এবং খবর ছিল যে এক বিশাল কাফেলা নিয়ে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে সীরিয়ার দিকে যাত্রা করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখা গেল যে মুসলমান বাহিনী পৌঁছবার বেশ কয়েক দিন আগেই কাফেলা ঐ স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল এই যে, এই কাফেলার মক্কা ফেরার সময়ই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ঐ বছরই নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে মহম্মদ আটজনের একটি দলকে আবদুল্লা বিন জাশ-এর নেতৃত্বে অভিযানে পাঠালেন। যাত্রার মুহূর্তে নবী আবদুল্লার হাতে সীল করা একটা চিঠি দিয়ে বললেন দু দিন পথ চলার পর এই চিঠি খুলবে। নবীর কথামত দু দিন পরে সীল খুলে আবদুল্লা দেখল তাতে লেখা রয়েছে "আল্লার ইচ্ছায় তোমরা নাখলা উপত্যকা পর্যন্ত যাও। যারা স্ব-ইচ্ছায় তোমার সঙ্গে যেতে চায় তাদের সঙ্গে করে নাখলা যাও এবং সেখানে কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলার জন্য অপেক্ষা কর।" নাখলা মক্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং মক্কা থেকে যে সব বাণিজ্য কাফেলা দক্ষিণে বাণিজ্য করতে যায় তারা নাখলা হয়ে যায়। চিঠি পড়ার পর দুজন মদিনায় ফিরে গেল, বাকী ছয়জনের দলটি নাখলায় পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকল। দু এক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ দিক থেকে কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলা নাখলায় এসে পৌঁছালো। আবদুল্লা ও তার লোকেরা ইতিমধ্যে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলল এবং এর দ্বারা বোঝাতে চাইল যে তারা নিরীহ তীর্থযাত্রী এবং মক্কা থেকে ওমরা পালন করে ফিরছে। কোরেশদের দলে মাত্র চারজন লোক ছিল এবং তারা আবদুল্লার চালাকিতে বিভ্রান্ত হয়ে রান্না ও খাওয়ার আয়োজন করতে শুরু করল। সেই দিনটা ছিল আরবী রজব মাসের শেষ দিন।

ইসলামের আগে থেকেই রজব সহ চারমাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত আরবে

নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই আবদুল্লা কি করবে মনস্থির করতে পারল না। যদি আক্রমণ না করে একদিন অপেক্ষা করে তবে কাফেলা হাতের বাইরে চলে যাবে এবং সব পরিশ্রম নিষ্ফল হবে। আবদুল্লা শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল এবং তীর দিয়ে আমর নামক এক ব্যক্তিকে নিহত করল। ওসমান ও হাকিম নামে দুজনকে বন্দী করল এবং চতুর্থ ব্যক্তি নওফল পালিয়ে যেতে সমর্থ হল। যথা সময়ে দুজন বন্দী ও বাণিজ্য কাফেলা সহ আবদুল্লা মদিনায় পৌঁছালো। গনিমতের মাল দেখে নবী মনে মনে খুশিই হলেন এবং পবিত্র মাসে রক্তপাত করার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। কিন্তু আল্লা আবদুল্লার কাজকে সমর্থন করে অনতিবিলম্বে কোরানের আয়াৎ অবতীর্ণ করে বললেন, "তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল— উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লার পথে বাধা দান করা, আল্লাকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে বাধা দেওয়া, ওর বাসিন্দাকে উহা হতে বহিষ্কার করা আল্লার নিকট গুরুতর অন্যায় এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর"(২/২১৭)।

উপরিউক্ত নাখলা অভিযান ইসলামী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অভিযানেই মুসলমান বাহিনী সর্বপ্রথম গনিমত বা লুঠের মাল হস্তগত করে এবং উপরন্তু কোন ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তিকে বন্দী করতে সমর্থ হয়। নবী লুঠের মালের এক-পঞ্চমাংশ পবিত্র খুম হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং বাকীটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। বন্দীদের মুক্ত করতে যখন মক্কা থেকে লোক এল, নবী প্রত্যেকের জন্য ১৬০০ দিরহাম মুক্তিপণ দাবি করলেন। দুজন বন্দীর একজন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেল। বাকী একজন ইসলাম গ্রহণ করে মদিনাতেই রয়ে গেল।

উপরিউক্ত নাখলের ঘটনার পর থেকে মক্কা ও মদিনার শত্রুতা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। অপর দিকে আল্লা ক্রমাগত যুদ্ধের আয়াৎ অবতীর্ণ করে মুসলমানদের মন যুদ্ধের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে থাকলেন। আল্লা বললেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লার পথে যুদ্ধ কর"(২/১৯০)।" "যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেই স্থান হাতে তাদের বহিষ্কার করবে। অশান্তি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর"(২/১৯১)। "যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা কর, অবিশ্বাসীদের জন্য ইহাই প্রতিফল"(২/১৯১)। " তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না অশান্তি দূর হয়, এবং আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়" (২/১৯৩)। "তোমাদের উপর যেরূপ অত্যাচার করবে, তোমরাও তৎপ্রতি সেইরূপ অত্যাচার করবে"

(২/১৯৪)"। "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে" (২২/৩৯)।" "এবং সংগ্রাম কর, আল্লার পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত, তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন" (২২/৭৮)। সঙ্গে সঙ্গে আল্লা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য স্বর্গসুখের প্রলোভন তুলে ধরলেন এবং বললেন, "যারা আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করেছে, তৎপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যু বরণ করেছে, আল্লা তাদের উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। ....তিনি অবশ্যই তাদের এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে"(২২/৫৮, ৫৯)।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয় তা হল দিনে দিনে মহম্মদের দ্বারা প্রেরিত অভিযানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। এর পিছনে দুটো কারণ ছিল, প্রথমত আল্লার পথে জিহাদ করার কোরানের অনুপ্রেরণা। দ্বিতীয়ত গনিমতের মালের ভাগ পাবার লোভ। বেশির ভাগ পণ্ডিত দ্বিতীয় কারণটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ করেছেন। এখানে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। উপরে যে সব জিহাদের বাণী বলা হয়েছে এবং এ ছাড়াও আল্লা অন্য যে সমস্ত জিহাদের বাণী অবতীর্ণ করেছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঐ সমস্ত বাণীর লক্ষ্য ছিল মক্কার পৌত্তলিক কোরেশরা বা বৃহৎ অর্থে আরবের অ-মুসলমান বিধর্মীগণ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত বাণী বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করল। যে কোন দেশের যে কোন অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে ঐ সব বাণী কার্যকর হতে থাকল। ভারতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী সমান ভাবেই অনুসৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ৬২৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আবু সফিয়ানের নেতৃত্বে বিশাল এক বাণিজ্য কাফেলা সীরিয়া যাত্রা করে এবং নবী স্বয়ং ২০০ জন অনুচর সহ সেই কাফেলার উপর হামলা করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু অল্পের জন্য সে কাফেলা নবীর হস্তচ্যুত হয়। কথিত আছে যে কোরেশরা তাদের বাণিজ্য পথকে মুসলমান আক্রমণ থেকে চিরতরে মুক্ত করার জন্য মদিনার বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং সেই আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে উপরিউক্ত বাণিজ্য কাফেলাকে সীরিয়ায় পাঠান হয়। মক্কাবাসী সকলে ঐ বাণিজ্য কাফেলায় অর্থ লগ্নী করে এবং এইভাবে ঐ বাণিজ্যের মূলধন দাঁড়ায় ৫২ হাজার দিরহাম বা বর্তমান মূল্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। প্রায় ৪০ জন অশ্বারোহী দ্বারা সুরক্ষিত সেই কাফেলা শরৎকালে যাত্রা করে সীরিয়ায় পৌঁছায়। যাবার পথে মহম্মদ এই কাফেলাকে ধরতে পারলেন না বটে, তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে ফেরার পথে তাকে অবশ্যই ধরবেন।

ইতিমধ্যে প্রায় ২/৩ মাস্ কেটে গেছে এবং কাফেলার ফেরার সময় হয়ে এসেছে। মহম্মদ পূর্ব পরিকল্পনা মত, ৬২৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী বা ২য় হিজরীর ১২ই রমজান রবিবার ৩১৩ জন অনুচর, ৭০টি উট, ২টি (মতান্তরে ৩টি) ঘোড়ার বাহিনী নিয়ে মদিনা ত্যাগ করলেন। যাত্রার ২/৩ দিন পর নবী সবাইকে রোজা ভাঙার আদেশ দিলেন এবং নিজে প্রথমে রোজা ভাঙলেন এবং বললেন যে উপবাসী দুর্বলদের দ্বারা যুদ্ধ হয় না। তারপর তিনি তাঁর অনুচরদের মধ্য থেকে আদি ও বিসবিস নামে দুজনকে কাফেলা সম্পর্কে আগাম খবর সংগ্রহ করার জন্য বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন। প্রকৃতপক্ষে বদর একটি কূপের নাম এবং তার সংলগ্ন প্রান্তরের নামই বদর প্রান্তর। মক্কা থেকে ১২০ মাইল ও মদিনা থেকে ৩০ মাইল দূরে তা অবস্থিত। গুপ্তচর দুজন নিকটবর্তী জুহিন গোত্রের দলপতির বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকল এবং বাণিজ্য কাফেলা নিকটবর্তী হলে মহম্মদকে সেই সংবাদ দিতে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করল।

এদিকে মহম্মদের উদ্দেশ্য, কি করে জানা যায় না, প্রকাশ হয়ে যায় এবং গুজবের আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সীরিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় সেই গুজব আবু সুফিয়ানের কানে আসে এবং তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তাই বদর প্রান্তরের কাছে কাফেলা পৌঁছুবার পর আবু সুফিয়ান সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে একটু এগিয়ে আসে সরেজমিনে তদন্ত করতে যে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি না। বদরে পৌঁছে জুহিনা গোত্রের সর্দারের কাছে জানতে পারল যে দু-জন লোক এসেছিল এবং বিশ্রাম করে জলটল খেয়ে চলে গেছে। আবু সুফিয়ানের মনে সন্দেহ হওয়াতে সে কূপের চারপাশ ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সেখানে উটের তাজা মল দেখতে পেল। বিশেষ করে সে মলের মধ্যে যে ধরনের খেজুরের দানা সে দেখতে পেল সেরকম খেজুড় একমাত্র মদিনাতেই জন্মায়। কাজেই সে নিঃসন্দেহ হল যে মদিনা থেকে মহম্মদের গুপ্তচর এসে খবর নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কাফেলায় ফিরে আসে এবং কাফেলার মুখ পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং দিন-রাত সমানে চালিয়ে বিপদ সীমার বাইরে চলে যায়।

মহম্মদ কাফেলা আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কা করে আবু সুফিয়ান সীরিয়া থেকে যাত্রা করার পরে পরেই যমযম গিফারী নামে এক ব্যক্তিকে দ্রুতগামী উটে করে মক্কা পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে উদ্ধারকারী দল পাঠাবার জন্য। যমযম যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে, আবু সুফিয়ানের বদরে পৌঁছুবার ১০/১২ দিন আগে মক্কা পৌঁছে যায়। মক্কায় পৌঁছে সে কাবার

সামনে উট থেকে নামে এবং মহা বিপদের চিহ্ন হিসাবে উটের নাক-কান কেটে এবং নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে তা বাতাসে ওড়াতে ওড়াতে চীৎকার করতে থাকে। বলতে থাকে "মহা বিপদ, মহম্মদ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করেছে, সাহায্যকারী দল পাঠাও"। সমগ্র মক্কা জুড়ে এক হুলুস্থুল পড়ে গেল এবং ভীতি ও আতঙ্ক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে দু-এক দিনের মধ্যেই আবু জাহলের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মক্কা ত্যাগ করল। যখন কোরেশ বাহিনী বদরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন আবু সুফিয়ানের দূত এসে খবর দিল যে কাফেলা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে। এই খবর পাবার পর কোরেশ বাহিনীর মধ্যে চিন্তার বিষয় হল যে, এগিয়ে যাওয়া হবে না সেখান থেকেই মক্কায় ফিরে যাওয়া হবে। নেতা আবু জাহল মত দিল যে এগিয়ে গিয়ে মহম্মদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করাই উচিত কাজ হবে। নতুবা মহম্মদ বলবে যে তারা কাপুরুষের মত ফিরে গেছে। নাখলের ঘটনার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাও কোরেশদের মধ্যে বেশ প্রবল ছিল। তাই বদর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হল।

এদিকে রবিবারে যাত্রা করে মহম্মদের বাহিনী মঙ্গলবার রাত্রে রুহা নামক স্থানে এসে পৌঁছালো। বুধবার বদরের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের কাছে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ এসে পৌঁছালো যে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা বদরের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এবং মক্কা থেকে বিশাল কোরেশ বাহিনী মুসলমান বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে বদরের দিকে এগিয়ে আসছে। এ খবর পাবার পর মুসলমান বাহিনীতেও এই বিতর্কের সৃষ্টি হল—এখন কি করা উচিত, এগিয়ে গিয়ে কোরেশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করা না মদিনায় ফিরে যাওয়া। আবু বকর ও ওমর সামনে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নবীও সেই মতে মত দিয়ে বললেন, "আল্লার নামে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত"। বৃহস্পতিবার বিকালে মহম্মদের বাহিনী বদরে পৌঁছালো। মহম্মদ কয়েকজন অনুচর সহ আলিকে পাঠালেন যেদিকে কূপটি ছিল তা দেখে আসার জন্য। আলি সেখান থেকে দুজন ভিস্তি ধরে আনল এবং নবী কোরেশদের বাহিনী সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। নবী জিজ্ঞাসা করলেন যে কোরেশ বাহিনীতে কতজন লোক আছে। কিন্তু তারা কোন সদুত্তর দিতে পারল না। নবী তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে খাবার জন্য তারা দিনে কটা উট মারে। জবাবে তারা বলল যে একদিন ৯টা একদিন ১০টা। এ থেকে নবী অনুমান করলেন যে ৯০০ থেকে ১০০০ লোক আছে। নবীর অনুমান সত্য, তারা দলে ৯৫০ জন ছিল এবং তাছাড়া ৭০০ উট ও ১০০টি ঘোড়া ছিল। উপরন্তু তাদের সব অশ্বারোহীই বর্মপরিহিত ছিল।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নবীর মুসলমান বাহিনী এমন একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল যার জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মুসলমান বাহিনী এসেছিল সামান্য একটা বাণিজ্য কাফেলা লুঠ করতে, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সম্মুখীন হতে হল তাদের থেকে তিনগুণ শক্তিশালী এক সুসজ্জিত শত্রু বাহিনীর। আবু বকর ও ওমরের কথায় সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করা স্থির হল বটে, তবে সৈন্যদলের অনেকের মধ্যেই যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব দেখা গেল। বিশেষ করে মদিনাবাসী আনসারদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি দেখা গেল। অথচ তাদের দলের মোট ৩১৩ (মতান্তরে ৩০৫) জন সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৮০ জন ছিল মুহাজীর এবং বাদবাকী ২৩৩ জনই ছিল আনসার, যার চার ভাগের এক ভাগ ছিল আউস গোত্রের এবং বাকীরা সব খাজরাজ। পূর্বোক্ত আল আকাবার অঙ্গীকার অনুসারে নবীর প্রাণ তথা মদিনা রক্ষার্থে আনসাররা যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল, কিন্তু মদিনার বাইরে গিয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে তারা বাধ্য ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই সংখ্যায় ও রসদে মুসলমান বাহিণীর দুর্বলতা লক্ষ্য করে অতিশয় ভীত হয়ে পড়ল। আনসারদের মধ্যে এই ভীতির ভাব লক্ষ্য করে বদরের কিছু আগে যাফরান প্রান্তরে মহম্মদের আরেক অনুচর জিহাদ সম্পর্কে এক আবেগময় ভাষণ দিলেন এবং তার ফলে মুসলমান বাহিনী মনোবল কিছুটা ফিরে পেল। ইতিমধ্যে আল্লাও বাণী অবতীর্ণ করলেন "আতিউল্লাহা অ আতিউররসুল"—অর্থাৎ "আল্লাকে অনুসরণ কর এবং আল্লার রসুলকে অনুসরণ কর" (৮/২০)। ফলে সকলেই ধীরে ধীরে যুদ্ধের পক্ষে মত দিল এবং অগ্রসর হতে থাকল।

বদর প্রান্তরের তিন দিকে ছোট ছোট পাহাড়। পূর্ব দিকের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে একটা ক্ষীণ ঝরনাধারা। ১৬ই রমজান, বৃহস্পতিবার বিকালে মুসলমান বাহিনী বদরে পৌছালো। বদর প্রান্তরের মদিনার দিকের (বা পূর্ব দিকের) অংশ উদয়াতুল কুসওয়াতে মহম্মদ শিবির স্থাপন করতে বললেন। দুই সৈন্যদলই মুখোমুখি, তবে মাঝে একটা বালিয়াড়ি থাকাতে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কোরেশরা যেখানে শিবির ফেলেছিল সেটা ছিল উচ্চভূমি, সমতল এবং সেখানকার মাটি ছিল শক্ত। পক্ষান্তরে মুসলমানদের শিবিরের জায়গাটা ছিল বালুময় নিম্নভূমি, চলতে গেলে উটের পা বসে যাচ্ছিল। তবে শিবির স্থাপন করার সময় মহম্মদ একটা বিশেষ কারণে জায়গাটা মনোনীত করেছিলেন। যে ক্ষীণ ঝরনাটা পূর্বের পাহাড় থেকে বয়ে আসছিল তার উৎসটা কব্জা করার জন্যই মহম্মদ জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন। ঝরনার জল একটা

নালার আকারে বদর প্রান্তর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল এবং জায়গায় জায়গায় গর্ত করে সেই জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এইরকম একটা গর্ত থেকেই কোরেশরা তাদের পাণীয় জল সংগ্রহ করত। মহম্মদ পরামর্শ করলেন যে, যদি ঝরনার উৎসটা দখলে রেখে নালাটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এবং নিকটবর্তী বদর কূপকে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেওয়া যায়, তবে জলের অভাবে কোরেশরা কাবু হয়ে পড়বে। নবীর এই পরামর্শ সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হল।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামল এবং এই বৃষ্টি মুসলমান বাহিনীর একটা বিরাট উপকার করল। বৃষ্টিতে বালি বসে গিয়ে তাদের শিবিরের জায়গাটা শক্ত করে দিল। ফলে মানুষ ও উট চলাচলের পক্ষে তা উপযুক্ত হয়ে গেল। পক্ষান্তরে কোরেশদের শিবিরের জমি পিছল হয়ে যাওয়ায় তা উট ও মানুষ চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ল। সেই রাত্রে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকার ফলেই হোক বা কোন দৈব শক্তির বলেই হোক, মুসলমান সৈন্যরা সারারাত গভীর ঘুম দিল, ফল পরদিন সকালে তাদের শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি পেল। পক্ষান্তরে কোরেশ বাহিনী জয় নিশ্চিত ভেবে সারারাত আমোদ ফূর্তি করে কাটাল এবং শক্তি ক্ষয় করল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, "যখন তিনি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের স্বস্তির জন্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তার দ্বারা তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের (মন) হতে শয়তানি কুমন্ত্রণা দূরীভূত করেন, অন্তরসমূহ সুদৃঢ় করেন ও তোমাদের চরণসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন"(৮/১১)।

সারা বদর প্রান্তর ভালভাবে দেখা যায় এরকম একটা উঁচু জায়গায় নবীর তাঁবু ফেলা হল। রাত্রে সবাই ঘুমালো, কিন্তু নবী নামাজ করে কাটালেন। আল্লার কাছে বিজয় প্রার্থনা করলেন এবং বললেন যে, তাঁর বাহিনী জয়ী না হলে জাজিরাতুল আরব থেকে একেশ্বর আল্লার ধর্ম বিলুপ্ত হবে, পৌত্তলিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।

পরদিন সকালে মুসলমান বাহিনী প্রথমে ফজরের নামাজ শেষ করল এবং নারা এ তকবির বা আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে বদর প্রান্তর মুখরিত করে তুলল। নবী একটা তীর হাতে করে ব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দিতে থাকলেন। আগের দিন রাত্রেই তিনি আউসদের পতাকা সাদ বিন মোয়াজের হাতে, খাজরাজদের পতাকা আল্ হোবাব-এর হাতে এবং সর্বপ্রধান মুহাজীরদের পতাকা মুসাব নামক ব্যক্তিকে অর্পণ করেছিলেন। ওদিকে কোরেশদের এক বয়ঃবৃদ্ধ নেতা হাকিম ইবনে হাজাম এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার এক শেষ প্রচেষ্টা চালাবার

চেষ্টা করল এবং আবু জাহল তাকে নিরস্ত করল। আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমান বাহিনী রাতের বেলা ঝরনার জলের উপর তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। তাই ভোরবেলা থেকেই কোরেশ শিবিরে জলকষ্ট দেখা দেয়। আসোয়াদ নামে একজন বয়স্ক কোরেশ জল পান করার জন্য মুসলমানদের এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করে এবং মহম্মদের চাচা হামজা তরোয়াল দিয়ে প্রথমে তার একটা পা কেটে দেয়। তবুও সে হামাগুড়ি দিয়ে জলের নালার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে হামজা এক কোপে তার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে।

যুদ্ধ শুরু হবার আর দেরী নেই। নবী তাঁর তাঁবুতে ফিরে আল্লার কাছে আকুল প্রার্থনা করছেন আর তাঁর বাহিনী ঘন ঘন নারা এ তকবীরে বদর প্রান্তর মুখরিত করে তুলছে। রাতের বৃষ্টি জমি শক্ত করে দেবার ফলে মুসলমানরা একটা সুবিধা পেল এবং সকালবেলা তারা আরও একটা বাড়তি সুবিধা পেল। ভোরের সূর্য তাদের পিছনে থাকায় সামনের শত্রু বাহিনীকে দেখতে তাদের সুবিধা হচ্ছিল। পক্ষান্তরে কোরেশ বাহিনী পূর্ব দিকে মুখ করে থাকার ফলে সূর্যের আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ওদিকে আসোয়াদের করুণ পরিণতি দেখে আরও কয়েকজন কোরেশ, হয় মরব নয় জলাধার দখল করব, এই পণ করে ঝরনার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু হামজার হাতে তারা সকলেই মারা পড়ল।

শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসাতে দুই সৈন্যদলের মধ্যেকার দূরত্ব কমে গেল, কিন্তু মহম্মদ তাঁর বাহিনীকে অগ্রসর হবার অনুমতি দিলেন না। শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করলে তীরন্দাজ বাহিনীকে তীর দিয়ে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। ইতিমধ্যে তিন কোরেশ বীর উতবা, সায়দা (শীবা) ও উতবার ছেলে ওয়ালিদ দুই সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাল। তিন জন আনসার ঐ ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের গৌরব কোরেশ ছাড়া অন্য কেউ পাবে নবী তা উচিত মনে করলেন না এবং চাচা হামজা, আলি ও ৬৫ বছর বয়স্ক বীর ওবায়দাকে ডাকলেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য। অন্য মতে, তিনজন আনসারকে এগিয়ে আসতে দেখে কোরেশরা তাদের চাষা বলে গালি দিল এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না জানাল। তখন হামজা বলল ''এই আমি, আল্লা ও নবীর সিংহ উপস্থিত, আমার সঙ্গে লড়াই কর''। হামজার সঙ্গে আলি ও ওবেইদা অগ্রসর হল। অতঃপর ওয়ালেদের সঙ্গে আলির, উতবার সঙ্গে হামজার এবং সায়দার সঙ্গে ওবাইদার ভীষণ অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলি ওয়ালেদকে এবং

হামজা উতবাকে ধরাশায়ী করল। শায়দার সঙ্গে ওবাইদার তুমুল লড়াই চলতে থাকল, হঠাৎ শায়দার এক ঘায়ে উবাইদার একটা পা শরীর থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল। হামজা ও আলি সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে শায়দাকে ধরাশায়ী করল। ওবাইদা তখনকার মত প্রাণে বেঁচে গেলেও মদিনায় ফেরার পথে মারা গেল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল আর এক কোরেশ বীর উবাইদা এবং তাকে প্রতিহত করতে উঠে দাঁড়াল নবীর চাচাত ভাই ও আবুবকরের জামাতা যুবায়ের। শুধু চোখ দুটো বাদে উবাইদার আপাদমস্তক লোহার বর্মে ঢাকা ছিল। তাই যুবায়ের তরোয়ালের বদলে বেছে নিল বর্শা এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই বর্শা চোখ দিয়ে ঢুকিয়ে মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

প্রাথমিক জয়ে মুসলমানদের মনোবল অসম্ভব বেড়ে গেল এবং তারা ঘন ঘন আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে থাকল। অপর দিকে কোরেশ বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেল এবং যুদ্ধের গতি মুসলমানদের পক্ষে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভীত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে সেনাপতি আবু জাহল সর্বাত্মক আক্রমণের আদেশ দিল এবং শুরু হয়ে গেল তুমুল সম্মুখ যুদ্ধ। এমন সময় হঠাৎ ঝড় শুরু হয় এবং তিনটি প্রবল দমকা বাতাসের সৃষ্টি হয়। এই দমকা বাতাস পূর্ব দিক থেকে আসার ফলে কোরেশ সৈন্যদের চোখে-মুখে ধূলো ঢুকে যায় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই দমকা বাতাসকে মুসলমানরা কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বলে স্বীকার করতে রাজী নন। তাদের মতে তিনটি দমকা বাতাস আসলে তিনজন দেবদূত, জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ। প্রত্যেক দেবদূত ১০০০-স্বর্গীয় সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং কোরেশ সৈন্যদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করেছিল। ফলে কোরেশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করে এবং মুসলমান সৈন্যরা পিছন দিক থেকে ধাওয়া করে তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করে। কোরেশ বাহিনীর ৪৯ জন মারা যায় এবং প্রায় সমান সংখ্যক লোক বন্দী হয়। মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ১৪ জন নিহত হয়, যার মধ্যে ৮ জন ছিল আনসার ও ৬ জন মুহাজীর।

যুদ্ধ চলাকালীন এক সময়ে আবু জাহল যখন ব্যূহ তদারকির কাজে ব্যস্ত ছিল তখন অল্পবয়স্ক দুই মুসলমান বীর মোয়াজ ও আবদুল্লা ব্যূহ ভেদ করে তাকে আক্রমণ করে। মোয়াজের এক কোপে আবু জাহলের পা কেটে দুখানা হয়ে যায়। এই ব্যাপার দেখে আবু জাহলের ছেলে ইক্রিমা মোয়াজকে আক্রমণ করে এবং এক কোপে তার বাঁ হাত প্রায় আলাদা করে ফেলে। মোয়াজের হাত শুধু চামড়ার সঙ্গে লেগে ঝুলছিল এবং তার গতিবিধিতে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। ফলে মোয়াজ পা দিয়ে ঝুলন্ত হাতটা চেপে ধরে টান মেরে তা দেহ

থেকে আলাদা করে ফেলে। এই ফাঁকে আবদুল্লা এককোপে আবু জাহলের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে এবং মাথাটা নিয়ে এসে নবীকে দেখায়। নবী উল্লাসে বলে ওঠেন, "আল্লার শত্রুর এই পরিণাম, আল্লা ভিন্ন দেবতা নেই।" ইসলামের আর এক পরম শত্রু তখনও জীবিত ছিল, আর সে হল উমাইয়া। আবদুর রহমান নামে এক মুসলমানের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল এবং সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে উমাইয়া মদিনায় গেলে সে তাকে রক্ষা করবে। সেই কারণে আবদুর রহমান উমাইয়াকে নিয়ে পাহাড়ের পিছনে এক নিরাপদ স্থানে যাচ্ছিল। কিন্তু বিলাল তা দেখে ফেলে এবং সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণ করে। আবদুর রহমান উমাইয়াকে শুয়ে পড়তে বলে এবং নিজে তার উপর শুয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা নীচ থেকে তরোয়াল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে হত্যা করে।

মহম্মদ আরও তিনদিন বদর প্রান্তরে কাটালেন। ইতিমধ্যে সব নিহতদের কবরস্থ করা হল এবং নবী মদিনার দিকে অগ্রসর হলেন। পথে ইসলামের আরও দুজন চরম শত্রু উকবা ও নযর-এর শিরচ্ছেদ করা হল। জীবনের প্রথম যুদ্ধে আসামান্য সাফল্য লাভ করে মহম্মদ বিজয়ীর বেশে মদিনায় প্রবেশ করলেন এবং আল্লা বদরের দিনকে "ইয়াওমুল ফুরকান" বা চরম মীমাংসার দিন বলে ঘোষণা করলেন (৮/৪১)।

বদর থেকে মদিনা যাবার পথেই সব লুঠের মাল ভাগ হয়ে গেল। যেই যেই মুসলমান শত্রুপক্ষের কাউকে হত্যা করে সেই নিহতের কাছ থেকে যা লুঠের মাল সংগ্রহ করেছিল তারাই সেই সব লুঠের মালের মালিক হল। গনিমতের মালের মধ্যে প্রধান ছিল ১১৫টি উট, ১৪টি ঘোড়া, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রসস্ত্র, চামড়ার জিনিস, পোসাক-আশাক, কার্পেট ইত্যাদি। লুঠের মাল বন্টনের সময় প্রথম দিকে একটু মনোমালিন্য হয়, কিন্তু আল্লা আয়াৎ অবতীর্ণ করে তার মীমাংসা করে দিলেন (৮/৪১)। আল্লার নির্দেশ অনুসারে নবী তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও দীন-দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য পবিত্র খুম হিসাবে এক-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখলেন। বাকীটা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আবু জাহলের ব্যবহৃত বিখ্যাত তরবারি জুলফিকর নবী নিজে গ্রহণ করলেন।

ইতিহাসে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। আপাতদৃষ্টিতে বদর যুদ্ধ একটা সমান্য ছোটখাট যুদ্ধ বা battle মাত্র, কিন্তু ম্যারাথন, ওয়াটারলু বা পলাশীর যুদ্ধের মতই তার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বদর যুদ্ধে মুসলমান বাহিনী পরাজিত হলে ইসলামের ইতিহাস সেদিনই শেষ হয়ে যেত এবং আরব তথা

বিশ্বের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। অপর দিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের অলৌকিক ও অসামান্য সাফল্য যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মনে একটা চিরন্তন প্রেরণার সঞ্চার করে আসছে। এই প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়েই আজও সুদূর বাংলাদেশের মুসলমান মাঝিরা "বদর বদর" বলে নৌকা ছাড়ে। আল্লা সহায় হলে অল্প সংখ্যক মুসলমানও অনেক বেশি সংখ্যক অ-মুসলমানকে পরাজিত করতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস বদর যুদ্ধের ফলাফলই তাদের মনে সঞ্চালিত করে আসছে।

দৈব সাহায্যের কথা বাদ দিলে যে যে কারণগুলো বিজয় হাসিল করতে মুসলমানদের সাহায্য করেছিল তার মধ্যে প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় আগের দিন রাত্রের বৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যদি ১৮১৫ সালের ১৭ই জুন রাত্রে বৃষ্টি না হত তবে পরের দিন নেপোলিয়নকে মাটি শুকোবার জন্য দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। আর নেপোলিয়ন ভোরবেলা থেকে যুদ্ধ শুরু করতে পারলে ওয়েলিংটনের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায় আগের দিন রাত্রে মুসলমানদের আকস্মিক নিদ্রালুভাব এবং সেই কারণে গভীর ঘুম যা তাদের শক্তিশালী করেছিল। একমাত্র সাদ ইবনে মোয়াজ একা খোলা তলোয়ারে সারারাত পাহারা দিয়েছিল। তৃতীয়ত বদর প্রান্তরের পূর্বদিকে মুসলমানবাহিনীর ও পশ্চিমদিকে কোরেশ বাহিনীর অবস্থান। ফলে ভোরের সূর্যের আলো কোরেশদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল এবং ঝড়ের সময়ও কোরেশরাই অসুবিধায় পড়েছিল। চতুর্থ কারণ হিসাবে বলা যায় যে কোরেশ বাহিনীতে শৃঙ্খলার খুবই অভাব ছিল। খাতা-কলমে প্রধান সেনাপতি ছিল উতবা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে দায়িত্ব পালন করছিল আবু জাহল। আবু জাহলের অশোভন ব্যবহারের ফলে কোরেশ বাহিনীর অনেকের মনেই অসন্তোষ ছিল। এই কারণে জোহরা ও আদিও গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ না করেই ফিরে গিয়েছিল এবং হাসেম গোত্রের লোকেরাও গা লাগিয়ে যুদ্ধ করেনি। পঞ্চম কারণ হিসাবে বলা যায় যে, সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে তারা জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিল এবং সেই কারণে বিশৃঙ্খলভাবে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালিয়েছিল। অপর দিকে মুসলীম বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল। সব কিছু পরিচালনা করছিলেন নবী একা এবং তাঁর সিদ্ধান্তে কারও কোন সন্দেহ বা দ্বিমত ছিল না। সর্বশেষ কারণ হিসাবে বলা যায় যে, মুসলমানদের কাছে এটা ছিল আত্মরক্ষার লড়াই, ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে তারা কুণ্ঠিত ছিল না এবং একটা নতুন গোঁড়া ধর্মান্ধতার ও ঘৃণার তত্ত্ব দ্বারা চালিত হবার ফলে তারা ছিল অনেক বেশী হিংস্র, নৃশংস ও উত্তেজিত।

মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বদর যুদ্ধে আল্লা মুসলমান বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাই তারা সেই অসম যুদ্ধে অলৌকিকভাবে জয়লাভ করতে পেরেছিল। আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি ও নিদ্রালুতার দ্বারা আল্লা তাদের সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধের সময় আল্লা কোরেশ বাহিনীর মধ্যে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে তারা মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী দেখছিল (৮/৪৪)। তাছাড়া দেবদূতদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তো ছিলই (৩/১২৪-১২৫)। আসমানী সৈন্যরা সাদা পাগড়ী এবং সাদা ও কালো রঙের ঘোড়া ব্যবহার করেছিল। এইসব ফেরেস্তারা কোরেশ সৈন্যদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে হত্যা করেছিল (৮/৫০)। অপর দিকে শয়তান ইবলিশ কোরেশদের আশ্বাস দিয়েছিল যে মানুষদের মধ্যে কেউই তাদের উপর বিজয়ী হবে না (৮/৪৮) এবং সোরাকা নামক এক ব্যক্তির বেশ ধরে সে তাদের সাহায্য করতে বদরে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণকে দেখতে পেয়ে সে তার সমস্ত চুক্তি বাতিল করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে (৮/৪৮)। যুদ্ধ শেষ হলে কোরেশরা মক্কায় ফিরে যখন আসল সোরাকাকে ধরল তখন সে অবাক হয়ে বলল, "আমি তো বদর যুদ্ধে যাইনি।" এতেই প্রমাণিত হয় যে শয়তানই সোরাকার রূপ ধরে বদরে এসেছিল। যুদ্ধ শেষ হলে কোরেশ সৈন্যদের শরীরে এমন অনেক আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় যা ফেরেস্তা ছাড়া মানুষের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকেই শুনতে পেয়েছিল কে যেন বলছে, "হাইজুম অগ্রসর হও" এবং এই হাইজুম হল ফেরেস্তা জিব্রাইলের ঘোড়ার নাম। তা ছাড়া কালামপাকে আল্লাতায়লা নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেস্তা পাঠিয়েছিলেন (৮/৫০)। উপরন্তু আল্লা পাক এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, ১০০ জন মুসলমান ১০০০ জন কাফেরের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে (৮/৬৫)।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ যায়েদকে নিজের উট আলকাসোয়ায় চাপিয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধজয়ের সংবাদ তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার জন্য। কবি আবদুল্লাও যায়েদের সঙ্গী হল। তারা মদিনায় পৌঁছালে মহম্মদের বিপক্ষের, বিশেষ করে কপট মুসলমানরা ভাবল যে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। উপরন্তু মহম্মদের বাহন আল কাসোয়ার পিঠে যায়েদ ও আবদুল্লাকে দেখে তারা ভাবল নিশ্চই মহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। কেউ কেউ কিছু উল্লাসও প্রকাশ করে ফেলল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাদের ভুল ভাঙল যখন যায়েদ জয়ের সংবাদ প্রকাশ করল। এর কয়েকদিন বাদেই মহম্মদ মদিনায়

ফিরলেন এবং কন্যা রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আনন্দ-উল্লাস অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়ল।

যুদ্ধবন্দীদের উপর মুসলমানরা যে মানবিক ব্যবহার করেছিল তাতে মহম্মদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান সৈন্যরা পায়ে হেঁটে বন্দীদের উটের পিঠে চাপিয়ে মদিনায় ফিরেছিল এবং নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাইয়েছিল। সঙ্গতিসম্পন্ন বন্দীদের ক্ষেত্রে ১০০০ থেকে ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণের বদলে মুক্ত করে দেওয়া হল এবং দরিদ্রদের মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হল। সর্বোপরি, ঐসব বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল তাদের নবী আদেশ করলেন অন্তত ১০ জন মদিনাবাসীকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং বললেন এটাই হবে তাদের মুক্তিপণ। এর ফলেই মদিনার দুই খ্যাতিমান যায়েদ বিন সাবিত ও হজরৎ আনাস শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই সব উদার নীতি গ্রহণ করার ফলে বন্দীদের প্রায় সকলেই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল এবং মক্কায় ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রসারে সাহায্য করতে থাকল।

যেসব মুসলমান বীররা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা "বদরী" নামে অত্যন্ত মর্যাদা'র আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। এমন কি যে পোশাক পরে বদরীরা যুদ্ধ করেছিলেন, কালে তাও এক অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিণত হল। পরবর্তীকালে খলিফা ওমরের সময় বার্ষিক ভাতা প্রাপকদের যে খাতা তৈরি হয় তাতে মহম্মদের বিধবা পত্নীদের পরেই ছিল বদরীদের নাম। পরবর্তী কালে এঁদের অনেক জঘন্য অপরাধও নবী শুধু বদরী বলেই মাফ করে দেন। বনি মুস্তালেক অভিযানের পর বিবি আয়েশাকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য কুৎসার সূত্রপাত হয় তখন হজরৎ মিস্‌তা, একজন কুৎসাকারী হওয়া সত্ত্বেও, বদরী বলে রেহাই পেয়ে যান।

মদিনায় যখন যুদ্ধজয়ের আনন্দ উৎসব চলছে, মক্কায় তখন চলছে যুদ্ধে নিহতদের বাড়ীতে বাড়ীতে শোকের ক্রন্দন। অন্যদিকে পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানিতে মুহ্যমান কোরেশ নেতাদের অন্তরে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। আবু সুফিয়ান সকলকে বলে বেড়াচ্ছে, "ক্রন্দন নয়, ক্রন্দনে ক্রোধ প্রশমিত হয়। ক্রন্দন না করে ক্রোধকে জিইয়ে রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যতদিন না মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করতে পারছি ততদিন চুলে তেল দেবো না এবং স্ত্রী সহবাস করব না।" আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বলে বেড়াতে থাকল, "যত দিন না কোরেশ বাহিনী মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ততদিন আমিও চুলে তেল দেব না এবং স্বামী সহবাস করব না।"

মহিলা কবি আসমা ও কবি আবু আফাকের গুপ্তহত্যা

বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মদিনায় নবীর প্রতিপত্তি ও মুসলমান, বিশেষভাবে মুহাজীরদের আধিপত্য যে অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবীর প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ মদিনার অ-মুসলমান অধিবাসীদের মনে, বিশেষভাবে বিধর্মী ইহুদীদের মনে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হল। এই ভয় ও ত্রাসের পিছনে একটা ধর্মীয় কারণও ছিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার কোরেশদের বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলমানের অলৌকিক বিজয় অনেকের মনে এই বিশ্বাসের সঞ্চার করল যে, সর্বশক্তিমান ভগবান মুসলমানদেরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন বা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র। তাই মুসলমানদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় যেতে তারা একেবারেই অনিচ্ছুক হতে থাকল। অপর দিকে নতুন ধর্মীয় উন্মাদনায় ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকল। বদর যুদ্ধে জয়লাভ নবীর চিন্তাভাবনার উপরও এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল এবং যেই সব বিপজ্জনক শত্রুকে তিনি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন, এবার তাদের উপর আঘাত হানার মত শক্তি ও সাহস তিনি মনে মনে অনুভব করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে আল্লাও নবীকে মদিনার অ-মুসলমানদের দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করার অধিকার দিয়ে বাণী অবতীর্ণ করলেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে ওর অধিবাসিবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি যাতে তারা বিনত হয়"(৭/৯৪)।

এই সময় মদিনায় প্রথম যার রক্তপাত ঘটানো হল তিনি হলেন একজন মহিলা। আউস গোত্রের মারোয়ান নামক ব্যক্তির মেয়ে কবি আসমা। তখনও মারওয়ানের পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়নি। আসমা যে মুসলমানদের পছন্দ করতেন না তা তিনি অকপটেই প্রকাশ করতেন। বদর যুদ্ধের ঠিক পরে পরেই শ্রীমতী আসমা কতগুলি ছড়া লেখেন। বিদ্রূপাত্মক ঐ সমস্ত ছড়ার মধ্য দিয়ে তিনি মদিনাবাসীকে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেন যে অজানা-অচেনা ভিনদেশী এক ব্যক্তিকে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে কি ভুলটাই না তারা করেছে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ ছড়াগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল এবং মহম্মদ ও তাঁর অনুচরদের কানে এসে পৌঁছালো। ওমর নামে মহম্মদের এক দৃষ্টিহীন অনুচর প্রতিজ্ঞা করল যে সে আসমাকে হত্যা করবে। অনেকের মতে অন্ধ ওমর আসমার প্রাক্তন স্বামী ছিল।

যাই হোক, একদিন রাতের অন্ধকারে সে আসমার শয়নঘরে প্রবেশ করল। আসমা তখন তাঁর শিশু সন্তানকে বুকে করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ওমর

প্রথমে শিশুটিকে দূরে সরিয়ে দিল এবং তারপর তার তরোয়াল আসমার বুকে আমূল বসিয়ে ছিল। সে এত জোরে তরোয়াল চালিয়েছিল যে আসমার দেহ খাটের সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে ওমর মসজিদে এলে নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মারোয়ানের মেয়েকে খতম করেছ?" ওমর বলল, "হ্যাঁ, তাতো করেছি, কিন্তু তার জন্য কি ভয়ের কোন কারণ আছে?" নবী বললেন, "মোটেও না, এই জন্য দুটো ছাগলেরও দায় পড়েনি যে তারা গুঁতোগুঁতি করবে।" তারপর নবী তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ডেকে বললেন, "যদি তোমরা এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে আল্লা ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করেছে, তবে এই হল সেই ব্যক্তি।" বদর যুদ্ধ থেকে নবীর ফিরে আসার কয়েক দিনের মধ্যে এই গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়।

উপরিউক্ত ঘটনার দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই মহম্মদের নির্দেশে কবি আবু আফাককে গুপ্ত হত্যা করা হয়। আবু আফাক আমর গোত্রে ইহুদি ছিল এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়। কিন্তু নবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না এবং কপট মুসলমান বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবু আফাকও মহম্মদ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে নবীর বিরক্তি উৎপাদন করত। এক-দিন মহম্মদ তাঁর অনুচরদের ডেকে বললেন " কে আমাকে এই বিরক্তিকর লোকটার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত?" আমর গোত্রেরই এক অনুচর এই কাজের দায়িত্ব নিল। একদিন আবু আফাক যখন উঠানে একটা চারপাই পেতে ঘুমাচ্ছিল, সে তখন তাকে তরোয়াল দিয়ে হত্যা করল। আঘাত খেয়ে আবু আফাক জোরে অর্তনাদ করার ফলে বাড়ীর ও আশে পাশের লোকজন এসে জড়ো হল কিন্তু হত্যাকরীকে ধরতে পারল না।

কবি কাব বিন আশরাফ-এর গুপ্তহত্যা

কবি কাব নজির গোষ্ঠীর ইহুদী ছিলেন এবং এই গুপ্তহত্যার ব্যাপারে Sir W. Muir লিখছেন, "I must not omit to notice another of those dastardly acts of cruelty which darken the pages of the Prophet's life".(The Life of Mahomet; voice of India, 1992,p-245). বদর যুদ্ধ জয় করার ফলে মহম্মদ তথা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি অন্যান্য ইহুদীদের মত কবি কাব-এর মনেও ত্রাসের সঞ্চার করল। তিনি মক্কা চলে গেলেন এবং পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোরেশদের উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। বদর যুদ্ধে নিহত কোরেশ বীরদের উদ্দেশ্যে করুণ শোকের গান লিখে মক্কায় প্রচার করলেন। মদিনায় ফিরে আসার পরে

মহম্মদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ খাড়া করা হল- তিনি নাকি একজন মুসলীম মহিলাকে উদ্দেশ করে প্রেমের কবিতা লিখেছেন।

কাব-এর হত্যার ব্যাপারে মহম্মদ আগের মত একই পন্থা অবলম্বন করলেন। একদিন মসজিদে তাঁর অনুচরদের উদ্দেশ করে বললেন,"এমন কোন ব্যক্তি আছে যে আমাকে আল আশরাফের ছেলের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম?" মাসলামার ছেলে মহম্মদ জবাব দিল, "আমি আছি। আমিই তাকে খতম করব।" এই জবাব শোনার পর নবী আউস গোত্রের সাদ বিন মোয়াজ-এর উপর হত্যার পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সাদের পরামর্শ অনুযায়ী আরও চারজনকে দলে নেওয়া হল যার মধ্যে এক-জন ছিল কবি কাব-এর সৎভাই আবু নয়লা।

সন্ধ্যার দিকে চক্রান্তকারীরা মহম্মদের কাছে উপস্থিত হল এবং নবী তাদের বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে এলেন এবং বললেন,"এবার যাও, আল্লার আশীর্বাদ তোমাদের উপর থাকল।" মদিনার উপকণ্ঠে ইহুদীদের বসতিতে কবি কাব-এর বাড়ী। হত্যাকারীর দল যখন সেখানে পৌঁছালো তখন কাব শোবার তাড়জোড় করছেন। এমন সময় আবু নয়লা তাকে ডাকল ও বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল। কাব চৌকি থেকে উঠে যাবার জন্য তৈরি হল কিন্তু তাঁর স্ত্রী পিছন থেকে জামা টেনে ধরল এবং বাইরে যেতে নিষেধ করল। সে বলল, "ঐ ডাকের মধ্যে আমি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আপনি বাইরে যাবেন না।" কবি কাব বললেন, "এ তো আমার ভাই আবু নয়লার গলা।" স্ত্রীর হাতে ধরে থাকা জামা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন,"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডাক এলে কোন বীর কি আর ঘরে বসে থাকতে পারে!" তবুও তাঁর স্ত্রী বলল,"ঐ ডাক যেন আমার কাছে শীতল মৃত্যুর ডাক বলে মনে হচ্ছে।"

বাইরে বেরিয়ে কাব চক্রান্তকারীদের সাথে হাঁটতে থাকলেন। মদিনার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে কথা হতে থাকলো। নবী বা মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই যে মদিনার উপর দুর্ভাগ্য ও হতাশার ছায়া নেমে এসেছে ইত্যাদি কথা বলে তারা কাব-এর বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে তারা একটা ছোট ঝরনার কাছে পৌঁছে গেছে এবং নির্মল চাঁদের আলোয় সেখানে কিছুক্ষণ কাটাবার জন্য সবাই বসে পড়ল। আবু নয়লা অত্যন্ত ভালবাসার ভান করে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল। তাঁর পোশাকের সুন্দর সুগন্ধীর প্রশংসা করতে থাকল। হঠাৎ চোখের পলকে আবু নয়লা চুল ধরে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিল এবং চীৎকার করে উঠল, "মার, আল্লার এই শত্রুকে মেরে ফেল।" সকলে তখন তরোয়াল নিয়ে কাব-এর উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল। আবু নয়লাকে তিনি এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে হত্যাকারীদের পক্ষে তাঁকে আঘাত করা মুশকিল হয়ে পড়ল। যাই হোক, মরণ আঘাত খেয়ে সাদ যখন আর্তনাদ করে উঠলেন তখন আশেপাশের ইহুদীদের ঘুম ভেঙে গেল, জানলায় জানলায় আলো দেখা গেল। এই অবসরে হত্যাকারীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। মহম্মদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে তারা যখন আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিল, নবী বুঝতে পারলেন যে তারা কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছে। মসজিদের দরজায় এসে নবী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। হত্যাকারীর দল তখন কাব-এর কাটা মুণ্ডুটা নবীর পায়ের কাছে রাখল এবং উৎফুল্ল নবী বললেন, "সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ।" কাব এর হত্যা সম্বন্ধে Sir W.Muir লিখছেন "I have been thus minute in the details of the murder of Kab. as it faithfully illustrates the ruthless fanaticism into which the teaching of the prophet was fast drifting .... The strong religious impulse under which they acted hurried them into excess of barbarous treachery, and justified that treachery by the interests of Islam and approval of the deity." (ibid, p-248).

কানুইকা গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়ন

কবি কাবকে হত্যা করার পরের দিন সকালে নবী তাঁর অনুচরদের অধিকার দিলেন যে, তারা যে কোন সময় যে কোন ইহুদীকে হত্যা করতে পারবে। ফলে ইহুদীদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হল। কবি কাব-এর করুণ পরিণতি তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। প্রতিটি ইহুদী পরিবার আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতে শুরু করল। এ সময় মদিনায় একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে কানুইকা গোত্রের ইহুদীরা নবীর রোষানলে পতিত হল।

বনি কানুইকারা স্বর্ণকার ছিল এবং সোনা রূপার গয়না তৈরি করে তাই থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। একদিন মদিনার বাজারে বনি কানুইকাদের সোনা-রূপার দোকানে একজন মুসলমান মহিলা গয়না কিনতে আসে, এবং কোন কারণে দোকানে অপেক্ষা করতে থাকে। এই সময় কেউ চুপিসাড়ে তার ঘাঘরার নিচের অংশ ব্লাউজের সঙ্গে পিন দিয়ে আটকে দেয়। ফলে সে যখন চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন তার শরীরের পিছন দিকটা অনাবৃত হয়ে পড়ল। তাই দেখে সেখানে উপস্থিত ইহুদীদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল। এই সময় একজন মুসলমান সেখানে উপস্থিত হল এবং বিদ্রূপকারী একজন ইহুদীকে

মেরে ফেলল। ইহুদীরা তখন সকলে মিলে সেই মুসলমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল।

এই সংবাদ কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ সামরিক সজ্জায় সজ্জিত দলবল নিয়ে বনি কানুইকাদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। নবী সম্ভবত এরকম একটা অজুহাতের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন কারণ তা না হলে এই সব ছোট-খাট ঝগড়া বিবাদ কথাবার্তার দ্বারা মিটিয়ে নেওয়াই তাঁর পক্ষে সঙ্গত ছিল। যাই হোক, খবর পেয়ে ইহুদীরা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিল এবং মুসলমান বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে বসল। মুসলমানরা আশা করেছিল যে অবদুল্লা বিন ওবে (যিনি মদিনার শাসনকর্তা হবার বাসনা মনে পোষণ করতেন) এবং খাজরাজ গোত্রের দলপতিরা মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সম্ভবত ভয়ে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করল না।

পনেরো দিন অবরোধের পর ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করল। এক এক জন করে দুর্গ থেকে বাইরে আসতে থাকল আর মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলতে থাকল। অন্য দিকে তাদের কৎল করার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এতগুলো নিরস্ত্র লোককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হবে তা চোখে দেখা আবদুল্লা বিন ওবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। উপরন্তু এই কানুইকারা ছিল তাঁর নিজের গোত্রেরই পরম মিত্র, তাই আবদুল্লা মহম্মদের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন, "দয়া করুন, আমি ওদের প্রাণভিক্ষা চাইছি।" প্রথমে মহম্মদ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবদুল্লা একই অনুরোধ বার বার করতে থাকলে নবীর মুখে ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল। আবদুল্লা তবুও মহম্মদের আলখাল্লার আঁচল ধরে ক্রমাগত একই অনুরোধ করতে থাকল। তারা সংখ্যায় ৭০০ জন ছিল। আবদুল্লা তাদের দেখিয়ে নবীকে বললেন, "মহম্মদ, এতগুলো মানুষকে এক দিনেই হত্যা করবেন? দয়া করুন"। শেষ পর্যন্ত এক রকম বিরক্ত হয়ে নবী বললেন, "এদের ছেড়ে দাও"। কিন্তু নবী হুকুম দিলেন যে তারা কেউ মদিনায় থাকতে পারবে না। মদিনা ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। আদেশ মত কানুইকারা সীরিয়ার পথে ওয়াদি আল খোরা নামক ইহুদী বসতির দিকে যাত্রা করল।

উপরিউক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে নবী তাঁর গোপন আদেশ প্রকারান্তরে মদিনাবাসীদের জানিয়ে দিলেন। সেই আদেশ বা আইন হল, একজন মুসলমান যে-কোন অ-মুসলমানকে যে-কোন সময় হত্যা করতে পারবে কিন্তু কোন বিধর্মী কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটাতে পারবে না। উপরন্তু নবী এটাও সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, মদিনার সমস্ত গোত্রপতিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত যে

চুক্তিপত্র কার্যকর করা হয়েছিল, বর্তমানে তা আর কোন কাজে আসবে না। এখন থেকে নবী যা ইচ্ছা করবেন সেটাই আইন।

কোরেশ বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠন

মদিনায় যখন এইসব ঘটনা ঘটছে মক্কায় তখন কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধের পরাজয়ের লজ্জা ও অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ২০০ জন ঘোড়সওয়ার সহ মদিনা যাত্রা করেছে। মদিনার উপকণ্ঠে যেখানে বনি নাজির গোত্রের লোকরা বসবাস করে, একদিন অতি প্রত্যুষে তাদের বসতি আক্রমণ করে ভুট্টার খেত জ্বালিয়ে দেয়, খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং তাদের দুজন লোককে হত্যা করে। এইসব করে মনের জ্বালা কিছুটা মিটলে আবু সুফিয়ানের দল মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। এ খবর মদিনায় পৌঁছানো মাত্র মহম্মদ তাঁর লোকজন নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করেন। পালাবার সময় কোরেশরা ঘোড়া হাল্কা করার জন্য খাবার ভর্তি থলি পথে ফেলে যায় এবং মহম্মদের লোকেরা সেগুলো কুড়িয়ে পায় কিন্তু কোরশদের ধরতে পারে না। বৃথা অনুসরণ করে মুসলমান বাহিনী পাঁচদিন পরে মদিনায় ফিরে আসে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মহম্মদ মদিনায় সর্বপ্রথম ঈদ উল আঝা পালন করেন।

এর কিছুদিন পরেই মহম্মদের কাছে খবর এল যে মক্কার কোরেশরা সাফোয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা সীরিয়া পাঠিয়েছে। এই বাণিজ্য কাফেলাকে পথ দেখাবার জন্য কোরেশরা এক বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিল এবং সে তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে এমন এক রাস্তা দিয়ে সে কাফেলাকে নিয়ে যাবে যে রাস্তা মুসলমানদের জানা নেই। খবর পাওয়া মাত্র মহম্মদ বাছা বাছা ১০০ জনের একটি দলকে যায়েদের নেতৃত্বে পাঠালেন। যায়েদ অতর্কিত কাফেলার উপর হামলা করল। কোরেশ নেতারা পালিয়ে গেল, বাকীরা বন্দী হল। এই কাফেলা মূলত সীরিয়া থেকে মালপত্র কেনার জন্যই যাচ্ছিল, তাই এই কাফেলায় মালপত্রের বদলে নগদ টাকা-পয়সাই বেশি ছিল। মোট লুঠের মাল হিসাবে প্রায় এক লক্ষ দিরহাম পাওয়া গেল এবং নবী তাঁর এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নেবার পর প্রত্যেকে ৮০০ দিরহাম করে ভাগে পেল। এর আগে কোন হামলাতেই মুসলমানরা এত মূল্যবান গনিমতের মাল পায়নি।

এই বছরই শেষের দিকে নবী তাঁর তৃতীয় পত্নী হাফসাকে বিবাহ করেন। ওমরের মেয়ে হাফসার তখন বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর। এই বিবাহের ফলে ওমরও আবু বকরের মত নবীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। এই

সময় আলির বয়স হল প্রায় ২৫ বছর এবং খুব অল্প বয়স থেকেই সে ছিল নবীর অত্যন্ত অনুগত। ইতিমধ্যে নবীর ছোট মেয়ে ফতেমার বয়সও ১৭/১৮ বছর হয়েছে। এই বছরই (৬২৪ খ্রীঃ) নবী আলি ও ফতেমার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করেন। এই বিবাহের একবছরের মাথায় নাতি হাসান এবং তার পরের বছর অপর নাতি হুসেন-এর জন্ম হয়।

ওহুদ' এর যুদ্ধ

হিজরীর চতুর্থ বছরে মক্কা থেকে মহম্মদের আর এক চাচা আব্বাস গোপনে নবীকে খবর পাঠালেন যে, মক্কার কোরেশরা প্রায় ৩০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা অভিযানে উদ্যত হয়েছে। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে কোরেশ ও মুসলমানদের মধ্যেকার বিবাদ এখন আর শুধু একটা ধর্মীয় বিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, অর্থনৈতিক বিবাদে পৌঁছে গেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যই হল মক্কার কোরেশদের প্রধান জীবিকা এবং মুসলমানদের দ্বারা ক্রমাগত তাদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন তাদের সেই প্রধান জীবিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কাজেই মুসলমানদের পরাজিত করে ধ্বংস করতে না পারলে ভবিষ্যতে হয়তো তাদের অনাহারে মারা যাবার উপক্রম হবে। সুতরাং মুসলমান শক্তিকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে হয়।

যাইহোক, ৬২৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল কোরেশ বাহিনী মক্কা ত্যাগ করল এবং অভিজাত সমস্ত কোরেশ দলপতিই এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করল। আবু সুফিয়ানের দুই স্ত্রী সহ ১৫ জন মহিলাও সঙ্গী হল। এই মহিলাদলের নেত্রী ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ'এর ক্রোধ ছিল মহম্মদের চাচা হামজার উপর কারণ বদর যুদ্ধে সে তার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হিন্দ হামজাকে হত্যা করার জন্য একজন হাবসীকে নিযুক্ত করেছিল এবং ঐ হাবসীটি বর্শা নিক্ষেপ করতে সুনিপুন ছিল। দশ দিন পর কোরেশ বাহিনী মদিনা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে আকিক উপত্যাকার জুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌছালো। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেখান থেকে আরও একটু এগিয়ে, ওহুদ পাহাড়ের নিম্নবর্তী প্রান্তরে তারা শিবির স্থাপন করল। এই ওহুদ প্রান্তর হয়েই সীরিয়া যাবার বাণিজ্যপথ উত্তর দিকে চলে গেছে।

কোরেশরা যে ৩০০০ লোকের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে এগিয়ে আসছে নবী ভেবেছিলেন সে সংবাদ গোপন রাখবেন। কিন্তু যেমন করেই হোক তা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যেদিন কোরেশ বাহিনী ওহুদ পৌছালো সে বৃহস্পতি বারেই মদিনায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে,

মুসলমান বাহিনী এগিয়ে গিয়ে নিজে থেকে আক্রমণ করবে না। যদি শত্রু বাহিনী মদিনায় ঢুকতে চেষ্টা করে তবে দূর থেকে তীর দিয়ে তাদের প্রতিহত করা হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অনেকেরই মনঃপূত হল না। অত্যুৎসাহীরা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করার পক্ষে মত দিল, অনেকেই বদর যুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিল। যাই হোক, পরদিন শুক্রবার নবী আক্রমণের আদেশ দিলেন।

পরদিন, শনিবার খুব ভোরে ১০০০ জনের মুসলমান বাহিণী মদিনা ত্যাগ করল। বাহিনী যখন ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছালো তখন ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। এমন সময় আবদুল্লা বিন ওবে সেখানে হাজির হল ও তার অনুগত ৩০০ জনকে নিয়ে মদিনায় ফিরে গেল। কাজেই মুসলমান বাহিণীতে থাকল মাত্র বাকী ৭০০ জন। দুদিকে পাহাড় এবং পাহাড় থেকে ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে আইনাইন উপত্যকা যা দক্ষিণদিকে আরও বিস্তৃত হয়েছে। কোরেশ বাহিনী দক্ষিণের এই বিস্তৃত স্থানটিতে তাদের শিবির স্থাপন করেছিল। মহম্মদ কিন্তু পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত উঁচু ও দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ সন্নিহিত স্থানটিকেই বেশী পছন্দ করলেন এবং শিবির স্থাপন করার আদেশ দিলেন। গিরিপথে তিনি ৫০ জন দক্ষ তীরন্দাজকে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে। এর পর তিনি মদিনার দিকে মুখ করে সামনের ব্যূহ রচনা করলেন। মাঝখানে মুহাজীরদের পতাকা নিয়ে থাকলেন মুসাব এবং তার এক পাশে থাকল খাজরাজ ও অপর পাশে থাকল আউস বাহিনী। এর পর চাচা হামজার উপর সৈন্য চালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

আরবের প্রথা অনুযায়ী প্রথমে কোরেশ বীর তালহা এগিয়ে এসে মুসলমানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। আলি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে উঠে গেলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তালহার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন। এর পর উঠে এল তালহার ভাই উসমান এবং বীর হামজার সঙ্গে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হামজা তাকে ভূতলশায়ী করে ফেললেন। তালহা ও উসমানের করুণ পরিণতি দেখে কোরেশ বাহিনী একযোগে আক্রমণ করল এবং আলি ও হামজা সে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। আলি ও হামজার আক্রমণে কোরেশ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল আর ঠিক এই সময়েই ঘটল এক অঘটন।

হামজাকে হত্যা করার জন্য যে হাবসীকে হিন্দ নিযুক্ত করেছিল তার নাম ছিল ওয়াশির এবং সে ছিল যুবায়ের ক্রীতদাস। তাকে বলা হয়েছিল যে হামজাকে হত্যা করতে পারলে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। ওয়াশির সুযোগের অপেক্ষায় পাহাড়ের আড়ালে বসেছিল। হামজার সমস্ত শরীর

লোহার বর্মে ঢাকা ছিল, কিন্তু পেটের নিচে কোন বর্ম ছিল না। সুযোগ বুঝে ওয়াশির তার বর্শা (হারবা) ছুঁড়ে মারল এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে তা হামজার তলপেট দিয়ে ঢুকে, মূত্রথলি ছিন্ন করে দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীর হামজার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। এই সময় কামিয়া নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে নবীর একখানা দাঁত ভেঙে গেল এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। এই ঘটনায় কোরেশরা রটিয়ে দিল যে মহম্মদের মৃত্যু হয়েছে।

এই সময় আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। আলি ও হামজার আক্রমণে কোরেশ বাহিনী যখন পিছু হঠছিল তখন মুসলমানরা তাদের জয় সুনিশ্চিত মনে করে যুদ্ধ ছেড়ে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এমন কি যে ৫০ জন তীরন্দাজকে নবী গিরিপথ রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করেছিলেন তারাও আদেশ অমান্য করে গিরিপথ অরক্ষিত রেখেই লোভের বশে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু হামজা মারা যাওয়াতে এবং মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়াতে মুসলমানরা যখন হতোদ্যম হয়ে পড়ল, সেই সুযোগে কোরেশ বাহিনী এগিয়ে গিয়ে অরক্ষিত গিরিপথ দখল করল এবং পিছনদিক থেকে আক্রমণ করে মুসলমান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। আহত মহম্মদকে কোনক্রমে ওহুদ পাহাড়ের উঁচু এক নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পেল। এইভাবে মুসলমানদের চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ওহুদ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। মুসলমানদের পক্ষে ৫ জন বীর সহ ৭০ জন শহীদ হল। অপর দিকে কোরেশদের ২৩ জন মারা গেল। যুদ্ধ শেষ হলে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ হামজার মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল এবং হামজার হৃৎপিন্ডটা বার করে চিবিয়ে চিবিয়ে নৃত্য করতে থাকল।

এই যুদ্ধে বীর হামজাকে হারিয়ে মুসলমানরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। হামজার মৃত্যু মহম্মদের কাছেও অত্যন্ত শোকের কারণ হয়েছিল কারণ সম্পর্কে চাচা হলেও হামজা ছিলেন নবীর সমবয়সী ও ছোটবেলার খেলার সাথী। হামজার দুঃখে মদিনার সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে নবীও কেঁদেছিলেন। সেই থেকে মদিনায় এই নিয়ম চালু হয় যে, কেউ কোন মৃতের জন্য কাঁদলে প্রথমে হামজার জন্য একটু কেঁদে নিতে হবে। পরবর্তীকালে মহম্মদ মক্কা অধিকার করলে হামজার হত্যাকারী ওয়াসির ভয়ে তায়েফে পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদে মদিনায় গিয়ে নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য হামজাকে হত্যা করেছিল বলে এবং ইসলাম কবুল করার জন্য নবী তাকে মাফ করে দেন। আবু বকর খলিফা হবার পরে যখন মুসাইলিমা কাজ্জাব-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়, ওয়াসির সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

যেভাবে সে হামজাকে হত্যা করেছিল ঠিক একইভাবে হারবা দ্বারা সে নকল নবী মুসাইলিমাকেও হত্যা করে।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের আর একটি বড় ক্ষতি বীর দাজানার মৃত্যু। যুদ্ধের আগে নবী তাঁর তরবারিটি দাজানাকে দিয়েছিলেন এবং সেও ঐ তরবারির সম্মান রক্ষার্থে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দকে নাগালের মধ্যে পেয়েও দাজানা স্ত্রীলোককে আঘাত করে তরবারির অমর্যাদা করেন নি। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ সেই তরবারি ভেঙে গেল। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে মুসলমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে এবং নবী মহম্মদ প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তখন নিরস্ত্র দাজানা নবীকে আড়াল করে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এমন সময় নবীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া এক বর্শার আঘাতে দাজানা লুটিয়ে পড়লেন এবং নিজের প্রাণ দিয়ে নবীর জীবন রক্ষা করলেন।

যাই হোক, ওহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের এই শিক্ষা দিল যে, সংখ্যা ও শক্তি জয়-পরাজয় নির্ণয় করে না, আল্লার ইচ্ছাতেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। উপরন্তু সবসময় রসুলের অনুগত থাকার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা অমান্য করলেও ফল ভাল হয় না। সবশেষে গনিমতের মালের জন্য অতিশয় লোভ ভাল নয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে যাবার জন্যই মুসলমান বাহিনী পরাজিত হয়। অনতিবিলম্বে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে আল্লা এইসব কাজের নিন্দা করলেন (৩/১৫২-১৫৩)। এর পর থেকে প্রতি বছরই নবী একবার ওহুদে যেতেন এবং মৃতদের কবরে প্রার্থনা করতেন।

রজি-র ঘটনা

ওহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করে কোরেশ বাহিনী মনের অনন্দে মক্কায় ফিরে এল। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে কাবায় গিয়ে চুল কামিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার সমাপ্তি ঘোষণা করল। এর পর কিছুদিনের জন্য মদিনায় কোন কোরেশ আক্রমণ হল না বটে কিন্তু সারা আরবে মহম্মদের সম্মান অনেক হানি হল। যাই হোক, ওহুদ যুদ্ধের দুমাস পরে মহম্মদ বনি আসাদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আবু সালামার নেতৃত্বে ১৫০ জনের একটা অভিযান পাঠালেন। খুব সহজেই বনি আসাদদের পরাজিত করে দলটি প্রচুর গনিমতের মালসহ ১১ দিন বাদে মদিনায় ফিরে এলো। তবে তখনকার মত পরাজয় মেনে নিলেও তাদের দলপতি তালিহার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকল। এরই ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে তালিহা নিজেকে নবী বলে প্রচার করে মহম্মদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

উপরিউক্ত ঘটনার মাসখানেক পরে (মে, ৬২৫ খ্রীঃ) নবী ছয় (মতান্তরে দশ) জনের একটি দলকে মক্কার দিকে পাঠান। খুব সম্ভবত মক্কার কোরেশদের গতিবিধির উপর নজর রাখা ও খবরাখবর সংগ্রহ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী লিহিয়ান গোত্রের লোকেরা মুসলমান হবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাই নবী ঐ দলটিকে পাঠিয়েছিলেন। এইখানে বলে রাখা ভাল হবে যে প্রায় মাসখানেক আগে নবীর কাছে খবর আসে যে উক্ত লিহিয়ান গোত্রের লোকেরা সাফোয়ান বিন খালিদ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কোরেশদের সাহায্যের জন্য সৈন্যসজ্জা করছে। ওহুদ যুদ্ধে কোরেশরা জয়ী হবার ফলেই তারা এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়। খবর পেয়ে নবী আবদুল্লা বিন ওনিসকে সেখানে পাঠালেন সাফোয়ানকে গুপ্তহত্যা করার জন্য। যথারীতি আবদুল্লা সেখানে গিয়ে সাফোয়ানের বিশ্বাস উৎপাদন করল এবং তাদের বাহিনীতে যোগ দিল। তারপর একদিন সাফোয়ানকে নির্জনে একা পেয়ে তাকে হত্যা করল এবং কাটা মুণ্ডটা মদিনায় এনে নবীকে উপহার দিল। কাজেই এটাও সম্ভব যে নেতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই তারা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে ভান করেছিল।

যাই হোক, দলটি যখন মক্কার নিকটবর্তী রজি নামক স্থানে পৌছাল তখন সেখানকার হুযাইল গোত্রের লোকেরা লিহিয়ান (পাঠান্তর লেইয়ান) গোত্রের কাছে সে খবর জানিয়ে দিল। তারাও তাদের সর্দারের খুনের প্রতিশোধ নিতে প্রায় ১০০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। মুসলমানরা প্রথমে পাহাড়ের উপর উঠে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করল, কিন্তু তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়ে তাদের আঘাত করতে থাকল। তখন তারা স্থির করল যে, প্রাণ যখন যাবেই তখন কয়েকজনকে মেরে মরাই ভাল। তারা পাহাড় থেকে নেমে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করল। সাত (মতান্তরে তিন) জন সেখানেই মারা গেল, বাকী তিনজন বন্দী হল। বন্দীদের এক জন হাতের বাঁধন আলগা করে পালাবার চেষ্টা করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে থেৎলে মেরে ফেলা হল। বাকী দুজন, খুবায়ের বিন আদি ও যায়েদ বিন দসনাকে মক্কার কোরেশদের কাছে বিক্রী করে দিল। খুবায়ের বদর যুদ্ধে হারেশকে হত্যা করেছিল, তাই তার ছেলেরা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মহানন্দে তাকে কিনে নিয়ে গেল, আর যায়েদকে কিনল সাফোয়ান বিন উমাইয়া।

পবিত্র সফর মাস অতিক্রান্ত হলে তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। কি ভাবে তাদের হত্যা করা হয় সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। এক মতে খুবায়েরকে নিকটবর্তী তানঈমের প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা ক্রুশের সঙ্গে

বেঁধে গা থেকে মাংস কেটে কেটে হত্যা করা হয় এবং কয়েকদিন বাদে যুবায়েব-এর শিরচ্ছেদ করা হয়। অন্য মতে যে সব কোরেশ দলপতি বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তাদের শিশুপুত্রদের সকলের হাতে ছুরি ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা কুপিয়ে কুপিয়ে দুজনকে হত্যা করে। এই ঘটনা রজি-র ঘটনা নামে খ্যাত।

বিরে মউনার ঘটনা

যে মাসে রজি-র ঘটনা ঘটে, সেই মাসেই আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। নেজদ অঞ্চলের হাওয়াজিন জাতির অন্তর্গত আমর ও সুলেম গোত্রের দলপতিদের নাম ছিল আবু বেরা ও আমর বিন তোফাইল। এরা মাঝে মাঝেই মদিনায় এসে নবীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করত। এর মধ্যে একদিন আবু বেরা দুটো ঘোড়া ও দুটো উট নিয়ে মদিনায় হাজির হয় এবং ঘোড়া ও উটগুলো নবীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে। নবী প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আবু বেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তবেই তিনি তার উপহার গ্রহণ করবেন। আবু বেরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করল বটে, তবে বলল যে যদি নবী তার বনি আমর গোত্রের লোকদের কাছে মুসলমানদের একটা দলকে পাঠান তবে তারা ইসলাম কবুল করবে। কিন্তু মহম্মদ বললেন যে, সেখানে কোন দল পাঠাতে তিনি খুবই ভীত কারণ নেজদের লোকেরা প্রথমত খুবই বিশ্বাসঘাতক এবং দ্বিতীয়ত তারা মক্কার কোরেশদের সমর্থন করে। তখন আবু বেরা নবীকে আশ্বাস দিল যে, সে নিজে দলের সুরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে।

যাই হোক, আবু বেরার প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে নবী ৪০ (মতান্তরে ৭০) জনের একটি দলকে পাঠালেন। এদের প্রায় সকলেই ছিল আনসার। চারদিন পরে দলটি বিরে মউনা নামক একটি নালার কাছে পৌছালো। জায়গাটা ছিল আমর ও সুলেম গোত্রের লোকদের বসতির মাঝমাঝি। নবী তাদের একটা পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন। বিরে মউনায় পৌছে তারা একজনকে দূত হিসাবে, ঐ চিঠি সহ আমর বিন তোফাইলের কাছে পাঠাল। আমর চিঠি না পড়েই সেই দূতকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করল এবং লোকজনকে বিরে মউনায় যাত্রা করার আদেশ দিল বাদবাকীদের হত্যা করতে। কিন্তু তারা আবু বেরার প্রতিশ্রুতি ভাঙতে রাজি হল না। তখন সে সুলেম গোত্রের লোকদের কাছে গেল। বদর যুদ্ধে সুলেম গোত্রের অনেকে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল বলে মুসলমানদের প্রতি তাদের একটা প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল। কাজেই খবর পাওয়া মাত্র বিশাল এক দল নিয়ে তারা বিরে মউনা যাত্রা করল। মুসলমানদের

দলটি তখন দূতের ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আমর বিন তোফাইলের লোকেরা দুজন বাদে আর সকলকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এই ঘটনা বিরে মউনার ঘটনা নামে খ্যাত।

নজির গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়ন

বিরে মউনার ঘটনায় যে দুজন বেঁচে গিয়েছিল তাদের একজনের নাম ছিল আমর বিন উমাইয়া। মদিনা ফেরার পথে আমরের সঙ্গে অন্য দুজন লোকের দেখা হল যারা আমর গোত্রের নিকট-বন্ধু। আমর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে এবং সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ দুজনকে হত্যা করে। কিন্তু পরে জানা গেল যে তারা নবীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চুক্তি করে মদিনা থেকে ফিরছিল। তাই উপরিউক্ত কাজের জন্য নবী আমরকে ভর্ৎসনা করলেন, উপরন্তু নিহত দুজনের জন্য উপযুক্ত রক্তপণ দিতে নির্দেশ দিলেন।

মদিনার উপকণ্ঠে নজির গোত্রের যে ইহুদীরা বাস করত তারা আমর গোত্রের মিত্র ছিল। তাই নবী যুক্তিযুক্ত মনে করলেন যে, বিরে মউনার ঘটনার কিছু দায়িত্ব স্মরণ করে আমর বিন উমাইয়ার উপর ধার্য রক্তপণের কিছুটা তাদের বহন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন অনুচর সহ প্রায় তিন মাইল দূরে নজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের বস্তিতে গিয়ে হাজির হলেন। জায়গাটা ছিল কোবার কাছেই। নবীর কথা শুনে ইহুদীরা এব্যাপারে অর্থসাহায্য করতে রাজি হল। কিন্তু নবী হঠাৎ কাউকে কিচ্ছু না বলে সেস্থান ত্যাগ করলেন। অনুচরেরা ভাবল নবী আবার ফিরে আসবেন তাই তারা অপেক্ষা করতে থাকল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা মদিনায় ফিরে দেখে নবী অনেক আগেই ফিরে এসেছেন। তাঁর এইভাবে চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নবী বললেন যে, তিনি যেখানে বসে ছিলেন তার কাছাকাছি একটি বাড়ীর চালার উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে ইহুদীরা তাঁর হত্যার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু কথা হল এই অভিযোগের স্বপক্ষে তেমন কোন তথ্য-প্রমাণ নেই এবং আল্লাও এ ব্যাপারে কোন বাণী অবতীর্ণ করেননি। যাইহোক, নবী মত দিলেন যে এই বিপজ্জনক লোকদের মদিনা থেকে উৎখাৎ করতে হবে। নবীর আদেশ নিয়ে কবি কাব-এর হত্যাকারী মহম্মদ বিন মাসলামা ইহুদীদের বস্তিতে গিয়ে হাজির হল এবং ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিল, "রসুলুল্লার আদেশ, দশদিনের মধ্যে তোমাদের মদিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং তারপর কেউ থাকলে তাকে হত্যা করা হবে।"

এতদিনকার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে শুনে ইহুদীরা

খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং ইতস্তত করতে থাকল। সর্বজনমান্য নেতা আবদুল্লা বিন ওবেও অস্বস্তি বোধ করলেন। প্রথমে তিনি নবীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইলেন, কিন্তু নবী অরাজী হওয়ায় তিনি নবীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। ইহুদীদের, তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তিনি তাঁর নিজের লোকজন এবং নেজদ থেকে মিত্রভাবাপন্ন লোকজন এনে নবীর প্রচেষ্টায় বাধা দেবেন। কাজেই ইহুদীরা নবীকে লিখে পাঠালো যে তারা মদিনা ছেড়ে যাবে না, নবী তাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বাহিনী এসে তাদের অবরোধ করল। কয়েকদিন এইভাবে চলল। কেউই তাদের সাহায্য করে নবীর ক্রোধের শিকার হতে রাজী হল না। নবী ইতিমধ্যে হুকুম জারী করলেন তাদের সমস্ত খেজুর গাছ কেটে ফেলতে এবং খেতের ফসল পুড়িয়ে দিতে। খেজুর গাছ কেটে ফেলা আরবে ভীষণ পাপ, প্রায় আমাদের ব্রহ্মহত্যার সামিল। তাই মুসলমানরা প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত নবীর আদেশ কার্যকর হল। দুই কি তিন সপ্তাহ অবরোধ চলার পর ইহুদীরা খবর পাঠাল যে তারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে ও মদিনা ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত।

দুটো পরিবার ধর্মত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করায় থেকে গেল এবং বাদবাকী সবাই উটের পিঠে, মালপত্র বোঝাই করে সীরিয়ার দিকে রওনা হল। হুয়াই ও কিনানা নামে দুই দলপতির নেতৃত্বে একটা অংশ মদিনার উত্তরে খয়বরে থেকে গেল এবং বাদবাকী সবাই দক্ষিণ সীরিয়া ও প্যালেস্টাইনের জেরিকো নগরের দিকে চলে গেল। গনিমতের মাল হিসাবে পাওয়া গেল শ'খানেক বর্ম এবং ৩৪০টি তলোয়ার আর বিশাল এক উর্বর জমি। এইসব মালের জন্যে যেহেতু যুদ্ধ করতে হয়নি তাই তা আর ভাগ-বাঁটোয়ারা করার প্রয়োজন হল না। সবটাই নবীর প্রাপ্য হল। এই জমির কিছুটা নবী নিজে নিলেন, কিছুটা আবু বকর, ওমর ও যুবায়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং বাকীটা গরীব মুহাজীরদের দিলেন। সমস্ত গনিমতের মাল যে নবীর প্রাপ্য আল্লা অনতিবিলম্বে কোরানের বানী অবতীর্ণ করে তা বুঝিয়ে দিলেন। আল্লা বললেন, "আল্লা নির্বাসিত ইহুদীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে চড়ে যুদ্ধ কর নাই; আল্লা তো যার উপরে ইচ্ছা তাঁর রসুলের কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৫৯/৬)। এ ব্যাপারে আল্লা আরও বললেন, "তোমরা কল্পনাও কর নাই যে ওরা নির্বাসিত হবে, এবং ওরা মনে করেছিল ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো ওদের রক্ষা করবে আল্লার বাহিনী হতে। কিন্তু আল্লার শাস্তি এমন দিক হতে আসল, যা ছিল ওদের ধারণাতীত। এবং ওদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল" (৫৯/২)। "যদি আল্লা ওদের সম্পর্কে

নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিতেন তবে পৃথিবীতে ওদের অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি আছে" (৫৯/৩)।

"ইহা এইজন্য যে, ওরা আল্লা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেহ্ আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লা তো শাস্তিদানে কঠোর" (৫৯/৪)। খেজুর গাছ কাটার ব্যাপারে আল্লা বললেন, " তোমরা যে কতক খেজুর গাছ কেটেছ অথবা ওর শিকড়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করেছ (অর্থাৎ কাট নাই) তা তো আল্লার অনুমতিক্রমে" (৫৯/৫)।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীতে নবী তাঁর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্নী, যথাক্রমে জয়নব বিন্ত খোজাইমা, উম্মে সালামা ও জয়নব বিন্ত জাশ-এর পানি গ্রহণ করেন। এরপর মুস্তালেক অভিযানের পর যুদ্ধবন্দী জয়েরিয়াকে সপ্তম পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন। এই মুস্তালেক অভিযানের সময়ই বিবি আয়েশাকে কেন্দ্র করে কুৎসার সূচনা হয়। নবী যখন উপরিউক্ত ঘরোয়া সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন ৫ম হিজরীর শেষের দিকে জিলকদ মাসে (৬২৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ) মক্কার কোরেশরা মদিনা অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। প্রায় ৩০০ অশ্বারোহী, ১৫০০ উষ্ট্রারোহী ও ৪০০০ পদাতিক সৈন্য সহ ১০,০০০ লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। দলের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের পর এই সংবাদে মদিনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হল। সলমন নামে একজন খ্রীস্টান যুদ্ধবন্দী দাস মদিনার চারদিকে গভীর পরিখা খনন করার পরামর্শ দিল। পরিখা খনন করে যুদ্ধ করার রীতি আরবে জানা ছিল না, কিন্তু নবী তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইজা ইহুদীদের কাছ থেকে গাঁইতি, শাবল, কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি ধার করে আনা হল এবং মদিনার অরক্ষিত উত্তর সীমান্ত বরাবর পরিখা কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। নবী নিজে অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকের মতই কাজে হাত লাগালেন এবং ৬ দিন নিরলস পরিশ্রম করার পর কাজ শেষ হল। ইতিমধ্যে গুপ্তচর খবর দিল যে কোরেশ বাহিনী ওহুদ পাহাড়ে পৌছে গিয়েছে। মদিনার তিনদিকে পাহাড় থাকায় সেই দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। এবং যেদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা সেই দিকও পরিখা কেটে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। তিনহাজার সৈন্যের মুসলমান বাহিনী সেই দশহাত প্রশস্ত দশহাত গভীর পরিখার কিনারে অপেক্ষা করতে থাকল। মহিলা ও শিশুদের মদিনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বনি হারেশের দোতলা দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং নবী ৩০০ সৈন্যের একটি

বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করলেন। পরিখার পাশেই লাল চামড়া দিয়ে তৈরি নবীর তাবু খাটানো হল। সেখানে বিবি আয়েশা, উম্মে সালামা এবং বিবি জয়নব পালাক্রমে আসতেন এবং থাকতেন।

ইতিমধ্যে কোরেশ বাহিনী মদিনায় পৌঁছে গিয়েছে। প্রথমে তারা মুসলমানদের পরিখা কাটার নতুন যুদ্ধকৌশল দেখে অবাক হয়ে গেল। যাই হোক, পরিখার উত্তরদিকে, তীরের পাল্লা থেকে দূরে তাদের ছাউনি ফেলল। বিশাল কোরেশ বাহিনীর উপস্থিতিতে মদিনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হল। "যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল, তোমাদের চোখ গোল হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লা সম্পর্কে নানা সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে। তখন বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল" (৩৩/১০-১১)। ইতিমধ্যে কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ান ও কুরাইজাদের নেতা কাব বিন আসাদ-এর মধ্যে এক গোপন বোঝাপড়া হল যে, কুরাইজারা কোরেশদের সহায়তা করবে। একমাত্র এই কুরাইজা গোত্রের ইহুদীরাই মদিনায় অবশিষ্ট ছিল এবং এদের আগে যে নজর ও কানুইকা গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় কোরেশদের বিশাল বাহিনী দেখে ইহুদীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এবার মুসলমানদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তাই মহম্মদের প্রতি তাদের জমে থাকা প্রতিহিংসা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হল না। তাই উপরিউক্ত গোপন চুক্তির সত্যতা যাচাই করার জন্য নবী যখন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দলপতিদের তাদের কাছে পাঠালেন তখন তারা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "মহম্মদ আবার কে? আল্লার রসুলই বা কে আর কেনই বা তাকে মান্য করতে হবে? আমাদের সঙ্গে তার এমন কোন চুক্তি হয়নি।"

তবে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ ব্যাপারে Sir W. Muir লিখছেন, "It is not easy to say exactly what compact did at this time exist between Mohammad and the Beni Koreiza, and what part the Beni Koreiza actually took in assisting the Allies. The evidence is altogether ex-parte, and naturally adverse to Beni Koreza." এ ব্যাপারে কোরান বলছে "যদি শত্রুগণ চারিদিক হতে নগরে প্রবেশ করে ওদের সাথে মিলিত হত এবং ওদের বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, ওরা অবশ্যই বিদ্রোহ করে বসত, ওরা এতে বিলম্ব করত না" (৩৩/১৪)। Sir W. Muir-এর মতে

যদি কুরাইজারা মুসলমানদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হত তবে আল্লা শুধু ওই একটি আয়াৎ অবতীর্ণ করে ক্ষান্ত থাকতেন না। এছাড়া আরও অনেক তথ্যাদি দ্বারা Sir W. Muir দেখিয়েছেন যে, কুরাইজারা যে চুক্তিভঙ্গ করে কোরেশদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল সে ব্যাপারে তেমন কোন অকাট্য প্রমাণ নেই (ibid, p-309)।

যাই হোক, খন্দকের উত্তরদিকে কোরেশ বাহিনী সৈন্য মোতায়েন করল যার প্রথম সারিতে থাকল খোড়সওয়ার বাহিনী। কিন্তু পরিখা পার হয়ে আক্রমণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। খোঁজাখুঁজি করে তারা একটা দুর্বল স্থান আবিষ্কার করল যেখানে পরিখা কিছুটা অপ্রশস্ত ছিল। প্রথমে আবু জাহলের ছেলে ইক্রামা দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে লাফ দিয়ে পরিখা পার হয়ে মুসলমান সৈন্যদের সামনে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে আলি কয়েকজন সুদক্ষ সৈন্য সঙ্গে করে তাকে বাধা দিতে অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে ইক্রামার পিছন পিছন পরিখা পার হয়ে উপস্থিত হল আরবের কিম্বদন্তি বীর আমর ইবনে অবদে উদ্দ। তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর। কিন্তু বীর হিসাবে তখনও তার সুখ্যাতি ছিল। কথিত আছে যে, বদর যুদ্ধে কোরেশ বাহিনীর পরাজয়ের পর আমর প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মহম্মদকে কৎল না করে সে নারী সংসর্গ করবে না।

পরিখা পার হয়ে আমর প্রথমে তার ঘোড়ার পা অকেজো করে দিল। (ঘোড়ার পিছনের পায়ে হাটুর বিপরীতে যে শক্ত ligament থাকে সেটা কেটে দেওয়া হয়। ইংরেজীতে একে maim করা বলে। এর ফলে ঘোড়া চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে।) কোন যোদ্ধা তার ঘোড়াকে এভাবে পঙ্গু করে দিলে বুঝতে হবে সে যুদ্ধ করে হয় জিতবে নয় মরবে, পালাবে না। যাই হোক, আমর পরিখা পার হয়ে মুসলমানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে থাকল এবং আলি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রথম চোটে আমরের তলোয়ারের আঘাতে আলির কপালে সামান্য আঘাত লাগল। নবীও বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন কারণ আমরের মত একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ যোদ্ধার কাছে আলির মত অল্পবয়স্ক একজন যুবক কখনই সঠিক প্রতিপক্ষ নয়। কথিত আছে যে, এই সময় আলি আমরকে বলে, 'কথা ছিল শুধু তোমাতে আর আমাতে যুদ্ধ হবে, অন্য কেউ সাহায্য করবে না। তাহলে তোমার ভাই কেন তোমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে।' আলির কথার সত্যতা যাচাই করতে যেই আমর পিছন ফিরে তাকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আলির প্রচণ্ড আঘাতে তার শরীর দুভাগ হয়ে গেল। এই আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব কোরেশরা পরিখা পার হয়ে পালিয়ে

যেতে চাইল। সবাই পার হয়ে গেল কিন্তু নউফল (মতান্তরে উমর) পরিখার মধ্যে পড়ে গেল। তখন যুবায়ের (মতান্তরে আলি) পরিখার মধ্যে নেমে তাকে হত্যা করল। সেইদিন কোরেশদের দিক থেকে আর কোন আক্রমণের প্রচেষ্টা হল না। কিন্তু রাত্রিতে তারা বিশাল এক প্রস্তুতি নিল।

সকাল হতেই পরিখার সেই দুর্বল জায়গায় কোরেশরা সৈন্য সমাবেশ করল। সেই জায়গা থেকে নবীর তাঁবু ছিল খুবই কাছে। কাজেই মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনীও অসীম বিক্রমে সেই স্থান রক্ষা করতে থাকল। সারাদিন ধরে এটা চলতে থাকল এবং মুসলমান বাহিনীর তৎপরতা ও সাহসের জন্য কোরেশ বাহিনীর পক্ষে পরিখা পার হয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ করা সম্ভব হয়ে উঠল না। রাত্রিতেও খালিদ-এর নেতৃত্বে মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকল। সারাদিন মুসলমানদের পক্ষে ৫ জন শহীদ হল এবং আউস গোত্রের নেতা সাদ ইবনে মোয়াজ গুরুতরভাবে আহত হলেন। কোরেশ বাহিনীর কোন এক ব্যক্তি, 'এটা আল আরাকার নামে গ্রহণ করো'', এই বলে একটা তীর ছোঁড়ে এবং সেটা সাদ-এর কাঁধে বিদ্ধ হয়।

যাই হোক, ৭ থেকে ১০ দিন এভাবেই কাটল। কোরেশ বাহিনী পরিখার ওপারে বসে থাকল আর মুসলমান বাহিনী দিন-রাত পরিখা পাহারা দিতে থাকল। কোরেশদের দলে গাফাতান গোত্রের বেদুইনদের কিছু লোক ছিল। মহম্মদ গোপনে তাদের কাছে খবর পাঠালেন যে, তারা যদি কোরেশ বাহিনীকে পরিত্যাগ করে তবে তিনি মদিনায় উৎপন্ন সমস্ত খেজুরের তিনভাগের এক ভাগ তাদের দেবেন। কিন্তু গাফাতানরা অর্ধেক খেজুর দাবি করায় তা আর অগ্রসর হল না। কোরেশ বাহিনীতে নঈম বলে আর এক ব্যক্তি ছিল। সে দুপক্ষেরই ঘনিষ্ঠ ছিল। মহম্মদ নঈমকে ডেকে কোরেশ বাহিনীর ভিতরে ভাঙ্গন ধরাবার অনুরোধ করলেন। নঈম প্রথমে কুরাইজাদের কাছে গিয়ে বলল, ''তোমরা কোরেশদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু যদি কোরেশরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের মহম্মদের কাছে রেখে পালায় তবে তোমাদের ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। তাই তোমরা প্রথমে কোরেশদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় কর যে বিপদের সময় তারা যেন তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়।'' এর পরেই নঈম কোরেশ নেতাদের কাছে গিয়ে বলল, 'কুরাইজারা ইতিমধ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য মহম্মদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং কথা দিয়েছে যে, তোমাদের কেউ তাদের দুর্গে আশ্রয় নিলে তাকে মহম্মদের হাতে তুলে দেবে এবং তোমাদের বিপক্ষে মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করবে।'' মহম্মদের এই কুট চালে কাজ হল, কোরেশ ও ইহুদীদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব

পরস্পরের প্রতি সন্দেহে পর্যবসিত হল। নঈমের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য কোরেশরা কুরাইজাদের তাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানাল। কিন্তু কুরাইজারা সেদিন সাব্বাথ বা তাদের পবিত্র দিন এই অজুহাতে কোরেশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই কোরেশদের সন্দেহ প্রবল হল। অনেকের মতে নঈম গোপনে মুসলমান হয়েছিল।

কোরেশরা বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছিল এই ভেবে যে, দু-এক দিন যুদ্ধ করে মদিনা দখল করে মুসলমানদের শেষ করে মক্কায় ফিরে যাবে। কিন্তু এতদিন অবরোধ করে থাকাতে তাদের খাদ্য, পানীয়, রসদ সবই ফুরিয়ে আসতে লাগল। পশুখাদ্যের অভাবে ঘোড়া ও উট মারা পড়তে লাগল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মদিনার উচ্চতা প্রায় ৭০০০ ফুট, উপরন্তু তখন ছিল শীতকাল। তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কোরেশ বাহিনী কাবু হয়ে পড়ল। এর মধ্যে একদিন রাত্রে এল প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি। প্রচণ্ড বাতাসে তাদের তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে গেল। পরে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে বললেন যে, বিশ্বাসিদের সাহায্য করার জন্যই তিনি সেই ঘূর্ণি ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন—"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল, আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যা কর আল্লা তার দ্রষ্টা" (৩৩/৯)। যাইহোক, দুর্যোগ কেটে যাওয়া মাত্রই আবু সুফিয়ান সকলকে হতবাক করে বলে উঠল, "অনেক হয়েছে, এবার শিবির তোল, মক্কায় ফিরে চল।" রাত পোহালে মুসলমানরা দেখতে পেল শত্রুর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। আল্লা বললেন, "আল্লা অবিশ্বাসকারীদের তাদের ক্রোধসহ বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লা সর্বশক্তিমান" (৩৩/২৫)। বিগত দশ-বারো দিন ধরে দিবারাত্র পরিখা পাহারা দেবার কঠিন পরিশ্রমে মুসলমান বাহিনীও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারাও বিশ্রামের আশায় যার যার ঘরের দিকে রওনা দিল।

কুরাইজা ইহুদীদেরকে গণহত্যা

খন্দক যুদ্ধ যেদিন শেষ হল সেদিনই জিব্রাইলের আদেশে মহম্মদ কুরাইজাদের দুর্গ অবরোধ করতে চললেন। বিলাল সব মুসলমান যোদ্ধাদের ডেকে একত্র করল। প্রায় ৩০০০ জনের বাহিনী নিয়ে নবী তাঁর গাধার পিঠে করে মদিনার দক্ষিণ-পূর্বে, ২ থেকে ৩ মাইল দূরে কুরাইজাদের দুর্গের উদ্দেশে চললেন। দুর্গের খুব কাছেই শিবির স্থাপন করা হল এবং সেখানেই এশা'র

নামাজ আদায় করা হল। এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। মুসলমানদের একজন কোন কারণে দুর্গের কাছে গিয়েছিল, একজন ইহুদী মহিলা তার মাথার উপর পাথরের যাঁতা ফেলে। ফলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। দুর্গের ভিতরে ইহুদীদের মধ্যে ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা মহম্মদকে খবর পাঠায় যে তাদের ছেড়ে দিলে তারা খালিহাতে মদিনা ত্যাগ করতে রাজী আছে। কিন্তু নবী সে আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। কুরাইজাদের সঙ্গে আউস গোত্রের মৈত্রী ছিল। তারা সেই পুরানো বন্ধুত্বের সূত্র ধরে মহম্মদের কাছে আবেদন পাঠায় যে, আউস গোত্রের আবু লুবাবাকে যেন দুর্গে পাঠানো হয়। আবু লুবাবা দুর্গে প্রবেশ করলে মেয়েদের কান্না ও শিশুদের চীৎকারে এক করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কথাবার্তার পর আবু লুবাবা গলায় তর্জনী ঠেকিয়ে প্রকারান্তরে তাদের বুঝিয়ে দিল যে, মৃত্যুই তাদের সম্ভাব্য পরিণাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আবু লুবাবা বুঝতে পারল যে নবীর মনোগত ইচ্ছা তাদের কাছে প্রকাশ করা উচিত কাজ হয়নি। তাই সে নবীর কাছে তার অসঙ্গত আচরণের কথা অকপটে স্বীকার করে মার্জনা চাইল। কিন্তু নবী হ্যাঁ বা না, কিছুই বললেন না। আবু লুবাবা তৎক্ষণাৎ মসজিদে চলে গেল এবং একটা থামের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, নবী মার্জনা না করা পর্যন্ত সে ঐভাবেই থাকবে। বেশ কয়েকদিন এইভাবে কাটল। শেষ পর্যন্ত নবী তাকে মার্জনা করে বাঁধন খুলে ফেলতে বলেন। মদিনার মসজিদের সেই স্তম্ভটা আজও অনুতাপের স্তম্ভ বলে খ্যাত এবং তীর্থযাত্রীদের কাছে দর্শনীয় হয়ে আছে।

দুর্গ অবরোধ কতদিন চলেছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারও মতে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ এবং কারও মতে এক থেকে দেড় মাস। যাই হোক, ঐ সময় পরে কুরাইজারা আত্মসমর্পণ করল। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল এবং মহিলা ও শিশুদের আলাদা করে ফেলা হল। কবি কাব হত্যাকারী মহম্মদ বিন মাসলামার তত্ত্বাবধানে পুরুষদের এবং মহিলা ও শিশুদের একজন ধর্মান্তরিত ইহুদীর তত্ত্বাবধানে রাখা হল। মহিলাদের মধ্যে নবীর চোখ সুন্দরী রিহানার উপরে পতিত হল এবং তিনি মনে মনে তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করে রাখলেন। আত্মসমর্পণের আগে কুরাইজারা নবীর কাছে শেষ আবেদন পাঠিয়েছিল যেন তাদের বিচার তাদেরই বন্ধু আউস গোত্রের কাউকে দিয়ে করানো হয় এবং নবী তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

আউস গোত্রের লোকেরা ইতিমধ্যে নবীর কাছে তাদের পুরানো মৈত্রীর সূত্রধরে আবেদন করতে শুরু করেছে, তাদের যেন প্রাণে না মারা হয়। তারা নবীর কাছে আবেদন জানাল, নজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের যা করা হয়েছে (অর্থাৎ

মদিনা থেকে বিতাড়ন) এদের প্রতিও যেন তাই করা হয়। নবী তখন বললেন যে, "তোমাদের মধ্যেই কেউ যদি বিচার করে তবে তোমরা খুশি তো?" তারা সম্মতি জানালে নবী তৎক্ষণাৎ সাদ ইবনে মোয়াজ-এর নাম প্রস্তাব করলেন। পরিখার যুদ্ধে কাঁধে তীর বিদ্ধ হওয়ায় সাদ তখনও অসুস্থ ছিলেন। সাদ যে বর্তমানে কুরাইজাদের প্রতি সদয় নয়, নবী তা জানতেন। খন্দক যুদ্ধের সময় তথাকথিত বিশ্বাসঘাকতা করার জন্য কুরাইজাদের প্রতি সাদ-এর মনের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। বন্ধুর বদলে তারা হয়েছে ঘৃণ্য চক্রান্তকারী।

নবীর নির্দেশে অসুস্থ সাদকে নিয়ে আসা হল। আউস গোত্রের লোকেরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল এবং দয়ার জন্য আবেদন করতে থাকল। অপর দিকে নবী তাকে তার বিচারের রায় জানাতে বললেন। অত্যন্ত বিষাদময় পরিস্থিতি। মাঝখানে স্তূপীকৃত গনিমতের মাল। একদিকে ভয়ে ম্লান হওয়া নারী ও শিশুর কান্না, অন্য দিকে পিঠমোড়া করে বাঁধা ৮০০ লোক। সবাইকে ঘিরে আছে মদিনার মুসলমান বাহিনী, যাদের চোখ পড়ে আছে গনিমতের মালের উপর। কিছুক্ষণ বাদেই যা তাদের হবে। নবী আবার সাদকে তার বিচারের রায় জানাতে বললেন। আউসরা তখনও সমানে দয়া করার আবেদন জানিয়ে চলেছে। সাদ তাদের দিকে ফিরে বলল, "আমি যে রায় দেব, আল্লার রায় বলে তোমরা কি তা মেনে নেবে?" চারিদিক থেকে মৃদু সম্মতির আওয়াজ ভেসে এল। তখন সাদ বলল, "আমার রায় হল, সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হবে এবং গনিমতের মাল মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।" নবী তৎক্ষণাৎ এই রায়কে সম্পূর্ণ সঠিক রায় বলে ঘোষণা করলেন এবং বললেন, "সপ্তম স্বর্গ থেকে স্বয়ং আল্লার বিচারই সাদ-এর বিচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।" (এর পরের ঘটনা 'ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ" অধ্যায়ে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।) নারীদের মধ্যে মাত্র একজনকেই হত্যা করা হয়েছিল, যে উপর থেকে যাঁতা ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এই মহিলা অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল ছিল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে বিবি আয়েশা ও নবীর অন্যান্য বিবিদের সঙ্গে গল্প ও হাসি-তামাসা করছিল। যখন তার ডাক এল তখন হাসতে হাসতেই বিবিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘাতকের সঙ্গে রওনা দিল।

গনিমতের মাল প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল : (১) জমি-জায়গা বা স্থাবর সম্পত্তি, (২) অস্থাবর সম্পত্তি, (৩) গৃহপালিত পশু এবং (৪) ক্রীতদাস। নবী সব থেকেই তাঁর প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করলেন। নবীর ভাগে যে সব নারী ক্রীতদাস পড়ল তাদের মধ্য থেকে কতককে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের উপহার দিলেন। বাকীদের বিক্রীর জন্য নেজদে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

মদিনাতেই নারী ক্রীতদাসীদের নীলাম হল। এই সব ক্রীতদাসীদের বিক্রী করে কে কত টাকা উপায় করেছিল তারও কিছুটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। কাব হত্যাকারী মহম্মদ তিনটি ক্রীতদাসী ভাগে পেয়েছিল এবং তাদের বিক্রী করে সে ৪৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়েছিল। সমস্ত ক্রীতদাসীদের অনুমানিক দাম ৪০,০০০ দীনার হয়েছিল। মহম্মদ তার অংশের ক্রীতদাসীদের বেশ কয়েকজনকে ওসমান ও আবদুর রহমানের কাছে বেচে দেন। তারা দুজনে তাদের রয়স্কা ও যুবতী, এই দুই দলে ভাগ করে। ওসমান বয়স্কাদের নেন এবং আবদুর রহমান নেয় যুবতী ও অল্পবয়স্কাদের। খয়বরের ইহুদীরা এদের চড়া মুক্তিপণ দিয়ে কিনে মুক্ত করে। ফলে ওসমান ও আবদুর রহমানের প্রচুর আয় হয়। এই সব ব্যাপারে কোরানের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লা বললেন, "কেতাবীদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল তাদের তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে বন্দী করছ। তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পত্তির অধিকারী করলেন" (৩৩/২৬,২৭)।

কুরাইজাদের গণহত্যার ফলে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দিক থেকে নবীর বিরোধী শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও অপসারিত হল। উপরন্তু মদিনাবাসীদের মনে এমন ভয়ানক শঙ্কা ও ত্রাসের সৃষ্টি হল যে নবীর কাজের বিরোধিতা তো বটেই, কোন রকমসমালোচনাও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাজেই ত্রাসের রাজত্বের মধ্য দিয়ে নবীর একচ্ছত্র ক্ষমতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। সম্ভবত নবীর উপরিউক্ত ধারা অনুসরণ করেই আজও কোন মুসলীম দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ঐ সমস্ত দেশগুলোতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় নবীর উপরিউক্ত কর্মধারাই যে তার প্রেরণা এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অ বকাশ নেই। বনি কুরাইজাদের গণহত্যার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir লিখছেন, "Mohammad's policy todwards the Jews, from the period shortly after his arrival at Medina, had been severe and oppressive .... He had caused the assassination of several Jews in such a manner as to create universal distrust and alarm. ----- But the indiscriminate slaughter of eight hundred men, and the subjugation of the women and children of the whole tribe to slavery, cannot be recognised otherwise than as an act of monstrous cruelty. ......In short, the butchery of Beni Koreiza casts an indelible blot upon the life of Mohammad." (ibid, p-323).

অন্য দিকে সাদ ইবনে মোয়াজের কি হল সেটা বলে এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটানো সঙ্গত হবে। রায় দেবার পর সকলে ধরাধরি করে অসুস্থ সাদকে গাধার পিঠে চাপিয়ে চিকিৎসক রুফিদার তাঁবুতে নিয়ে গেল। কিন্তু মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে তার মানসিক উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পেল যে কাঁধের তীরের ক্ষত ও তার যন্ত্রণা অসম্ভব বৃদ্ধি পেল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী সেখানে হাজির হলেন এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। কথিত আছে যে, সাদ-এর মৃতদেহ কবরে বয়ে নেবার সময় ওজন অনেক কম বোধ হচ্ছিল এবং নবী এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ফেরেস্তারাও মৃতদেহ বয়ে নিতে কাঁধ লাগিয়েছিল।

হিজরীর ষষ্ঠ বছর

হিজরীর ৬ষ্ঠ বছরে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বড় অভিযান না হলেও ছোট ছোট অনেক অভিযান সংঘটিত হয়। বিখ্যাত রজির ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নবী নিজে ২০০ জন সৈন্য ও ২০ জন ঘোড়-সওয়ার সহ লিহিয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযানে যান। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু লিহিয়ানরা আগে থেকে খবর পেয়ে যায় এবং বসতি তুলে পাহাড়ের উপরে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। কাজেই মহম্মদকে খালি হাতেই ফিরতে হয়। এর মাস কয়েক পরে নেজদ-এর গাফাতান গোত্রের লোকদের সঙ্গে চারণভূমির দখল নিয়ে মুসলমানদের বিবাদ উপস্থিত হয়। নবী ১০ জনের একটি দলকে কাব হত্যাকারী মহম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে সেখানে পাঠালেন। দলটি যখন জুল কাসা নামক স্থানে পৌঁছালো তখন গাফাতানরা অকস্মাৎ তাদের ঘিরে ফেলল এবং সবাইকে কেটে ফেলল। শুধু মহম্মদ বিন মাসলামা কোনমতে বেঁচে ফিরল। নবী তখন আবু ওবেইদার নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি দলকে পাঠালেন। কিন্তু অপরাধীদের ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

ঐ বছরই শীতকালে নবী যায়েদের নেতৃত্বে ছোট একটি বাণিজ্য কাফেলাকে সীরিয়ার দিকে পাঠালেন। কিন্তু পথে ফেজারা গোত্রের লোকেরা তা লুঠ করে নিল এবং যায়েদ আহত হল। যায়েদ সুস্থ হলে নবী আবার তাকে লোকজন সহ সেখানে পাঠালেন। তারা ফেরাজাদের বস্তিতে গিয়ে কাউকেই পেল না, পেল উম্মে কিরফা নামক এক বৃদ্ধা এবং একটি বালিকাকে। মুসলমানরা সেই বৃদ্ধার দুই পায়ের সঙ্গে দুটো উট বেঁধে উট চালিযে দিল এবং নির্মম ভাবে সেই বৃদ্ধাকে হত্যা করল।

নজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করার পর তারা অনেকেই

খয়বরের ইহুদী বসতিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। আবু রাফে ছিল এদের দলপতি। ইতিমধ্যে নবীর কাছে খবর এলো যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আবু রাফে মদিনার নিকটবর্তী বেদুইন গোষ্ঠীগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। মহম্মদ পাঁচজনের এক গুপ্ত ঘাতকের দলকে খয়বরে পাঠালেন। খয়বরে পৌঁছে তারা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকল। রাতের অন্ধকারে আবু রাফের বাড়ীতে চাড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে আবার মদিনায় ফিরে এল। আবু রাফেকে হত্যা করে নবী দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। খবর এলো যে নতুন দলপতি ইউসির আবু রাফের মতই বেদুইনদের, বিশেষ করে নেজদের গাফাতানদের হাত করার চেষ্টা করছে। নবী ইবনে রওয়াহার নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি দলকে খয়বরে পাঠালেন। তারা গিয়ে ইউসিরকে বলল যে নবী তাকে মদিনায় যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিপদের কোন ভয় নেই এবং নবী সম্ভবত তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে খয়বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন। ইউসির রাজী হল এবং মদিনা যাত্রা করল। এবার প্রত্যেক উটের পিঠে দুজন সওয়ার হল, সামনে মুসলমান দলের একজন এবং পিছনে একজন ইহুদী। ইউসির সওয়ার হলেন আবদুল্লা বিন ওনিসের উটে। কিছুদূর আসার পর পূর্ব পরিকল্পনামত প্রথমে আবদুল্লা পিছনে বসা ইউসিরকে হত্যা করল এবং অন্য মুসলমানরাও একইভাবে পিছনে বসা ইহুদীকে হত্যা করল। মাত্র একজন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল। মদিনায় ফিরে যখন তারা সব ঘটনা নবীকে জানালো, নবী সব শুনে বললেন, ''অবশ্যই আল্লা একজন নীতিহীনের হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন।''

এই বছরই নবী উকল গোত্রের ৮ জন অপরাধীকে নিজের হাতে বীভৎস ভাবে হত্যা করে তাদের অপরাধের সাজা দেন (হজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে উপরউক্ত শাস্তিদানের পরে নবী সম্ভবত বুঝতে পারেন যে তাঁর শাস্তির মাধ্যমে সামান্য মানবিকতাও লঙ্ঘিত হয়েছে। এই ঘটনার পরই আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, ''যারা আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এই যে—তাদের হত্যা কর কিংবা শূলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর, কিংবা তাদের দেশ হতে বহিষ্কার কর। ইহাই তাদের পার্থিব প্রতিফল এবং পরকালে তাদের জন্য বিষম শাস্তি আছে'' (৫/৩৩)।

হুদাইবিয়া'র চুক্তি

হিজরীর ৬ষ্ঠ বছরে, জিলকজ মাসে (৬২৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে) নবী মক্কায় ওমরা পালন করতে যাবেন স্থির করলেন। এতে মুহাজীরদের মধ্যে

উৎসাহের সাড়া পরে গেল। জিলকজ মাসের প্রথম দিকে কোন একদিন নবী ইহরাম পরিধান করে, লাব্বাইক, লাব্বাইক বলতে বলতে আল কাসোয়ায় চড়ে বসলেন। সঙ্গে চলল প্রায় ১৫০০ মুসলমানের তীর্থযাত্রী দল। নবী সঙ্গে নিলেন কোরবানীর ৭০টি উট। বিবি উম্মে সালামা নবীর সঙ্গী হলেন। সকলের সামনে চলল ২০ জনের অশ্বারোহী বাহিনী এবং তার পিছনে তলোয়ার ও তীরধনুক- ধারী পদাতিক বাহিনী। মক্কার কাছাকাছি পৌছুবার পর কোরেশদের মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে গেল এবং আবু জাহলের ছেলে ইক্রামা ও খালিদ-এর নেতৃত্বে ২০০ ঘোড়-সওয়ারের বাহিনী গতিরোধ করল। প্রধান রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় মুসলমান বাহিনী ডানদিকের নিরাপদ রাস্তা ধরে আল হুদাইবিয়া নামক প্রান্তরে উপস্থিত হল।

মুসলমানরা হুদাইবিয়ার প্রান্তরে শিবিরে ফেলেছে জানতে পেরে কোরেশরা বুদাইল নামে একজন দলপতিকে সেখানে পাঠালো মহম্মদের আগমনের উদ্দেশ্য জানার জন্য। নবী তাকে বললেন যে তাঁর আসার উদ্দেশ্য খুবই নিষ্পাপ, শুধু তীর্থ করা, কোন যুদ্ধ করা নয়। নবীর বোঝাতে খুব অসুবিধা হল না কারণ এমনিতেই জিলকজ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। এর পর দূত হিসাবে এল আবু সুফিয়ানের জামাতা উরউয়া এবং নবী তাকে একই কথা বললেন। দূতের মুখে সব শুনে কোরেশরা জানিয়ে দিল যে, এ বছর কোনমতেই মহম্মদকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সামনের বছর তীর্থ করতে এলে তাঁকে মক্কা প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

এর পর নবী ওসমানকে তাঁর দূত হিসাবে মক্কায় পাঠালেন। ওসমান গিয়ে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথা বললেন। সে তার সিদ্ধান্তের কথা ওসমানকে জানিয়ে দিয়ে বলল, এ বছর কোন মতেই মহম্মদকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ওসমানের ফিরতে দেরী হওয়ায় মুসলমানরা ভাবল কোরেশরা তাকে হত্যা করেছে এবং তারা মক্কা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ঠিক এমন সময় দূরে ওসমানকে আসতে দেখে সবাই শান্ত হল।

এইভাবে কয়েকবার দূত মাধ্যমে কথাবার্তা চলার পর কোরেশরা দশ বছরের এক সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সুহাইল নামক এক ধূর্ত ব্যক্তিকে দূত হিসাবে পাঠাল। ওমর ও সুহাইলের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলার পর দুপক্ষ একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হল। নবী তখন আলিকে বললেন সন্ধির শর্তগুলো লিখে ফেলতে। আলি লিখলেন, ''বিসমিল্লা রহমানিররহিম'' বা পরম করুণাময় আল্লার নামে শুরু করছি। কিন্তু সুহাইল তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল যে, এর বদলে '' বিসমিক্ আল্লাহুম্মা'' বা হে আল্লা, তোমার নামে শুরু

করছি লিখতে হবে। আলি কোন কথা না বলে তাই লিখল। এর পর মহম্মদের নাম লেখার সময় আলি লিখলেন "মহম্মদুর রসুলুল্লা" বা আল্লার রসল মহম্মদ। কিন্তু সুহাইল আপত্তি জানিয়ে "মহম্মদ বিন আবদুল্লা" বা আবদুল্লার ছেলে মহম্মদ লিখতে বলল। কিন্তু আলি ইতিমধ্যে "মহম্মদুর রসুলুল্লা" লিখে ফেলেছেন এবং তাই তা কাটতে অস্বীকার করলেন। নবী তখন কোথায় কথাটা লেখা আছে আলিকে তা দেখাতে বললেন এবং নিজে কলম দিয়ে সেই জায়গাটা কেটে দিলেন। এ ঘটনা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে নবী নিরক্ষর ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত যে সন্ধিপত্র লেখা হল, তা হল -

"হে আল্লা, তোমার নামে শুরু করছি। নিম্নোক্ত শান্তিচুক্তি আবদুল্লার পুত্র মহম্মদ ও আমরের পুত্র সুহাইলের দ্বারা গৃহীত হল। (১) আগামী দশ বছর কোন পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। (২) মক্কার যে কোন ব্যক্তি মহম্মদের পক্ষে যেতে চাইলে বা তাঁর সঙ্গে কোন চুক্তি করতে চাইলে তার সেই অধিকারে বাধা দেওয়া হবে না। (৩) মহম্মদের পক্ষের কোন ব্যক্তি কোরেশদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে তার সেই স্বাধীনতা থাকবে। (৪) অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কেউ মহম্মদের পক্ষে যোগ দিলে মহম্মদ তাকে তার অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেবে, পক্ষান্তরে মহম্মদের পক্ষ থেকে কেউ চলে এলে তাকে ফেরত দিতে কোরেশরা বাধ্য থাকবে না। (৫) মহম্মদকে এ বছর তীর্থ পালন না করেই ফেরত যেতে হবে এবং আগামী বছর সে তার লোকজন সহ মক্কায় তিনদিন অবস্থান করে তীর্থ পালন করতে পারবে। (৬) উক্ত তীর্থ যাত্রাকালে মুসলমানরা একজন তীর্থযাত্রী যেটুকু অস্ত্র বহন করে থাকে, তার চেয়ে বেশী কোন অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না। চুক্তিপত্রে সাক্ষী হিসাবে সই করলেন আবু বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইত্যাদি মোট ৮ জন।

মক্কায় ঢুকতে না পারার জন্য মহম্মদ ও তাঁর দলবল ঐ হুদাইবিয়াতেই তীর্থের রীতি নিয়ম পালন করলেন। উট কোরবানী করলেন এবং চুল কামিয়ে (অনেকে শুধু কেটে) তীর্থ যাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। কথিত আছে যে, এই সময় এক প্রবল হাওয়া এসে তাদের চুল কাবার পবিত্র এলাকায় নিয়ে যায়। এর পর আরও প্রায় দশদিন হুদাইবিয়ায় কাটিয়ে নবী দলবল সহ মদিনা যাত্রা করলেন।

ইসলামী ইতিহাসে উপরিউক্ত চুক্তি "হুদাইবিয়ার চুক্তি" নামে খ্যাত। প্রথম প্রথম নবীর অনেক নিকট পার্শ্বচর হুদাইবিয়ার চুক্তিকে মুসলমানদের পক্ষে অপমানজনক বলে সাব্যস্ত করল। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নবী একে মুসলমানদের পক্ষে এক বিশাল বিজয় বলে বর্ণনা করলেন। অনতিবিলম্বে আল্লা নবীর

মতকেই সমর্থন করলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়, দান করেছি এই জন্য যে তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন ও তোমাকে সরল পথে চালিত করবেন। এবং বলিষ্ঠ সাহায্য দান করবেন"(৪৮/১-৩)। এই চুক্তির পর থেকে কারও পক্ষে মদিনায় যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আর বাধা থাকল না। এই চুক্তির ফলেই মুসলমানদের পক্ষে অন্যান্য গোত্রের লোকদের ইসলামের প্রতি অনুরক্ত করার সুযোগ উপস্থিত হল। মক্কা ও মদিনার মধ্যে যাতায়াতে আর কোন-বাধা নিষেধ না থাকায় মক্কার লোকদের মদিনায় গিয়ে আশ্রয় পাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল। মক্কার খোজা গোত্রের লোকেরা অনেক আগে থেকেই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার সাথে সাথে তারা সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করল। এইভাবে মুসলমানের সংখ্যা খুব দ্রুত হারে বাড়তে থাকল এবং পরবর্তী দু বছরের মধ্যে তা দ্বিগুণের বেশি হল। হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় মাত্র ১৫০০ মানুষ মহম্মদের সঙ্গী হয়েছিল, কিন্তু এই চুক্তির ফলেই দু বছর পরে মক্কা অভিযানের সময় ১০,০০০ লোক তাঁর সঙ্গী হতে পেরেছিল। এইভাবেই আল্লার প্রতিশ্রুতি "ফতেহান মুবীন" বা প্রকাশ্য বিজয় কার্যকর হল।

খয়বর অভিযান

হুদাইবিয়া থেকে ফেরার কয়েক মাস বাদেই (আগস্ট, ৬২৮ খৃঃ) নবী ১০০ ঘোড়সওয়ার সহ ১৬০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে খয়বর অভিযানে বের হলেন। এবারও বিবি উম্মে সালামা তাঁর সঙ্গী হলেন। মদিনা থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে, সীরিয়া যাবার পথের উপরে খয়বর-এর অবস্থান। অনেক আগে থেকে এখানে ইহুদী বসতি ছিল এবং আগেই বলা হয়েছে যে নজির গোষ্ঠীর ইহুদীরা মদিনা থেকে বিতাড়িত হবার পর তাদের অনেকেই খয়বরে আশ্রয় নেয়। মুসলমান বাহিনী অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে এত কম সময়ের মধ্যে খয়বরে পৌঁছালো যে সেখানকার ইহুদীরা নিজেদের রক্ষা করার বা বন্ধুস্থানীয় অন্য কোন লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে বলার সময় পেল না।

মনুষ্য বসতি হিসাবে খয়বর হল কতগুলি বিচ্ছিন্ন গ্রাম ও তার মাঝে মাঝে দুর্গবাড়ীর সামাবেশ। দুর্গগুলির নির্মাণকার্য বাইরে থেকে সাদামাটা কিন্তু শক্ত পোক্তা ও দুর্ভেদ্য। গ্রামগুলিতে শোভা পায় নিবিড় খেজুরগাছের ঝাড় ও ভুট্টার খেত। মুসলমানরা যখন খয়বরে পৌঁছালো তখন ভোর হয় হয়। খয়বরের লোকেরা চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিল। এই অবস্থায়

মুসলমান বাহিনী তাদের আক্রমণ করল এবং অরক্ষিত দুর্গগুলি একের পর এক দখল করতে থাকল। তারপর মহম্মদ তাঁর বাহিনীসহ সর্বাপেক্ষা বড় দুর্গ আল কামুস-এর দিকে অগ্রসর হলেন। ইহুদীদের দলপতি কিনানা ঐ দুর্গ বাড়িতে বাস করতেন। কয়েক মাস আগে নবী বিশ্বাসঘাতকতা করে যে ইহুদী দলপতিকে হত্যা করিয়েছিলেন, কিনানা ছিলেন সেই নিহত দলপতি আবু রাফে-এর নাতি। আবু রাফের মৃত্যুর পর কিনানা দলপতি নির্বাচিত হন। মহম্মদ সেইদিন আর আল কামুস আক্রমণ করলেন না এবং পরের দিন এক সর্বাত্মক আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন।

পরদিন ভোর-বেলা নবী আলিকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁর হাতে ইসলামের কালো নিশান তুলে দিলেন। আলি সকলের আগে নিশান হাতে এগিয়ে চলেছেন আর পিছনে চলেছে মুসলমান বাহিনী। এর আগে মুসলমান বাহিনী এত বড় নিশান নিয়ে কোন অভিযান করেনি। কথিত আছে যে বিবি আয়েশার ব্যবহৃত আঙরাখা কেটে ওকাব বা 'কালো ঈগল' নামে খ্যাত ঐ নিশান তৈরি করা হয়েছিল। এমন সময় ইহুদীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে মুসলমানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, "সারা খয়বর জানে যে আমার নাম মারহাব।" প্রথম যে মুসলমান তার সামনে এগিয়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সে রণে ভঙ্গ দিল। এর পর এগিয়ে গেলেন আলি এবং তরোয়ালের এক কোপে তার মাথা দু ফাঁক করে ফেললেন। মারহাবের অবস্থা দেখে ছুটে এল তার ভাই এবং যুবায়ের তরোয়ালের এক আঘাতে তার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন। এর পর মুসলমান বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ করে এগিয়ে গেল। খয়বরের এই যুদ্ধে আলি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং কথিত আছে যে ঢাল হারিয়ে তিনি একটা দরজার চৌকাঠকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় হল। ইহুদীদের পক্ষে ৯৩ জন মারা পড়ল এবং মুসলমানদের পক্ষে মারা গেল মাত্র ১৯ জন।

এই পরাজয়ের পর ইহুদীদের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না এবং আল কামুস দুর্গ হস্তান্তর করার আগে এই ঠিক হল যে দুর্গবাসী সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে, তবে তাদের সমস্ত সম্পত্তি তারা মুসলমানদের দিয়ে দেবে। দুর্গ থেকে সকলের সঙ্গে কিনানাও তার ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এল। মহম্মদ তখন কিনানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, সে তার সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়নি। বিশেষ করে স্ত্রী সফিয়াকে বিবাহ করার সময় যে সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী যৌতুক হিসাবে

পেয়েছিল, তার একটা বড় অংশ সে কোথায় গোপন করে রেখেছে। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, কুরাইজাদের গণহত্যার সময় সফিয়ার বাবাকেও হত্যা করা হয়। "কোথায় সেসব সোনার থালা বাসন, যা তুমি মক্কার লোকদের ধার দিতে?" নবী কিনানাকে জিজ্ঞাসা করলে কিনানা বলল যে, সে রকম কোন জিনিস তার ছিল না। রেগে গিয়ে নবী বললেন, "যদি জানতে পারি যে তুমি লুকোচ্ছ তবে তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের জীবন বিপন্ন হবে।"

উপরিউক্ত সংবাদের মধ্যে সত্য ছিল এবং একজন বিশ্বাসঘাতক ইহুদী আকার-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল কোথায় তা লুকানো আছে। নবীর লোক যখন তা খুঁজে বার করে আনল তখন কিনানার উপর শুরু হল অকথ্য অত্যাচার। চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের উপর জ্বলন্ত আগুন রাখা হল। কথিত আছে যে, আলি যে চৌকাঠটা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, সেটাকেই জ্বালিয়ে তার বুকের উপর রাখা হয়। এর পর নবীর আদেশে কিনানা ও তার ভাইপোর মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলা হল। ইতিমধ্যে হাবসী বিলাল দুর্গের ভিতর থেকে ১৭ বছর বয়সী সফিয়া ও তার এক সহচরীকে বাইরে নিয়ে এল। ইচ্ছে করেই বিলাল যেখানে কিনানা ও সফিয়ার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ পড়ে আছে সেই পথ দিয়ে সফিয়াকে নবীর কাছে নিয়ে এল। নবী নিজের গায়ের অঙরাখা খুলে সফিয়ার গায়ে জড়িয়ে দিলেন—অর্থাৎ বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে সে নবীর একান্ত সম্পত্তি।[১৮] বিলালের হাতে নবী সফিয়ার দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

বেশীর ভাগ মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে সেই দিনই নবী সফিয়াকে বিবাহ করেন এবং খুব সম্ভবত স্তূপীকৃত মৃতদেহ সমন্বিত সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শুভকার্য সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে নবী তাঁর নিকট অনুচরদের এক ভোজে আপ্যায়িত করলেন। অতিথিদের প্রচুর পরিমাণে খেজুর, মাখন ও দই পরিবেশন করা হল। ইতিমধ্যে সফিয়াকে কনের সাজে সাজিয়ে সেখানে নিয়ে আসা হল। নবী সফিয়াকে পত্নী রূপে না সাধারণ রক্ষিতা রূপে গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে তাঁর অনুচরদের মধ্যে একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে সফিয়াকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে নবী তাকে পত্নী হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এর পর নবী মাটিতে আলগা হয়ে বসে তাঁর একটা উরু বাড়িয়ে ধরলেন যাতে সফিয়া সে উরুতে পা রেখে উটের পিঠে উঠতে পারে। কিছুটা ইতঃস্তত করার পর সফিয়া

(১৮) আরবে এই রীতি চালু ছিল যে, কেউ মারা গেলে তার বিধবা পত্নীর গায়ে যে তার জামা ছুড়ে মারতে পারবে, ঐ মহিলার উপর তার অধিকার জন্মাবে।

নবীর উরুতে পা রেখে উটের পিঠে চাপল নবীও সেই একই উটে, সফিয়ার সামনে বসলেন। যেই তাঁবুতে বাসরঘরের ব্যবস্থা হয়েছে উট সেখানে যেয়ে থামল। ভোরবেলা তাঁবুর আশেপাশে পায়ের শব্দ পেয়ে নবী একটু অবাক হলেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখেন তাঁর এক অনুচর আবু আইয়ুব খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে। নবী কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবু আইয়ুব জানালো যে সে সারারাত তাঁবু পাহারা দিয়েছে। সে আশঙ্কা করেছিল যে সফিয়া হয়তো নবীকে আক্রমণ করতে পারে। জনাব এম অবদুর রহমান তাঁর "নবীদের জীবন সঙ্গিনী" গ্রন্থে এক জায়গায় লিখছেন, "পরে বৃদ্ধ বয়সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে হজরতকে আরও কয়েকটি শাদী (বিবাহ) করতে হয়েছিল" (পৃঃ ৪১)। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনাবলী বাধ্য হবার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না।

যে ইহুদী যোদ্ধা মারহাব আলির সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তার বোন জয়নব ইতিমধ্যে নবী ও তাঁর নিকট অনুচরদের আপ্যায়ন জানাল। একটা ছাগলের বাচ্চা মেরে তার কচি মাংস সে অত্যন্ত সুস্বাদু করে রান্না করল এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে তা পরিবেশন করল। নবী অল্প একটু খেয়েই বুঝতে পারলেন যে তাতে বিশ মেশানো আছে এবং সবাইকে তা খেতে নিষেধ করলেন। নবীর পাশেই বসেছিল বিশর, সে বেশ খানিকটা খেয়ে ফেলল। ক্রমে তার-হাত পা শিথিল হয়ে গেল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এই ঘটনার পর জয়নবকে কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মতে তাকে তখনই মেরে ফেলা হয়। অন্য মতে তাকে বিশর'এর আত্মীয় স্বজনের হাতে তুলে দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের মনোমত উপায়ে তাকে হত্যা করতে পারে। অন্য আরেক মতে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় কারণ বিষ মিশাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল যে, মহম্মদ সত্যি সত্যিই একজন নবী কি না তা পরীক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। সত্যিকারের নবী হলে সে বুঝতে পারবে যে খাবারে বিষ দেওয়া আছে, অন্যথায় মারা যাবে।

আল কামুস জয় করার পর মুসলমানরা আর যে কয়েকটা দুর্গ বাকী ছিল সেগুলোকেও নিজেদের অধিকারে নিয়ে এলো। ইহুদীদের খয়বরে বাস করার অনুমতি দেওয়া হল এবং উৎপন্ন খেজুর ও অন্যান্য শস্যের অর্ধেক খাজনা হিসাবে ধার্য হল। ফেরার পথে তারা আরও একটা ইহুদী বসতি ওয়াদি আল কোরা অধিকার করল এবং সেখানেও ৫০ শতাংশ কর ধার্য করে প্রভুত্ব স্থাপন করা হল। এই ভাবে মদিনার উত্তরে অবস্থিত সমস্ত ইহুদীদের উপরই নবীর কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। খয়বর জয় করে মুসলমানরা এক বিশাল

গনিমতের মালের অধিকারী হল। উট ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু, খেজুর, বার্লি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও এক বিশাল ধনসম্পত্তি, গয়নাগাঁটি গনিমতের মাল হিসাবে তাদের অধিকারে এল। নবী পবিত্র খুম হিসাবে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করার পর বাকী অংশ ১৮০০ ভাগে ভাগ করে বন্টন করা হল। একজন পদাতিক যা পেল, একজন অশ্বারোহী পেল তার তিনগুণ। যে সব জায়গা-জমি যুদ্ধ না করেই অধিকারে এল, নবী তার অর্ধেকের মালিক হলেন। প্রতি বছর একজন প্রতিনিধি পাঠানো হত এবং সে খাজনা আদায় করে মদিনায় নিয়ে আসতো। এই ব্যবস্থা ওমর খলিফা হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকল।

নবী তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলে যান যে, সমস্ত আরবে একটাই ধর্ম থাকবে আর তা হল ইসলাম। ওমর খলিফা হবার পর নবীর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে ইহুদীদের খয়বর থেকেও উৎখাৎ করেন। কথিত আছে যে তিনি জমির মূল্যের অর্ধেক তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়েছিলেন।

খয়বর অভিযানের সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখ করার যোগ্য। আল আসোয়াদ নামে এক ইহুদী রাখাল বালক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। এর কিছুক্ষণ বাদে সেইদিনই সে শত্রুপক্ষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক পাথরের আঘাতে মারা যায়। ফলে সে একবার নামাজ করারও সুযোগ পায় না। কিন্তু নবী বললেন যে, যেহেতু সে জিহাদ করে মারা গেছে, নিশ্চয়ই তার জন্য স্বর্গের সর্বোচ্চ পুরস্কার রক্ষিত থাকবে। মৃতদেহকে ঘিরে সবাই নবীর জন্য অপেক্ষা করছিল। নবী এসে তার জন্য প্রার্থনা করার জন্য সবাইকে ঠেলে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ যেমন করে লোকে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি করে তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। সবাই তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "স্বর্গ থেকে দু জন কালো নয়না হুরী এসে এখন তাকে সেবাযত্ন ও আদর করছে।" এর দ্বারা নবী সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে মুসলমানদের পক্ষে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র কাজ। নামাজ রোজা জিহাদকারীর পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় নয়।

খয়বর থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই নবী চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের দ্বারা নবীর পত্নীর সংখ্যা হল ৯ জন। এছাড়া তাঁর হারেমে থাকল দুজন দাসীপত্নী। কথিত আছে যে, মদিনার কয়েকজন ইহুদী রমণী মহম্মদকে জাদু করে। সন্দেহ করা হয় যে হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পরই এই ঘটনা ঘটে। মহিলারা লাবিদ নামে এক ওঝার সাহায্য নেয় এবং সে গোপনে নবীর চিরুণী থেকে নবীর চুল যোগাড় করে একটা খেজুরপাতায় তা জড়িয়ে ১১টা গিঁট মারে। তারপর চুলশুদ্ধ খেজুরপাতা একটা

কুয়োর জলে ডুবিয়ে রাখে। ফলে নবীর ক্ষুধা কমে যায় এবং আরও নানান উপসর্গ দেখা দেয়। পরে নবী জিব্রাইলের কাছ থেকে এই চক্রান্তের কথা জানতে পারেন। তখন কুয়ো থেকে সেই খেজুরপাতা তুলে চুলের গিঁট খুলে দেওয়া হয়। ফলে যাদু নষ্ট হয়ে যায় এবং নবী সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে আল্লা আয়াৎ অবতীর্ণ করে বলেন, "......... ঐ সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদু করে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে" "(১১৩/৪-৫)। কোন কোন জীবনীকারের মতে জাদুকর লাবিদকে হত্যা করা হয়।

মক্কায় ওমরা পালন

এদিকে বছর ঘুরে এল। হুদাইবিয়ার চুক্তি অনুযায়ী তীর্থযাত্রার দিন আসন্ন হল। প্রায় ২০০০ জনের বাহিনী মক্কা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। চুক্তি অনুযায়ী যে টুকু অস্ত্র সঙ্গে নেওয়া সম্ভব, সকলে তাই সঙ্গে নিল। কিন্তু কোরেশরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণ করতে পারে, তাই অস্ত্রের এক বিশাল গুপ্ত ভাণ্ডার পিছনে চলল। কাব হত্যাকারী মহম্মদ ১০০ জনের অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে সকলের আগে থাকল। কোরবানীর জন্য নেওয়া হল ৬০টি উট। মক্কার নিকটবর্তী আজ জাহরান নামক স্থানে পৌছে সেখানে অস্ত্রভাণ্ডার ২০০ জন রক্ষীর দায়িত্বে রাখা হল এবং বাদবাকী সকলে কাবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

অপর দিকে মক্কার কোরেশরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যে তিন দিন মহম্মদ মক্কায় থাকবেন সেই তিন দিন তারা মক্কা ছেড়ে চলে যাবে এবং নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে গিয়ে কাটাবে। কাজেই নবী যখন মক্কায় পৌছুলেন তখন তা এক জনমানবহীন নির্জন পুরীর চেহারা নিয়েছে। যাই হোক, নবী কাবায় পৌছে আল কাসোয়া থেকে নামলেন, লাঠির সাহায্যে হাজরে আসোয়াদকে প্রতীকী চুম্বন করলেন এবং তাওয়াফ করলেন। ইতিমধ্যে যোহরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল এবং বিলাল আজান দিলে সবাই একত্রিত হল। নবী সেই নামাজের ইমামতি করলেন। দীর্ঘ ৭ বছর বাদে নবী ও মুহাজীররা মক্কায় আসতে পেরে খুবই খুশি হল। নবী কোন বাড়ীতে উঠলেন না, সকলের সঙ্গে তাঁবুতে থাকলেন।

ইতিমধ্যে নবীর কাছে বিবি মাইমুনার বিবাহের সম্বন্ধ এল। বিধবা মাইমুনার বয়স তখন ২৬ বছর এবং তিনি ছিলেন নবীর চাচা আব্বাসের শালী এবং বিধবা হবার পর থেকে তিনি আব্বাসের আশ্রয়েই ছিলেন। মাইমুনার বোন

সালমা ছিলেন নবীর আর এক চাচা বীর হামজার স্ত্রী। কিন্তু তিনি হামজার সঙ্গে মদিনায় হিজরৎ না করে মক্কাতেই থেকে গিয়েছিলেন। বিবি মাইমুনাকে নবী মুহরীম অবস্থাতেই বিবাহ করলেন। ইতিমধ্যে নির্ধারিত তিনদিন শেষ হয়ে গেছে। নবী আর একদিনের জন্য কোরেশদের কাছে আবেদন পাঠালেন, কিন্তু তা মঞ্জুর হল না। নবী মক্কাবাসীদের ভোজ খাওয়াবার (অবশ্যই তার বিবাহ উপলক্ষে) লোভ দেখালেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। কোরেশরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ মক্কা ত্যাগ করার আদেশ দিল। তাই পরদিন ভোরবেলা নবী ও তাঁর দলবল মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করল। সালমা ও তাঁর মেয়ে উমারাও নবীর সঙ্গে মদিনায় চলল। জাফর, আলি ও যায়েদ সালমার পাণি প্রার্থী ছিল, কিন্তু নবী তাকে জাফরের হাতে অর্পণ করলেন।

মুতা অভিযান

সপ্তম হিজরীর জিলকজ মাসে (৬২৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে) মহম্মদ মক্কা থেকে ওমরা করে ফিরলেন। এর মাসখানেক পরে মহম্মদ ৫০ জনের একটি দলকে বনি সালেম গোষ্ঠীর কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা। কিন্তু ফল হল উল্টো। দলের সবাই নিহত হল এবং একজন কোন মতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এল। এর কিছুদিন বাদে মহম্মদ পনের জনের একটি দলকে সীরিয়ার সীমান্তে ঝাত আৎলা নামক স্থানে পাঠালেন। উদ্দেশ্য একই, ওখানকার লোকদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা। দলটি সেখানে পৌছালে সেখানে এক বিশাল জমায়েত দেখতে পেল। যখন তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাল, তারা তীর দিয়ে তার জবাব দিল। মুসলমানরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সবাই মারা পড়ল, একজন কোন মতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল এবং ঘটনার বর্ণনা দিল। সব শুনে নবী তাদের শায়েস্তা করার জন্য একটা বড় দল পাঠাবার কথা চিন্তা করলেন। খবর পেয়ে সেখানকার লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাল এবং নবীও বাহিনী পাঠাবার পরিকল্পনা আপতত স্থগিত রাখলেন।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটল। মহম্মদ তার একজন লোককে বসরার ঘাসানিদ রাজার কাছে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। নবীর দূত যখন মুতা (বা মাব) নামক স্থানে পৌছায় তখন সেখানকার স্থানীয় নেতা শুরাবিল তাকে হত্যা করে। এই খবর শোনামাত্র মহম্মদ ৩০০০ লোকের এক বিশাল বাহিণী মুতায় পাঠাতে মনস্থ করেন। যায়েদ (পালিত পুত্র)-কে অভিযানে নেতা নির্বাচিত করে তার হাতে নিশান তুলে দিলেন। নবী যায়েদকে বললেন যে, প্রথমে তাদের

কাছে ইসলাম গ্রহণ করার আবেদন রাখতে হবে এবং সেই আবেদন না শুনলে তরবারি হাতে নিতে হবে। নবী আরও নির্দেশ দিলেন যে, যায়েদ মারা পড়লে জাফর (আলির ভাই) নেতৃত্ব দেবে এবং জাফর মারা পড়লে আবদুল্লা বিন রউয়াহা নেতৃত্ব দেবে।

ইতিমধ্যে শুরাবিলের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে বিশাল এক মুসলমান বাহিনী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। সে নিকটবর্তী সমস্ত লোকজনকে জড়ো করে মুসলমান বাহিনীর তুলনায় এক বিশাল বাহিনী তৈরি করে ফেলল। মান নামক জায়গায় পৌঁছে যায়েদ ঐ বিশাল শত্রুবাহিনীর সংবাদ পেল এবং আরও খবর পেল যে শুরাবিলের বাহিনী মুতার নিকটবর্তী মাব নামক স্থানে শিবির ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত হবে এই নিয়ে যায়েদ সকলের সঙ্গে এক জরুরী আলোচনায় বসলেন। মুসলমান বাহিনী এসেছিল একজন দলনেতা শুরাবিলকে মামুলি সাজা দিতে, এক বিশাল প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে নয়। যাই হোক, সামনে আগ্রসর হবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। মরুসাগরের দক্ষিণতীরে বেলকা নামক স্থানে পৌঁছে সামনের বিশাল সীরিয়ান বাহিনী মুসলমানদের দৃষ্টি-গোচর হল এবং ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে তারা মুতা নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করল। পরদিন সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হল এবং যায়েদ, জাফর ও আবদুল্লা একে একে সবাই মারা পড়ল। অবশিষ্ট দলটি কোনমতে মদিনা পৌঁছালো।

উপরিউক্ত মুতা অভিযানে নবী তাঁর অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয়পাত্র যায়েদ ও জাফরকে হারিয়ে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। উপরন্তু মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে উত্তর আরবের বিভিন্ন বেদুইন গোষ্ঠীগুলির কাছে নবীর সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। পক্ষান্তরে এই মুতা অভিযানের মধ্য দিয়েই মুসলমানরা সর্বপ্রথম আরবের বাইরের কোন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় এবং মুতা অভিযানে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে তারা সীরিয়া সহ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ জয় করতে শুরু করে।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার চুক্তি কার্যকর হয়েছে তা ইতিমধ্যে দু বছর হয়ে গেছে। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যা বেড়েছে তা দিয়ে নবীর স্বপ্ন মক্কা অভিযান করা চলতে পারে। তাই এখন শুধু একটা অজুহাতের অপেক্ষা কারণ তেমন কোন অজুহাত না পেলে হুদাইবিয়ার চুক্তি অগ্রাহ্য করে মক্কা অভিযান করা সঙ্গত

হবে না। অচিরেই আল্লা নবীর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন, বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই অজুহাত উপস্থিত করলেন।

মক্কার খোজা ও বকর গোষ্ঠীর মধ্যেকার শত্রুতা ও রেষারেষি প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছিল। এই কারণে বকর গোষ্ঠী যখন কোরেশদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল তখন খোজা তার উল্টোটা, মহম্মদের প্রতি আনুগত্য দেখাল। এবং হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে সুযোগ পেয়ে খোজারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে রাতারাতি মুসলমান হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মুতা অভিযানে মুসলমানদের বিপর্যয় হবার ফলে মক্কা সহ আরবের ইসলাম বিরোধীরা একটু বেশীরকম উৎসাহিত হয়ে পড়ল। এই সময় কোরেশদের প্রচ্ছন্ন মদতে বকর গোত্রের লোকেরা একদিন রাতের বেলা খোজাদের উপর চড়াও হল এবং তাদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করল। সঙ্গে সঙ্গে খোজাদের ৪০ জনের একটা দল দ্রুতগতিতে উটে চড়ে মদিনায় এসে উপস্থিত হল এবং নবীর কাছে প্রতিবিধান দাবি করল। এদিকে খোজারা নবীর কাছে দূত পাঠিয়েছে জানতে পেরে কোরেশদের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হল এবং আবু সুফিয়ানকে দূত হিসাবে মদিনায় পাঠাল মধ্যস্থতা করে শান্তি স্থাপন করার জন্য। কোরেশরা ভেবেছিল যে, যেহেতু মহম্মদ ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে পরিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, (আবু সুফিয়ানের বিধবা কন্যা উম্মে হাবিবাকে নবী বিবাহ করেছেন) তাই সে অবশ্যই কৃতকার্য হয়ে ফিরবে। কিন্তু খোজাদের সঙ্গে কথা বলার পরই নবী মক্কা আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তাই আবু সুফিয়ানকে প্রায় খালি হাতেই ফিরতে হল। নবী তাঁর মনোভাব আব সুফিয়ানের কাছে গোপন রাখলেন।

আবু সুফিয়ান মদিনা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আশেপাশের সমস্ত বন্ধুভাবাপন্ন বেদুইন গোষ্ঠীগুলির কাছে খবর পাঠানো হল তৎক্ষণাৎ লোকজন নিয়ে মদিনায় আসার জন্য। আর তিনি মদিনার মুহাজীর ও আনসারদের প্রস্তুত হবার হুকুম জারী করলেন। খুব সম্ভবত ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, ৮০০০ লোকের বিশাল বাহিনী মদিনা ত্যাগ করল। পথে মুজাইনা ও সালেম গোত্রের ২০০০ জন এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এসে যোগ দেওয়ায় মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ হাজারে পৌঁছালো। বাহিনীর নেতা হিসাবে যুবায়ের সকলের আগে চললেন। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে মহম্মদের বাহিনী শিবির স্থাপন করল। রাত্রিবেলা নবী সবাইকে পাহাড়ের উপর উঠে আগুন জ্বালতে বললেন, যাতে আগুন দেখে মক্কাবাসীরা তাদের আসন্ন বিপদ অনুমান করতে পারে। বিরোধিতা করে কোন লাভ হবে না সেটাও ভালভাবে বুঝতে পারে।

এদিকে মদিনা থেকে কোন গোপন সংবাদ না আসায় মক্কায় চলছে একটা চরম উদ্বিগ্ন মনোভাব। তাই বিকালের দিকে আবু সুফিয়ান হাকিম (খাদিজার ভাগ্নে) এবং খোজাদের দলপতি বুদেইলকে সঙ্গে করে মদিনার রাস্তায় এগিয়ে পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করতে বেরিয়েছে। এমন সময় তারা পাহাড়ের মাথায় ১০ হাজার আগুন দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে গেল। এদিকে মহম্মদের চাচা আব্বাসও একটা গাধার পিঠে চেপে একটু এগিয়ে দেখতে গেছেন। পথে তাঁর সঙ্গে আবু সুফিয়ানের দেখা হয়ে গেল। আব্বাস তাকে বললেন, "এখনও সময় আছে। আমার গাধার পিছনে চড়ে বসো এবং মহম্মদের কাছে চল। তা না হলে তোমার ধড়ে মুণ্ড থাকবে না।" আবু সুফিয়ান বাক্য ব্যয় না করে তাঁর পিছনে চড়ে বসল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে নবীর তাঁবুতে উপস্থিত হল। নবী সেই রাত্রিটা আবু সুফিয়ানকে আব্বাসের তাঁবুতে কাটাতে বললেন।

সকালবেলা আব্বাস তাকে নবীর তাবুতে নিয়ে গেল। নবী তাকে বললেন, "এখনও কি তোমার বিশ্বাস জন্মায়নি যে আল্লা ভিন্ন উপাস্য নেই! এখনও কি তুমি বিশ্বাস কর না যে আমি আল্লার রসুল!" আবু সুফিয়ান কিন্তু কিন্তু করতে থাকল। তখন আব্বাশ তাকে বললেন, "আর কোন কিন্তু নেই। ইসলাম কবুল কর; অন্যথায় তোমার গর্দানের বিপদ ঘটবে।" আর কোন উপায় না দেখে আবু সুফিয়ান লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা কলেমা উচ্চারণ করে তখনই ইসলাম কবুল করল। আর নবী দেখলেন তাঁর আজন্ম ও জঘন্য শত্রু আজ তাঁর দ্বীন গ্রহণ করে তাঁর করুণা ভিক্ষা করছে। নবী আবু সুফিয়ানকে আদেশ দিলেন যে এক্ষুণি মক্কায় ফিরে যাও এবং মক্কার লোকদের সংবাদ দাও যে, মহম্মদের বাহিনী মক্কায় পৌছে গিয়েছে। আজ দরজা বন্ধ করে যে ঘরে অবস্থান করবে বা আবু সুফিয়ানের ঘরে অবস্থান করবে বা কাবার পবিত্র এলাকায় অবস্থান করবে তার কোন বিপদ হবে না। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ মক্কায় চলে গেল এবং তারস্বরে চীৎকার করে নবীর আদেশ পালন করতে লাগল। তার ঘোষণা শুনে মক্কাবাসীদের মধ্যে এক হুলুস্থুলু, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। সবাই যার য়ার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে অবস্থান করতে থাকল। এইভাবে আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের জন্যই বিনা রক্তপাতে মহম্মদের পক্ষে মক্কা নগরী অধিকার করার পথ সুগম হল।

এদিকে মহম্মদের বাহিনী ধীরে ধীরে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। শহরের উপকণ্ঠে পৌছেও প্রতিরোধের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তবুও অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে নবী তাঁর বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে তিন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার আদেশ দিলেন। যুবায়ের-এর নেতৃত্বে একটি দল পূর্বদিক থেকে, খালিদের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি দক্ষিণ দিকদিয়ে এবং সাদ ইবন

আব্দ-এর নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি পশ্চিমদিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। সকলের উপরই কঠোর আদেশ থাকল প্রাণরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত রক্তপাত না করার। নবী নিজে মুহাজীর ও আনসারদের সঙ্গে করে জেবেল হিন্দ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। একমাত্র খালেদের বাহিনী ছাড়া আনর কোন বাহিনীকেই কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল না। তাঁর নেতৃত্বে বেদুইনদের বাহিনী মক্কার যে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল সেখানে ছিল নবীর সর্বাপেক্ষা তিক্ত শত্রুদের বাস। সাফোয়ান, সুহাইল ও আবু জাহলের ছেলে ইক্রামার নেতৃত্বে কিছু লোকের একটা দল প্রতিরোধের সৃষ্টি করল এবং মুসলমান বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে শুরু করল। খালেদ তখন নবীর কঠোর আদেশ ভুলে গিয়ে বেদুইনদের আদেশ দিল আক্রমণ করতে। সঙ্গে সঙ্গে নেতারা পালিয়ে গেল, তাদের বাহিনীর ২৮ জন নিহত হল। খালেদের পক্ষে মারা গেল মাত্র দুজন। দূর থেকে খালেদের বাহিনীকে আক্রমণ করতে দেখে নবী প্রথমে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু খালেদ গিয়ে তাঁকে প্রকৃত বিবরণ দিলে তিনি শান্ত হলেন এবং বললেন, "আল্লার আদেশই শ্রেষ্ঠ।"

জেবেল হিন্দ-এর যে পথ ধরে নবী অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই পথে কিছু দূরেই পড়ে মক্কার বিখ্যাত কবরখানা জান্নাত আল মালা এবং সেখানেই শায়িত আছেন চাচা আবু তালেব এবং প্রথমা স্ত্রী খাদিজা। সেই জান্নাত আল মালার নিকটস্থ প্রান্তরে নবী তাঁর তাঁবু খাটাতে আদেশ করলেন। আজ তাঁর মনে পরম তৃপ্তি। যে নগরী তাঁকে একদিন অপমানিত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত করেছে, আজ তিনি সেই নগরীর সর্বময় কর্তা। এই সব ভাবতে ভাবতে তাঁবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তার পরই আবার আল কাসোয়ায় চড়ে বসলেন, চললেন পবিত্র কাবার দিকে। লাঠির সাহায্যে হাজরে আসোয়াদ- কে চুম্বন করলেন। সাতবার তাওয়াফ করলেন। মনে করলেন আল্লার বাণী, 'অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় ওদের ওপর পরাক্রান্ত করলাম, তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম"(১৭/৬)। স্মরণ করলেন কাবার অভ্যন্তরে এখনও ৩৬০ রকমের দেবতার মূর্তি বিদ্যমান। স্মরণ করলেন আল্লার সাবধান বাণী, "আল্লার সাথে অন্য কোন, উপাস্য স্থির করো না। করলে নিন্দিত ও নিঃশহায় হয়ে পড়বে"(১৭/২২)। ভাবতে ভাবতে একটু বসলেন এবং বিলালকে বললেন তালহার ছেলে ওসমানকে খবর দাও কাবাগৃহের চাবি নিয়ে আসার জন্য। ওসমান চাবি নিয়ে এলে কাবাগৃহের তালা খুলে দরজার কড়া ধরে দাঁড়ালেন, ডাকলেন, "ওসমান বিন তালহা, এই নাও কাবার চাবি। বংশ পরম্পরায় এই

চাবি এখন থেকে তোমাদের কাছেই থাকবে। আজ থেকে তোমার বংশের লোকেরাই হবে কাবাগৃহের রক্ষক।" তারপর চাচা আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, "এখন থেকে আপনার বংশের লোকেরাই বংশ পরম্পরায় তীর্থ-যাত্রীদের জমজমের জল পান করাবে।"

তারপর কাবাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে সাজানো ৩৬০টি দেবমূর্তির সবগুলি ভেঙে নষ্ট করলেন। কাবার দেয়ালে ইব্রাহীম ও বিভিন্ন ফেরেস্তার যেসব চিত্র আঁকা ছিল সেগুলো মুছে পরিষ্কার করলেন। তারপর বিলালকে বললেন কাবার ছাদে উঠে আজান দিতে। নামাজ শেষ হলে জোরে চীৎকার করতে পারে এমন একজন লোককে ডেকে সারা মক্কা নগরীতে ঘোষণা করে দিতে বললেন, "যারা এক আল্লা ও তাঁর বিচারের দিনে বিশ্বাসী তারা যেন তাদের ঘরের সকল দেবমূর্তি বিনষ্ট করে ফেলে।" আরেকটা দলকে নির্দেশ দিলেন মক্কার চতুর্দিকে পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ যে সব স্তম্ভগুলি রয়েছে সেগুলোকে মেরামত করতে। মক্কার বিভিন্ন দূরত্বে এই স্তম্ভগুলি অবস্থিত । জেদ্দার দিকে তা মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে আবার আল ওমরার দিকে মাত্র ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এদিকে মদিনার লোকদের মনে সন্দেহ বা ভয়ের ভাব দেখা দিল। তারা ভাবল যে, নবী যখন তার পৈতৃক শহর ফিরে পেয়েছেন তাই তিনি হয়তো আর মদিনায় ফিরবেন না। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে নবী তাদের কাছে ডেকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মদিনাতেই থাকবেন।

নবী দশ থেকে বার জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, বাকী সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। সেইদিন রাত্রে খোজা গোত্রের লোকেরা পুরানো শত্রুতার সূত্র ধরে একজনকে হত্যা করল। পরদিন কাবায় জোহরের নামাজের পর উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবী একটা ভাষণ দিলেন। বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লা যে দিন স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন সেই দিনই তিনি মক্কাকে পবিত্র করেছেন। কাজেই সকলকেই এই স্থানের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। ......ওহে বনি খোজারা, তোমরা তোমাদের হাত রক্তপাত থেকে মুক্ত কর। কাল তোমরা যে নরহত্যা করেছ আমি তার ক্ষতি পূরণ করে দিচ্ছি। কিন্তু এর পরে তোমরা কাউকে হত্যা করলে তার রক্তপণ তোমাদেরকেই শোধ করতে হবে।" এর পর নবী তাঁর বিভিন্ন অনুচরকে মূর্তি ভাঙার জন্য বিভিন্ন দিকে পাঠালেন। খালেদ নাখলায় গিয়ে সেখানকার আল উজ্জার মূর্তি ভাঙল; আমর হুজেল সম্প্রদায়ের দেবতা সুয়ার মূর্তি ভাঙল ইত্যাদি। ইতিমধ্যে হুনাইনের বিদ্রোহের খবর পৌঁছালো। তাই আর মদিনায় ফেরা হল না। দলবল নিয়ে নবী হুনাইণে চললেন।

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কার অদূরে তায়েফ নগরী থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে বহু শাখা—প্রশাখায় বিভক্ত বিখ্যাত হওয়াজিন গোত্রের বাস। এদের সঙ্গে মক্কার কোরেশদের খুবই মৈত্রী সম্বন্ধ ছিল এবং এই কারণেই হিজরতের আগে নবী যখন তায়েফে আশ্রয় চেয়েছিলেন তখন তারা তাঁকে আশ্রয় দেয়নি। নবীর মক্কা অধিকারের পর তারা সঙ্গত কারণেই প্রমাদ গুণল এবং বুঝতে পারল এর পরেই আসবে তাদের পালা। নবী ও তাঁর দলবল এসে তাদের স্বাধীন মূর্তি পূজার ধর্মে বাধার সৃষ্টি করবে এবং ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে। তাই তারা তৎক্ষণাৎ দূরদূরান্তের সকল উপজাতির কাছে খবর পাঠালো এবং একত্র সমবেত হতে অনুরোধ জানাল। এই ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্ত উপজাতির লোকেরা বিশাল সংখ্যায় তায়েফের দক্ষিণ-পূর্বে আউতাস উপত্যাকায় জড়ো হতে শুরু করল।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র নবী তাঁর মক্কার অবস্থান হ্রাস করে সবাইকে তায়েফের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। মদিনা যাত্রা করার প্রায় পনেরো দিন পরে মুসলমান বাহিনী তায়েফের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করল। আগের ১০০০০-এর সাথে এবার মক্কার ২০০০ যোগ হল এবং এই ১২০০০ লোকের বাহিনী তায়েফের রাস্তা ধরল। তিন কি চার দিন পরে বাহিনী হুনাইন প্রান্তরে উপস্থিত হল। এদিকে হাওয়াজিনরা দলপতি মালেকের নেতৃত্বে আউতাসে সমবেত হল। বাহিনীকে মানসিক দিক থেকে সতেজ রাখার জন্য নারী ও শিশুর দলও বাহিনীর সঙ্গে আউতাসে উপনীত হল। নারী ও শিশুদের সঙ্গে নিতে বৃদ্ধ দলপতি দরিদ নিষেধ করেছিল, কিন্তু মালেক তা উপেক্ষা করল। বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ দলপতির পরামর্শকে নবীন ৩০ বছরের যুবক মালেক উপেক্ষা করে কি ভুল করেছিল তা পরে দেখা যাবে।

রাত্রি বেলা মুসলমান বাহিনীর হুনাইন পৌছানোর খবর পেয়ে মালেক তার সৈনসমাবেশ ঘটাল এবং হুনাইন উপত্যকার সংকীর্ণ প্রবেশ পথে সৈন্য সমাবেশ করল। খুব ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে থাকতেই, মুসলীম বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করল। সালেম গোত্রের খালেদ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সবার আগে চলছিল এবং নবী একটু পিছনের দিকে ছিলেন। বাহিনী উপত্যকার সংকীর্ণ প্রবেশপথে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে মালেকের বাহিনী প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমান বাহিনীর সামনের দিককার সৈন্য-সারি এই হঠাৎ আক্রমণ রোধ করতে পারল না, দলে দলে মারা পড়তে লাগল। এই বিপর্যয়ে নবীর বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল। নবী দেখলেন তাঁর সামনে

দিয়ে সৈন্যরা পালাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "কোথায় পালাচ্ছ? আমি রসুলুল্লা বলছি, ফিরে এসো।" কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না। ইতিমধ্যে নবীর চাচা আব্বাসও সৈন্যদের ফেরাবার জন্য তাদের ডাকছিলেন এবং মদিনার লোকেরা আব্বাসের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে সমবেত হল। ফলে যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। মদিনার লোকদের সাথে পলায়নরত বেদুইরাও এসে যোগ দিল এবং প্রবল বেগে তারা শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার হাওয়াজিনরা পালাতে শুরু করল এবং মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে এগিয়ে গেল। ফলে তাদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হল এবং অনেক মারা গেল, যদিও নারী ও শিশুকে আঘাত করা নবীর বারণ ছিল। এই নারী ও শিশুর দল সহ ৬০০০ হাওয়াজিন বন্দী হল এবং গনিমত হিসাবে পাওয়া গেল ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ভেড়া এবং ৪০০০ আউন্স রূপা। মহম্মদ বুঝতে পারলেন যে তাদের পরিবারের লোকজনদের মুক্ত করার জন্য হাওয়াজিনরা অবশ্যই তাঁর কাছে আসবে। তাই তিনি সমস্ত বন্দী সহ তাঁর বাহিনীকে নিকটবর্তী ও অধিকতর সুরক্ষিত জিরানা উপত্যকায় সরিয়ে নিয়ে শিবির স্থাপন করলেন।

যাই হোক, হুনাইনের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরই জয় হল কিন্তু তাদের পক্ষের অনেকেই মারা পড়ল। মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় তারা আল্লার উপর ভরসা করার বদলে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর বেশী ভরসা করেছিল এবং গর্ব করেছিল, তাই তাদের উপর উপরিউক্ত বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তাই আল্লা কোরানের আয়াৎ অবতীর্ণ করে বললেন, "নিশ্চয় আল্লা তোমাদের বহুস্থলে এবং হুনায়েন দিবসে সাহায্য করেছেন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে "(৯/২৫)। "অনন্তর আল্লা স্বীয় রসুলের প্রতি ও বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন এবং এমন এক সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেছিলেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি দান করেছিলেন। এবং ইহা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রতিফল (৯/২৬)।

হাওয়াজিনদের পিছু ধাওয়া করে কিছু সৈন্য নাখলা ও তায়েফ পর্যন্ত গিয়েছিল। তারা সবাই ফিরে এলে নবী তাঁর বাহিনীকে এগিয়ে গিয়ে তায়েফ অবরোধ করার হুকুম দিলেন। তায়েফ অবরোধ করলে হাওয়াজিনরা নগরের দেয়ালের অপর দিক থেকে তীরবৃষ্টি করতে থাকল। ফলে আবু বকরের এক ছেলে সহ অনেক মারা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিবির তুলে তীরের পাল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। বাহিনী তায়েফ অবরোধ করে বসে থাকল, কিন্তু পরিণাম

কি হবে বোঝা গেল না। নগরের ভিতরে খাদ্য ও জলের প্রচুর সরবরাহ থাকায় হাওয়াজিনদের দিক থেকে আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। উপরন্তু তাদের তীরবৃষ্টির জন্য মুসলমানদের পক্ষেও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। মক্কার দক্ষিণে, প্রায় দুদিনের দূরত্বে দৌস গোত্রের লোকদের বাস ছিল এবং তাদের নেতা তোফাইল খয়বর অভিযানের সময় নবীকে সাহায্য করেছিল বলে তাঁর পরিচিত ছিল এবং তোফাইল ও নবীর অনুরক্ত ছিল। এই দৌসরা কচ্ছপের খোলের আকারে একপ্রকার যান বানাতে জানতো যা তীরবৃষ্টির মধ্যেও অগ্রসর হতে সক্ষম ছিল। এই সময় নবী তাদের সাহায্য চাইলে তোফাইল সেই বিশেষ যান সহ তার গোষ্ঠীর লোকজনকে ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু তারা যখন সেই যানে করে নগর প্রাচীরের কাছে গেল তখন হাওয়াজিনরা তার উপর লাল করে গরম করা লোহার বল ছুঁড়ে মারতে লাগল। ফলে সেই যানগুলোতে আগুন ধরে অকেজো হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে নবী তাদের খেজুর বাগান ও আঙুর খেত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। এতে কাজ হল, অর্ধেক আঙুরখেত জ্বালিয়ে, দেবার পর শত্রুপক্ষের তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল এবং নবী আগুন দেওয়া বন্ধ করতে বললেন। এর মধ্যে নবী আর একটা চাল চাললেন। ঘোষণা করে দিলেন যে নগরের কোন ক্রীতদাস যদি বাইরে এসে তাঁর বাহিনীতে যোগ দেয় তবে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এতেও কাজ হল। প্রায় ২০ জন দাস পালিয়ে এসে মুসলমান বাহিনীতে যোগ দিল।

এদিকে অবরোধের প্রায় ১৫ দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু পরিস্থিতির কোন হেরফের হল না। এদিকে জিরানায় যে সব গনিমতের মাল পড়ে রয়েছে তার ভাগ পাবার জন্য লোকজনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকল। ইতিমধ্যে নবী এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, কেউ তাঁকে একপাত্র মাখন দিয়েছে এবং একটা মোরগ তাতে ঠোকর মারছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে আবু বকর বললেন যে, এবার নবীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। নবীও তাই মেনে নিলেন এবং অবরোধ তুলে নিয়ে জিরানায় চলে এলেন। নবী যখন জিরানায় ফিরছেন তখন ভীড়ের মধ্য থেকে এক বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে বলল, "আমাকে নবীর কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর এক সৎ বোন।" নবীর কাছে নিয়ে এলে তিনি তাকে চিনতে পারলেন। তার নাম ছিল শেইমা। ছোটবেলায় নবী যখন হালিমার কাছে ছিলেন তখন সে তাঁর খেলার সাথী ছিল। নবী তাকে যথোপযুক্ত উপহার দিয়ে বিদায় জানালেন।

নবী ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয় জয় করার জন্য নারী-শিশু নির্বিশেষে সমস্ত হাওয়াজিন বন্দীদের

মুক্ত করে দেবেন। মক্কা ও মদিনার মুসলমানরা এতে রাজী হলেও নব্য ধর্মান্তরিত বেদুইনরা এতে আপত্তি জানালো। এভাবে তাদের গনিমতের মাল হাতছাড়া হয়ে যাবে তা তারা মেনে নিতে পারল না। একজন বন্দীর বিনিময়ে তারা ৬ খানা করে উট পাবে—এ প্রস্তাব দিলে তারা রাজী হল। এই সময় নবীর সামনে তিন জন সুন্দরী নারী বন্দীকে আনা হল। নবী তাদের আলি, ওসমান ও ওমরকে দান করলেন। ওমর সেই দাসীকে নিজে না নিয়ে ছেলে আবদুল্লাকে দান করে দিলেন। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir লিখছেন, "...... it throws a curious light on the domestic history of Mohammad, that he should have presented such gifts as slave girls to the father of one of his wives, and the husbands of two of his own daughters" (op. Cit. p-421)। যাই হোক, জিরানার গনিমতের ভাণ্ডার ছিল বিশাল, এবং নবীও অত্যন্ত দরাজ হাতে তা তাঁর অনুচর ও সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন। সর্বোচ্চ নেতারা প্রত্যেকে ১০০টা করে উঠ পেল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আবু সুফিয়ান, তাঁর দুই ছেলে ইয়াজিদ ও মুয়াইয়া এবং হাকিম, হিজাম, সাফোয়ান, সুহাইল ইত্যাদি। এর পরবর্তী স্তরের নেতারা পেলেন ৫০টা করে উট। এই সময় নবী এতটাই দরাজ হস্ত ছিলেন যে, যে কেউ তাঁর প্রাপ্য সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেই তার প্রাপ্য দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য সামান্য পদাতিক সৈন্যও অন্তত ৪টা উট ও ৪০টা ছাগল অথবা ভেড়া পেয়েছিল। যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তাদের তিনি একটু বেশি বেশি দিলেন এবং বললেন যে তাদের হৃদয় জয় করা বেশি জরুরী কারণ তা না হলে তারা হয়তো আবার আগুনে (পৌত্তলিক ধর্মে) ফিরে যাবে।

হাওয়াজিন দলপতি মালেকের কাছে তিনি খবর পাঠালেন যে, যদি সে ইসলাম কবুল করে তবে তার সম্পত্তি, পরিবারের লোকজন সব ফেরত দেওয়া হবে এবং উপরন্তু তাকেও ১০০ উট উপহার দেওয়া হবে। মালেক সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করে নবীর গুণগ্রাহী হয়ে পড়ল। নবী প্রায় ২৫ দিন জিরানায় অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি মক্কায় ফিরে ওমরা পালন করলেন এবং সেই রাত্রেই জিরানা হয়ে মদিনা যাবার সোজা রাস্তা ধরলেন। অব্দ বংশের আত্তাবকে তিনি দৈনিক এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বেতনে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান এবং ইসলামী রীতিনীতির ব্যাপারে দক্ষ মোয়াজ বিন জেবেলকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়ে যান। সম্ভবত ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে নবী মদিনায় ফিরে আসেন।

মক্কা নগরী ছিল (বর্তমানেও আছে) সমস্ত আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় (তথা

বাণিজ্যিক) কেন্দ্র। সমস্ত আরবের লোক বাৎসরিক হজ পালন করতে মক্কায় আসতে বাধ্য ছিল। এছাড়া কোন্ মাসকে মল মাস হিসাবে বাদ দেওয়া হবে এবং ফলে কোন্ কোন্ মাস পবিত্র হবে, তা মক্কার কোরেশরাই স্থির করে দিত। যেহেতু পবিত্র মাসগুলোতে আরবের সর্বত্র রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল, তাই এ বিষয়েও আরবের সমস্ত মানুষ মক্কা তথা মক্কার কোরেশদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই নবীর মক্কা বিজয়ের ফলে প্রকারান্তরে সমস্ত আরবের উপর তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আরবের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে মক্কার কোন দলপতিই সমগ্র আরব ভূখণ্ডের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হননি। সুতরাং মক্কা জয়ের ফলে সারা আরবে নবীর যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল তা আগেকার দিনেও কোন দলপতির পক্ষে স্বপ্নের অতীত ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মক্কার হজ ক্রিয়াকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে নবী হয়ে গেলেন সারা আরব ভূমির ধর্মীয় নেতা।

তাবুক অভিযান

আরবে যে সময় ইসলামের অভ্যুদয় হল তার প্রায় ৩০০ বছর আগে থেকে সীরিয়া, এশিয়া মাইনর ও মিশর অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের পাঞ্জা কষার জায়গা। একবার তা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের দখলে আসে আবার কিছুদিন পরেই তা পারস্য সাম্রাজ্যের দখলে চলে যায়। ক্রমাগত সৈন্যবাহিনীর যাতায়াত, যুদ্ধ, লুঠপাট, গণহত্যা যেন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। সেটা হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এক বিধ্বংসী যুগ। পারস্যের কাছে জরাথুস্টের ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং বাইজানটাইনের কাছে খ্রীস্টধর্ম শ্রেষ্ঠ। এই ধর্মীয় রেষারেষি, হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে ঐ অঞ্চলে নিয়তই অশান্তি বিরাজ করত।

যেই বছর মহম্মদ নবীত্ব লাভ করলেন (৬১০ খ্রীঃ), সেই বছরই Heraclius বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন এবং সেই বছরেই পারস্য সম্রাট Chosroes-II, সীরিয়া ও এশিয়া মাইনর অধিকার করে পারসীক সাম্রাজ্য এ্যান্টিওক, জেরুজালেম ও দামাস্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। এর পর ৬১৯ খ্রীস্টাব্দে মিশর পারস্য সম্রাটের অধীনে চলে গেল। যে বছর নবী মহম্মদ মদিনায় পরিখার যুদ্ধ করলেন, সেই বছরই Heraclius প্রতি আক্রমণ চালিয়ে পারসীক বাহিনীকে নিনেভ পর্যন্ত হটিয়ে দিয়ে সীরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য পুনরাধিকার করেন। Heraclius যখন সীরিয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত তখন দূত মারফত মহম্মদের পত্র তার হাতে পৌঁছালো, যেই পত্রে নবী তাকে ইসলামের আবির্ভাবের সংবাদ অবগত করতে চেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আরবে মহম্মদের শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে সম্রাট Heraclius শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং পূর্বেকার মুতা অভিযানের মত মুসলমান বাহিনী আবার সীরিয়া সীমান্ত আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কা করে ঐ অঞ্চলের উপজাতীয় সর্দারদের একত্র করে সীমান্ত সুরক্ষার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এই সংবাদ অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়ে মদিনায় পৌছাল এবং নবী এক বিশাল বাহিনীর সাহায্যে সেই সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধ করবেন স্থির করলেন। এই উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনার দলপতি ও বিভিন্ন বেদুইন দলপতিদের অবিলম্বে মদিনায় সমবেত হবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সেই সময়ের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সীরিয়া সীমান্তের মত দূরবর্তী অঞ্চলের অভিযানে যোগ দিতে অনেকেই অনিচ্ছা প্রকাশ করল। অনেকে আবার না যাবার সপক্ষে অজুহাত খাড়া করতে থাকল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অনুগত অনুচরদের প্রচেষ্টায় বাহিনী প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়ে গেল। অভিযানের খরচ-খরচার জন্য নবী সবাইকে টাকা- পয়সা দান করার আহ্বান জানালে সকলেই মুক্তহস্তে দান করল। ওসমান সর্বোচ্চ ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা এবং আবু বকর প্রায় তাঁর সমুদায় সম্পত্তিই দান করলেন। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে ১০০০০ অশ্বারোহী বাহিনী সহ ৩০০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদিনা ত্যাগ করল। নবী মহম্মদ বিন মাসলামার উপর মদিনার দায়িত্ব ও আলির উপর তাঁর পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের মদিনাতেই রেখে গেলেন।

সীরিয়ার সীমানায় অবস্থিত তাবুক উপত্যকায় পৌছে সেখানকার মনোরম পরিবেশ নবীর খুব ভাল লাগল। শীতল গাছের ছায়া ও নিকটবর্তী ঝরনার প্রচুর জল দেখে নবী সেখানেই শিবির স্থাপন করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বাইজানটাইন বাহিনীর যে আক্রমণের খবর শুনে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেই আক্রমণের নামগন্ধও তিনি কোথাও দেখতে পেলেন না। যাই হোক, নবী তাবুক উপত্যকায় প্রায় ২০ দিন অবস্থান করলেন। ঐ সময়ের মধ্যে অয়লা নগরীর খ্রীস্টানদের সঙ্গে এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করলেন। ঐ চুক্তি অনুসারে অয়লার বাসিন্দারা বছরে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা কর দিতে স্বীকার করে নবীর বশ্যতা মেনে নিল। ইতিমধ্যে নবী খালেদকে ৪২০ জন অশ্বারোহী সহ নিকটবর্তী জুমা শহরে পাঠিয়েছিলেন। সামান্য সংঘর্ষ হল এবং তাতে সেখানকার খ্রীস্টান দলপতি ওকিদিরের ভাই নিহত হল। খালেদ সেখান থেকে ২০০০ উট, ৮০০ ভেড়া এবং ৪০০ বর্ম গনিমত হিসাবে নিয়ে এল এবং সঙ্গে বন্দী করে আনল দলপতি ওকিদিরকে। ওকিদিরকে শেষ পর্যন্ত মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

নবী মদিনায় ফিরে এলে যারা অভিযানে সঙ্গী হয়নি তারা তাঁর কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকল। তখন আল্লা তাদের উদ্দেশ করে বললেন, "হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমাদের কি হয়েছে, যখন তোমাদের আল্লার পথে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর। তবে কি তোমরা পরলোক অপেক্ষা ইহলোককে মনোনীত করেছ? কিন্তু পরলোকের তুলনায় ইহলোকের জীবনের ভোগ সম্পদ কিঞ্চিৎকর ব্যতীত নয়। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাপদ শাস্তি দিবেন। এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, এবং তোমরা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৯/৩৮,৩৯)। "তোমরা হাল্কা ও গুরুতর (রণ) ক্ষেত্রে বের হও এবং তোমাদের ধনপ্রাণ দ্বারা আল্লার পথে যুদ্ধ কর; এই'ই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝে থাক"(৯/৪১)। "এবং যদি তারা বের হতে ইচ্ছা করত তবে তারা তার জন্য প্রস্তুতি নিত, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের যাত্রাতে বীতশ্রদ্ধ; সুতরাং তিনিই ওদের বিরত রাখেন, এবং তাদের বলা হয় যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক"(৯/৪৬)।

মরুবাসী বেদুইনরা তাদের চঞ্চলমতি ও দৃঢ়বিশ্বাসের অভাবের জন্য বেশির ভাগই অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছিল। সেই সব নব্য ও প্রায়-অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ করে আল্লা বললেন, "ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে বলেই ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ হয়েছে" (৯/৫৪)। "যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে আসবে তখন ওরা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে। তুমি বলো-অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদের কখনই বিশ্বাস করবো না। .... যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে আসবে তারা তখন আল্লার শপথ করবে যেন তোমরা ওদের উপেক্ষা না কর; সুতরাং তোমরা ওদের উপক্ষো করবে; ওরা ঘৃণ্য, ওদের কৃতকর্মের জন্য জাহান্নম ওদের বাসস্থান। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তুষ্ট হলেও অসৎ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্ তুষ্ট হবে না। অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসিগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা অনুধাবনে তারা অযোগ্য, এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়" (৯/৯৪-৯৭)।

তায়েফে লাত—এর মূর্তি ধ্বংস

ইতিমধ্যে প্রায় দশমাস পার হয়ে গেছে নবী তায়েফের অবরোধ তুলে চলে

এসেছেন। কিন্তু তখনও তিনি খবর পেলেন যে তায়েফের লোকেরা আগের মতই মূর্তিপূজা চালিয়ে যাচ্ছে। আবু সুফিয়ানের জামাতা উরউয়া, যিনি হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় কোরেশদের দূত হয়েছিলেন, তায়েফ নগরীর একজন দলপতি ছিলেন। নবী যখন তায়েফ অবরোধ করেন তখন উরউয়া একটা বিশেষ কাজে ইয়েমেনে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে উরউয়া দেখেন যে, একমাত্র তায়েফ ছাড়া, মক্কা সহ ঐ অঞ্চলের সব লোক নবীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর দেরী না করে উরউয়া মদিনায় গিয়ে নবীর সঙ্গে দেখা করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। দূরদর্শী নবী তাকে তখনই তায়েফে ফিরে যেতে বারণ করলেন কারণ তায়েফের লোকেদের পৌত্তলিক ধর্মের গোঁড়ামী লক্ষ্য করে তিনি বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু উরউয়া নবীর পরামর্শ উপেক্ষা করে তখনই তায়েফে রওনা হল, ভাবল তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে কেউ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম ঘটল।

প্রায় সন্ধ্যাবেলা উরউয়া তায়েফে পৌছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের কথাও সবাইকে জানিয়ে দিলেন। অতি উৎসাহী উরউয়া ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ছাদের উপর থেকে তারস্বরে ফজরের নামাজের আজান দিতে শুরু করলেন, ভাবলেন এতে হয়তো তায়েফবাসীদের মন গলবে এবং প্রার্থনায় যোগ দেবে। কিন্তু মানুষের বদলে এল একটা তীর যার আঘাতে তাঁর তখনই মৃত্যু হল। উরউয়ার মৃত্যুর ফলে তায়েফের লোকেরা তাদের পৌত্তলিকতার ধর্ম চালিয়ে যেতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কিন্তু আগের মত শান্তিতে তারা তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে পারল না। আগেই বলা হয়েছে যে হাওয়াজিনদের আর এক প্রভাবশালী দলপতি মালেক হুনাইন যুদ্ধের পর নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। সেই ধর্মান্তরিত মালেক বর্তমানে তায়েফবাসীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে নানাভাবে তাদের ক্ষতিসাধন করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য হল এইভাবে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা। মালেকের লোকেরা তাদের চারণভূমিতে হামলা চালিয়ে উট, ভেড়া ইত্যাদি কেটে ফেলতে থাকল। কোন তায়েফবাসীকে সুযোগ মত পেলে তার উপর অত্যাচার করা হতে থাকল। ক্রমে অবস্থা এমন চরম অবস্থায় পৌছালো যে, তায়েফের প্রাচীরের বাইরে কোন তায়েফবাসীর প্রাণ সুরক্ষিত থাকল না। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তারা ৬ জন দলপতি সহ ২৬ জনের একটি দলকে মদিনায় নবীর কাছে পাঠাতে বাধ্য হল।

নবীর তাবুক অভিযান থেকে ফেরার দিন পনেরো বাদে তারা মদিনায় পৌছালো। ঐ দলে শহীদ উরউয়ার ভাইপো আল মঘিরাও ছিল। কিছুদিন

মদিনায় থাকার ফলে তারা ইসলামকে আরও ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারল এবং শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে স্থির করল। শুধু তাই নয়, তায়েফের বিখ্যাত ও বিশাল আকৃতির আল লাত'এর দেবমূর্তি ভেঙে ফেলতেও রাজী হল। নবী মঘিরার উপর লাতের মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব দিয়ে দলটিকে তায়েফে ফেরত পাঠালেন। আবু সুফিয়ানকেও তাদের সাথে পাঠালেন সব কাজের তদারকি করতে। তায়েফে পৌঁছে মঘিরা শাবল, কোদাল ও গাঁইতির সাহায্যে আল লাতের মূর্তি ভাঙতে শুরু করল। আশেপাশের লোকজন, বিশেষ করে মেয়েরা, জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় অনেকেই ভীত হয়ে পড়ল। মঘিরা এ সবের প্রতি কর্ণপাত না করে মূর্তি ভেঙ্গে তা মাটিতে মিশিয়ে দিল। এইভাবে আরবের মাটি থেকে মূর্তিপূজার এক বিশেষ চিহ্ন এবং ইসলামের সর্বপ্রধান প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এর আগে অন্যান্য স্থানে যেসব মূর্তি ভাঙা হয়েছে, তা সেখানকার লেকেরাই ভেঙেছে। কিন্তু তায়েফের মূর্তি ভাঙার বিশেষত্ব হল মদিনা থেকে লোক পাঠিয়ে তা ভাঙতে হয়েছে।

বিদায় হজ

হিজরীর ৯ম বছরের রমজান মাসের প্রথম দিকে (৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর) মহম্মদ তাবুক অভিযান থেকে মদিনায় ফিরলেন। মাঝে মাত্র দু মাস শওয়াল ও জিলকজ। তারপরই শুরু হবে হজের মাস জিলহজ। মনে মনে নবী স্থির করলেন যে, যে পর্যন্ত মক্কার পবিত্র কাবায় অপবিত্র পৌত্তলিকরা হজ করতে থাকবে, তিনি ততদিন আর হজ করতে যাবেন না। তাই সেই বছর (মার্চ,৬৩১ খ্রীঃ) আবু বকরের নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি দলকে মক্কায় হজ করতে পাঠালেন। আবু বকর সহ যাত্রীদের দল মদিনা ত্যাগ করার অল্প পরেই আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, "মহান হজের দিন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে—আল্লার সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁর রসুলের সাথেও না। তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো- তোমরা আল্লাকে হীনবল করতে পারবে না এবং অবিশ্বাসকারীদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। অতএব তোমরা চার মাস ভ্রমণ কর এবং জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাকে হীনবল করতে পারবে না, এবং আল্লা অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের

বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে নাই, তাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। আল্লাহ্ সংযতগণকে পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ বিগত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে। তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। যদি অংশীবাদীদের কেহ তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লার বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, কারণ তারা অজ্ঞলোক (৯/২-৬)। "তারাই তো আল্লার মসজিদের সংরক্ষণ করবে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকেই ভয় করে না। অতএব তারাই সুপথগামীদের নিকটবর্তী। অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের সত্য প্রত্যাখ্যান স্বীকার করে তখন তারা আল্লার মসজিদের সংরক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। তাদের কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থ হবে এবং তারা নরকে অবস্থান করবে। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারিগণ! অংশীবাদীরা অপবিত্র ব্যতীত নহে। অতএব এই বছরের পরে তারা পবিত্র মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না এবং যদি তোমরা অভাবের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের ধনশালী করে দিবেন" (৯/১৭,১৮,২৮)।

উক্ত আদেশপত্র নবী আলির হাতে দিয়ে তাঁকে শীঘ্র মক্কা যাত্রা করতে বললেন; এবং আলি দ্রুত যেয়ে মক্কা পৌঁছবার আগেই আবু বকরের তীর্থ-যাত্রীদলকে ধরে ফেললেন। পবিত্র কোরবাণীর দিনে হাজীরা যখন জুমরায় শয়তানের উদ্দেশে পাথর ছুঁড়ছিল, সেই ভীড়ের মধ্যে আলি তারস্বরে সেই ঘোষণাপত্র সবাইকে পাঠ করে শোনালেন। আলি তারপর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন যে, নবী আর চারমাসের সময় দিয়েছেন। সেই চারমাস পরে উক্ত ঘোষণাপত্র কার্যকর হবে এবং নবী তখন কারও সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবেন না (অর্থাৎ নবী আরও চারমাস সময় মক্কাবাসীদের দিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের জীবন বিপন্ন হবে)। এই ঘোষণা হাজীদের মারফত অচিরেই সমস্ত আরবে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে সমস্ত আরব উপদ্বীপের যে সমস্ত অধিবাসী কাবাকে মান্য করত তাদের মধ্যে থেকে পৌত্তলিকতা উঠে গেল এবং ইসলাম আরবের একমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

পরের বছর জিলহজ মাসে নবী হজ পালন করতে মক্কা যাত্রা করলেন। পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী "হজ" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

অসুস্থতা এবং মৃত্যু

ইতিমধ্যে হিজরতের দশবছর পার হয়ে এগারো বছর শুরু হয়েছে। আরব উপদ্বীপের বেশীরভাগ অঞ্চলেই নবীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হযেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জাতি উপজাতিগুলো তাদের উপরে ধার্য বাৎসরিক জাকাত মেনে নিয়েছে। তবে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নবীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না। দূরবর্তী অঞ্চগুলিতে সামান্য কতৃত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে, নবী দূত মারফত কোন গোষ্ঠীর আনুগত্য দাবি করলে তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তা মেনে নিচ্ছে। বিরোধিতা করতে সাহস পাচ্ছে না। এই সময় নবীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল দূর দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন দলপতিদের আপ্যায়ন করা, সন্ধির শর্তাবলী নথিভুক্ত করা এবং এইভাবে সমস্ত আরবে তাঁর একাধিপত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু মুতা-র বিপর্যয়ের গ্লানি তিনি কিছুতেই ভূলতে পারছেন না, ভুলতে পারছেন না তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও অনুগত যায়েদের মৃত্যু।

তাই বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার প্রায় মাস দুয়েক পরে তিনি আবার সীরিয়া সীমান্তে অভিযান পাঠাবেন স্থির করলেন। ঐসব অঞ্চলের উপজাতিগুলোর মনে ত্রাসের সঞ্চার না করতে পারা পর্যন্ত তিনি কোনমতেই মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি মৃত যায়েদের ছেলে ওসামাকে এই অভিযানের সেনাপতি নির্বাচিত করবেন ঠিক করলেন। তাই তিনি ওসামাকে মসজিদে ডেকে বললেন, "যেখানে তোমার বাবা হত হয়েছে তুমি সেইখানে যাও, তোমার লোকজনের সাহায্যে সেখানে সব ধ্বংস কর। শোন, আমি তোমাকে সেনাপতি নির্বাচিত করেছি। তাদের খবর পাবার আগে দ্রুত তুমি মুতার সংলগ্ন উবনা গ্রামে পৌঁছে যাও এবং আগুনের সাহায্যে তাদের গ্রাস কর। খুব ভোরবেলা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লা যদি তোমাকে বিজয় দেন, তবে বেশিদিন সেখানে থেকো না। পথ প্রদর্শক, গুপ্তচর ও সংবাদবাহক সঙ্গে নিয়ে রওনা হও"। নবী যখন ওসামাকে এই গুরুদায়িত্ব দিলেন তখন তার বয়স কুড়ি পেরোয়নি।

যেদিন ওসামার সঙ্গে উপরিউক্ত কথাবার্তা বললেন তার পরের দিন বুধবার নবী জ্বর ও প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। মদিনার উপকণ্ঠে জুরফ্ নামক স্থানে, যেখানে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে, সেখানে বাহিনী পরিদর্শন ও শেষ উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি দিতে গেলেন। বাহিনীর নিশান ওসামার হাতে দিয়ে বললেন, "আল্লার নামে এই পতাকার নিচে আল্লার জন্য যুদ্ধ কর। আল্লাতে

যারা অবিশ্বাস করে তাদের পরাজিত করে হত্যা কর।" আবু বকর ও ওসমান বাদে আর সবাইকেই তিনি বাহিনীতে সামিল হতে বললেন। এই প্রসঙ্গে নবীর প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা উচিত। আবু বকর ও ওসমান বাদে ঐ বাহিনীতে আলি, যুবায়ের, আব্বাস ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় সকলেই ছিলেন এবং এই সব অভিজ্ঞ যোদ্ধারা ওসামার মত একজন নাবালকের নেতৃত্ব মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। পরে অবশ্য কোন কোন ব্যক্তি তাদের উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু নবীর হস্তক্ষেপে তা তখনই মিটে যায়।

এর আগে নবীর তেমন কোন কঠিন অসুখ হয় নি। হিজরীর ৬ষ্ঠ বছরে সামান্য ক্ষুধামান্দ্য হয়েছিল যার কথা আগেই বলা হয়েছে এবং ইহুদীদের দ্বারা যাদু করা চুলের গিঁট খুলে দিতে তা চলে যায়। বর্তমান অসুস্থতার ব্যাপারে নবীর ধারণা জন্মায় যে খয়বর অভিযানকালে যে বিষ মেশানো মাংস খেয়েছিলেন সে বিষক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এ অনুমান সত্য কি মিথ্যা তার কোন প্রমাণ কোথাও নেই। তবে নবুয়ৎ প্রাপ্তির পর থেকে শুরু করে বিগত কুড়ি বছর ধরে তাঁর শরীর ও মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তা কল্পনার বাইরে। মক্কার অবজ্ঞা, অত্যাচার তারপর মদিনায় হিজরৎ, যুদ্ধ, অভিযান এমন কি বর্তমানে তাঁর সাম্রাজ্যের ক্রমাগত বিস্তারের ফলেও কাজের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া কোরানের বাণী অবতীর্ণ হবার সময়ও তাঁর শরীর ও মনের উপর যে চাপ পড়ত তাও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির একটা অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন। একদিন আবু বকর নবীকে বলেন, "রুসুলুল্লা, আপনার চুল মনে হচ্ছে অতি দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে।" জবাবে নবী বললেন, "হ্যাঁ, আল্লার প্রত্যাদেশই আমার এই হাল করেছে।" নবী যেমন বয়সের ভারে কোনদিন কাবু হয়ে যাননি, তেমনি জরা যে তাঁকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে তাও অবজ্ঞা করেননি। যখন অনেক দূর দূর থেকে দলপতিরা এসে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল তখন তিনি ১১০ নম্বর সুরা, "যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লার দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতি পালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা কর, নিশ্চয় তিনি অধিকতর ক্ষমাশীল"—পাঠ করে বলতেন যে তাঁর পার্থিব কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এখন তাঁর যে কাজ বাকী আছে তা হল আল্লার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করা।

কথিত আছে যে, উপরিউক্ত সুরা অবতীর্ণ হলে তিনি কন্যা ফতেমাকে ডেকে বলেন, "ফতেমা, আমার জাগতিক জীবন যে সমাপ্তির পথে সে খবর

এসে গেছে।" নবীর কথা শুনে ফতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কেন কাঁদছ ফতেমা, এটা নিশ্চয় জেনো যে, পৃথিবী থেকে যে মানুষ সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে পরকালে গিয়ে দেখা করবে সে তুমি ভিন্ন আর কেউ নয়।" বাস্তবিক পক্ষে নবী মারা যাবার ছয়মাসের মধ্যেই ফতেমা দেহত্যাগ করেন। নবী না কি ফতেমাকে বলতেন যে, যীশুর মা মরিয়মের পরে তিনিই স্বর্গের রানী হবেন।

যাই হোক, এবার নবীর অসুখ ক্রমাগত বাড়তে থাকল এবং তাঁর অসুস্থতার জন্য তাবুক অভিযানও আপাতত স্থগিত রাখা হল। একদিন রাত্রে অসুস্থ শরীর নিয়েই সকলের অজ্ঞাতসারে মদিনার কবরখানায় চলে গেলেন, অনেক সময় সেখানে কাটালেন এবং মৃতদের কল্যাণের কামনায় প্রার্থনা করলেন। ইতিমধ্যে তাঁকে খুঁজতে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হল এবং নবী তাকে বললেন যে তাঁরও কবরে যাবার দিন আসন্ন হয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, আল্লা তাঁকে এই পার্থিব জীবন এবং স্বর্গে যেয়ে আল্লার সান্নিধ্য লাভ, এই দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে বলেন এবং তিনি দ্বিতীয়টাই পছন্দ করেন।

এদিকে মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে থাকল এবং সেই যন্ত্রণা নিয়েও তিনি আগের মতই পালাক্রমে এক এক করে সব বিবির ঘরেই রাত্রি অতিবাহিত করতে থাকলেন। সেদিন বিবি মাইমুনার পালা ছিল এবং নবী তাঁর ঘরে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন সমস্ত বিবিদের সেখানে ডেকে নবী বললেন, "তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি খুবই অসুস্থ এবং আমার পক্ষে পালা করে তোমাদের সকলের সঙ্গে অবস্থান করা সম্ভব নয়। যদি তোমরা খুশি মনে সম্মতি দাও তবে বাকী কটা দিন আয়েশার ঘরেই কাটাই।" বিবিরা সম্মতি জানালে নবী আলি ও আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে আয়েশার ঘরে গেলেন।

অসুস্থতার প্রথম ৭/৮ দিন তিনি দিনের কাজকর্ম যথারীতিই সম্পন্ন করেন। এর পর রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় এবং নবী প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে তাঁর কানে এল যে, অল্প বয়সী ওসামাকে সীরিয়া অভিযানের নেতা নির্বাচিত করার জন্য অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা আর গড়ানোর আগেই মিটমাট করে ফেলার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। এরপর নবী সাতটা মশকের জল দিয়ে ভাল করে স্নান করে মসজিদে গেলেন এবং সেখানে নামাজের ইমামতি করলেন। তারপর সবাইকে বললেন, আগের অভিযানের জন্য যায়েদ যেমন নেতা হিসাবে উপযুক্ত ছিল সেই রকম ওসামাও এই অভিযানের নেতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। কাজেই তোমরা সবাই ওসামার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে কারণ সে আমাদের পক্ষের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন।

তারপর সমবেত সকলকে উদ্দেশ করেই বললেন, "আল্লা তাঁর বান্দাদের মধ্যে একজনকে আদেশ করেছেন, "জীবন ও আল্লার সান্নিধ্য, এই দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নাও এবং সেই বান্দা আল্লার সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছে।" নবীর কথা শুনে আবু বকর কেঁদে ফেললেন। তাঁকে কাঁদতে মানা করে নবী আবার বললেন, "আমার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসায় যে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি হল আবু বকর। যদিও ইসলাম আমাদের সকলকে এক বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে, তবুও কেউ যদি তোমাদের মধ্যে থেকে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুকে বেছে নিতে বলে তাহলে তাঁকেই বেছে নিতে হবে। আজ সকলের উঠোনের দরজা বন্ধ থাকবে, শুধু আবু বকরের দরজা খোলা থাকবে।" এইভাবে নবী ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলেন। যে সব প্রথম শ্রেণীর নেতাদের বাড়ী মসজিদের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল, নবীর কথামত সেদিন সবাই তাদের সামনের দরজা বন্ধ করে দিল। শুধু আবু বকরের দরজা খোলা থাকল।

মসজিদ থেকে বিবি আয়েশার ঘরে যেতে যেতে বললেন,"মুহাজীররা, তোমরা দিন দিন তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চল। আনসারদের সংখ্যা বাড়বে না, তারা আজ যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। আনসারবা আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র কারণ তাদের অনুগ্রহের ফলেই আমি মদিনায় আশ্রয় পেয়েছিলাম। তোমরা সবাই তাদের জ্যেষ্ঠদের ও সম্মানিতদের সম্মান করবে।" সেইদিন রাত্রি থেকে অবস্থার অবনতি ঘটল। পরের দিন নামাজের সময় অজু করার জল চাইলেন। জল দেওয়া হল, কিন্তু উঠে যে অজু করবেন সেই শক্তিটুকুও শরীরে কুলালো না। তখন তিনি বিবি আয়েশাকে বললেন যে তাঁর বদলে আবু বকর যেন নামাজের ইমামতি করে। আয়েশা তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে নবী যাতে নিজেই গিয়ে ইমামতি করতে পারেন। নবী তখন রাগত ভাবেই বিবি আয়েশাকে বললেন, "সত্যি, তুমি ইউসুফের গল্পের দুষ্ট মেয়ে মানুষদের মতই ব্যবহার করতে শুরু করেছ।[১৯] যাও এখনই আমার ইচ্ছা সকলকে জানিয়ে দাও।" এই নিযুক্তির মধ্য দিয়েও নবী বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকরই হবেন উত্তরাধিকারী। নবীর ইচ্ছা মসজিদের সবাইকে জানানো সত্ত্বেও ওমর ইমামতি করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আল্লাহু আকবর ধ্বনি নবী ঘর থেকে শুনতে পেয়ে প্রায় অস্থির হয়ে পড়লেন,

---

(১৯) ইউসুফের (পূর্ববর্তী একজন নবী, বাইবেলের Joseph) চেহারা খুবই সুন্দর ছিল। কথিত আছে যে মেয়েরা তার কথা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যেত এবং তরকারি কাটার সময় হাত কেটে ফেলত।

বললেন, "না, না কেউ নয়। একমাত্র আবু বকর ছাড়া আর কেউ নয়।" নবীর ইচ্ছা আবার জাননোর পর আবু বকরই ইমামতি করলেন।

নবীর অসুস্থতা ইতিমধ্যে পনেরো দিন পার হয়ে গেছে। রবিউল আওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার (জুন ৬,৬৩২ খ্রীঃ) রাত্রে প্রবল বেগে জ্বর এল। জ্বরে গা পুড়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে সকালে ওমর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নবীর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "রসুলুল্লা, আপনার জ্বর তো খুব বেড়েছে।" নবী বললেন, "হ্যা, কিন্তু এই জ্বর নিয়েই আমি রাত্রে আল্লার উদ্দেশে ৭০টি সুরা আবৃত্তি করেছি যার মধ্যে ৭টা বড় সুরা ছিল।" সারাটা রবিবার একরকম ঘোরের মধ্যে কাটল। জুরফ্ থেকে ওসামা নবীকে দেখতে এল। নবী কোন কথা না বলে হাতটা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তার মাথায় রাখলেন। দুপুরবেলা জ্বর বাড়ল এবং নবী একটা নতুন উপসর্গের কথা জানালেন, বললেন যে শরীরের একপাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করছেন। বিবি উম্মে সালামা সবাইকে বললেন যে নবীকে একটু অষুধ খাইয়ে দেখলে হয়। বিবি মাইমুনার সৎ বোন আসমা আবিসিনীয়া হিজরৎ কালে একরকম আরক তৈরি করতে শেখেন যা সেখানকার লোকেরা কারও প্লুরিসি হলে খাওয়াত। আসমা সেই আরক তৈরি করে নবীকে না জানিয়ে তাঁকে খানিকটা খাইয়ে দিল। নবী রেগে গিয়ে তাদের বকাবকি করতে শুরু করলেন। নবীর যে-সব বিবিরা জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা তখন আবিসিনীয়ার গল্প ও সেখানকার খ্রীস্টান ও তাদের গীর্জার গল্প শুরু করলেন। নবীর কানে সেই কথা যেতে নবী রেগে গেলেন এবং খ্রীস্টানদের বকাবকি শুরু করলেন। বললেন, "এরা হল সেই সব লোক যারা তাদের কোন সাধু মারা গেলে তার কবরের উপর সমাধি তৈরি করে পূজা করে।" ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অভিসম্পাত করে বললেন, "আল্লা ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধ্বংস করুন। যারা মানুষের সমাধিকে পূজা করে তাদের উপর আল্লার ক্রোধ বর্ষিত হোক। হে আল্লা, আমার কবরকে কেউ যেন পূজা না করে। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম যেন আরবে না থাকে।" কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের দেশের মুসলমানরা তাদের দরবেশদের কবরে মাজার তৈরি করে এবং সেই মাজারকে পূজা করে কতখানি ইসলাম- বিরোধী কাজ করছেন।

এর পর নবী বিবি আয়েশাকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমার কাছে আমি যে সোনা রেখেছিলাম তা কোথায়?" আয়েশা বললেন যে তাঁর কাছেই আছে। আয়েশা তা বের করলেন এবং ছয়টি স্বর্ণমুদ্রা নবীকে দেখালেন। নবী বিশেষ কয়েকটা দরিদ্র পরিবারের নাম করে বললেন যে, এটা যেন তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

রবিবারের রাত্রিও খুবই অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে কাটল কিন্তু সোমবার (১৩ই রবিউল আওয়াল, (৮ই জুন) সকালে একটু ভাল বোধ করলেন। জ্বর এবং মাথাব্যথা, দুটোই অনেকটা কম মনে হল। ওদিকে ফজরের নামাজ শুরু হয়ে গেছে। আবু বকর ইমামতি করছেন। প্রথম রাকাত শেষ করে নামাজীরা সবে সিজদা থেকে মাথা তুলেছে, নবী সেখানে উপস্থিত হলেন। চাচা আব্বাসের ছেলে ফজল ও আর একজন চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি বিবি আয়েশার ঘর থেকে এতখানি হেঁটে এসেছেন। আস্তে আস্তে আবু বকরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে আবু বকর ও নামাজীরা একটু ইতঃস্তত করছিল। তিনি ইসারায় তাদের নামাজ চালিয়ে যেতে বললেন। নামাজশেষে খুৎবার সময় মিম্বারে আবু বকরের পাশে বসলেন। সব শেষ হলে আবু বকর বললেন,"রসুলুল্লা, আল্লার ইচ্ছায় আজ আপনাকে একটু ভাল দেখছি।" আবু বকর আরও বললেন যে, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যেই স্ত্রী মদিনার উপকণ্ঠে সুন্ নামক স্থানে থাকে, আজ তার পালা, তাই তাকে একটু পরেই সুন-এ যেতে হবে। নবী অনুমতি দিলে আবু বকর সুন'এ চলে গেলেন।

নবী তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিবি আয়েশার দরজার সামনে, মসজিদের উঠানের খোলা বাতাসে বসে থাকলেন। অনেকে তাঁর কাছে এসে সেলাম জানাল, কুশল জিজ্ঞাসা করল। ওসামা এসে সেলাম জানালে নবী তাকে অশীর্বাদ করলেন। আবু বকর সহ সকলেই সেদিন নবীর সুস্থতা দেখে খুশি হল, কিন্তু কেউই বুঝতে পারল না যে এটা প্রদীপ নিভে যাবার আগে দপ করে জ্বলে ওঠা মাত্র। কিছুক্ষণ বসার পরেই নবী অসম্ভব দুর্বলতা অনুভব করলেন এবং কোন মতে বিবি আয়েশার ঘরের সামনে গিয়েই মাটিতে বিছানো একটা গদির উপর শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবি আয়েশা এসে পাশে বসলেন এবং নবীর মাথাটা বালিশ থেকে তুলে নিজের কোলে রাখলেন। এমন সময় আয়েশার একভাই একটা দাঁতন হাতে করে সেখানে উপস্থিত হল। নবীকে সেই দাঁতনটার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে আয়েশা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ঐ দাঁতন দিয়ে কি তাঁর দাঁত মাজতে ইচ্ছে করছে। নবী সম্মতি জানালে বিবি আয়েশা নিজে সেটাকে চিবিয়ে ভাল করে থেঁতো করে নবীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। নবী দাঁতনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁত মাজলেন, তারপর ফেলে দিলেন। আস্তে আস্তে মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে নবী একটু জল চাইলেন এবং একটা কুঁজোয় করে জল এনে দেওয়া হল। নবী হাতে করে একটু জল নিয়ে সেই জল দিয়ে মুখ ধুলেন এবং প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লা, সনির্বন্ধ অনুরোধ এই দুঃসহ মৃত্যু যান্ত্রণা সহ্য করতে আমাকে সাহায্য করুন।" তারপর আস্তে আস্তে তিনবার বললেন, "জিব্রাইল, আমার কাছে আসুন।" কথিত আছে যে, নবী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন পর পর

তিনদিন জিব্রাইল তাঁর কাছে আসেন। প্রথম আসেন মৃত্যুর তিন দিন আগে এবং শেষবারের মত আসেন মৃত্যুর দিন। ঐ শেষদিন আরও দুজন ফেরেস্তা তাঁর সঙ্গে আসেন, যার মধ্যে একজন হলেন মৃত্যুর ফেরেস্তা মিকাইল এবং অন্যজন হলেন ইসমাইল। সৃষ্টির পর থেকে ইসমাইল এ পর্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বাতাসেই বসবাস করতেন। কোনদিন স্বর্গেও ওঠেননি আবার পৃথিবীতেও নামেননি। নবীর মৃত্যুর দিন তিনি ৭০,০০০ ফেরেস্তা সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং ৭০,০০০ ফেরেস্তার প্রত্যেকের সঙ্গে আরও ৭০,০০০ করে ফেরেস্তা ছিল।

মৃত্যুর দিন সর্বপ্রথম জিব্রাইল নবীর কাছে যেয়ে সংবাদ দেন যে মৃত্যুর ফেরেস্তা মিকাইলও (বাইবেলের মাইকেল) তাঁর সঙ্গে এসেছেন এবং তিনি নবীর কাছে আসার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে নবীর অনুমতি প্রার্থনা করছেন। এর আগে মিকাইল কোনদিন কোন ঘরে প্রবেশ করার জন্য কারও অনুমতি প্রার্থনা করেন নি এবং পরেও কোনদিন করবেন না। নবী অনুমতি দিলে মিকাইল নবীকে বললেন, "রসুলুল্লা, আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার আত্মা নিয়ে যাব, আর যদি রেখে যেতে বলেন তবে রেখে যাব।" এইসব কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ জিব্রাইল বলে উঠলেন, "হে আহম্মদ, আল্লা আপনার সঙ্গ লাভ করার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে আছেন।" নবী তখন মিকাইলকে বললেন, "তাহলে আপনার উপর যা আদেশ হয়েছে সেই অনুসারেই কাজ করুন।" জিব্রাইল তখন নবীকে বিদায় জানিয়ে বললেন, "হে আল্লার রসুল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই শেষবারের মত আমার পৃথিবীতে আসা, এখন থেকে পৃথিবীর কোন ব্যাপারে আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না।" এই বলে জিব্রাইল বিদায় নিলেন এবং নবী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় স্বরে কান্নার রোল উঠল, "হে এই ঘরের বাসিন্দা আপনার উপর আল্লার করুণা, অশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক,"। স্বর্গীয় কান্নার এই বাণী শোনা যাচ্ছিল কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিল না।

অপার্থিব দিক থেকে পার্থিব দিকে চোখ ফেরালে নবীর মৃত্যুকালে যা ঘটেছিল তা হল, প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় প্রলাপ বকতে বকতে নবী নিজেকে মৃদুভাবে (খুব সম্ভবত মাথায়) আঘাত করতে থাকলেন। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার জন্য বেশীক্ষণ পারলেন না। তখন বিবি আয়েশা ঐ রকম মৃদুভাবে নবীকে আঘাত করতে এবং নবীর আরোগ্য কামনা করে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন। নবীর শরীরে তখন আর বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। বিবি আয়েশা নবীর মাথা তাঁর বুকে জাপটে ধরে থাকলেন। নবী মৃদুস্বরে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন— "আল্লা, ক্ষমা করুন।" ....শাশ্বত স্বর্গ।" ....."ক্ষমা।" ......"অশীর্বাদপুষ্ট স্বর্গীয় সঙ্গ।" এই বলতে বলতে শরীর ও হাত-পা একটু টান করার চেষ্টা

করলেন। তারপরই সব স্থির হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধরে থাকা নবীর মাথা বিবি আয়েশার কাছে ভারী মনে হল। আল্লার রসুল এই ধরাধাম ছেড়ে চলে গেলেন। বিবি আয়েশা বলেছেন, "আল্লার রসুল আমার পালার দিন, আমার ঘরে আমার বুকে মারা গেছেন এবং অন্তিম সময় তাঁর লালা ও আমার লালা মেশামিশি হয়ে গিয়েছিল (বুখারী-১৬৫০)।

বিবি আয়েশা আস্তে করে নবীর মাথা বুকের থেকে নামিয়ে বালিশের উপর রাখলেন। অন্যান্য মহিলারা তখন কান্না জুড়ে দিয়েছিল এবং তিনিও তাদের কান্নায় যোগ দিলেন। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। রবি উল আওয়ল মাসের ১৩ তারিখে, হিজরীর ১৩তম বছরে (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রীঃ) নবীর দেহান্ত হল।

নবীর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা

কিছুক্ষণের মধ্যেই নবীর মৃত্যুসংবাদ সারা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল। অচিরেই তা সুন্এ অবস্থানরত আবু বকরের কানে পৌছালো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়ায় চড়ে মদিনা রওনা হলেন। খবর পেয়ে ওমর আয়েশার ঘরে এলেন এবং ঢাকা দেওয়া চাদরটা তুলে মৃত নবীকে দেখে বলে উঠলেন যে, নবী মারা যাননি, মূর্ছা গিয়েছেন মাত্র। তিনি বললেন, "প্রত্যেকটি কাফের ও কপটের মূলোচ্ছেদ না করে নবী মরতে পারেন না। যে সব লোক ইতিমধ্যে মসজিদে জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে ওমরের কথা কিছুটা বিশ্বাস করল কারণ কিছুক্ষণ আগেই নবী তাদের নামাজের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর এসে উপস্থিত হলেন। আয়েশার ঘরে ঢুকে নবীর কপালে চুমু খেলেন, বললেন, "জীবনেও আপনি সুন্দর ছিলেন, মরণেও আপনি সুন্দর।" এর পর আবু বকর নবীর মাথাটা একটু তুলতে চেষ্টা করে বুঝতে পারলেন ইতিমধ্যে ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং নবীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন।

মুসলমান বাহিনী তখন জুরফে অবস্থান করছিল এবং ওসামা ঘোড়ায় চড়ে সবেমাত্র এগিয়ে যাবার আদেশ দেবেন এমন সময় একজন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিল যে, নবী মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাহিনী মদিনার দিকে দৌড় মারল। ইতিমধ্যে আর একজন দূত দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ওমর ও আবু বকরকে জানাল যে মদিনার সব দলপতিরা একটা হলঘরে মিলিত হয়ে সাদ বিন উবাইদাকে মদিনার শাসনকর্তা নির্বাচিত করতে চলেছে। সভার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং শাসনকর্তা হিসাবে সাদ-এর নাম প্রস্তাব করা হয়ে গেছে। এমন সময় আবু বকর ওমরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। উপস্থিত

সকলকে উদ্দেশ করে আবু বকর বলতে শুরু করলেন, "মদিনাবাসিগণ, তোমরা হলে উজীর আর আমরা হলাম আমীর। বংশমর্যাদায় আমরা হলাম সমগ্র আরবের মধ্যে সব থেকে উপরে। কাজেই তোমরা এই দু'জনের মধ্যে (আঙুল দিয়ে ওমর ও সাদকে দেখিয়ে) কাকে তোমরা তোমাদের প্রধান হিসাবে চাও।" এই কথার পর ওমর বাধা দিয়ে বললেন, "না, নবী আপনাকেই নামাজের ইমামতি করতে বলে গেছেন। কাজেই আপনিই আমাদের নেতা। আপনিই ছিলেন নবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র।" এই বলে ওমর এমন আন্তরিক ভাবে আবু বকরের হাত চেপে ধরলেন যে আর কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। বিরোধী পক্ষও চুপ হয়ে গেল এবং আবু বকর খলিফা (উত্তরাধিকারী) নির্বাচিত হলেন।

এদিকে বিবি আয়েশার ঘরে আলি, ফজল, ওসামা ও অন্যান্য চাকর- বাকরেরা মিলে নবীর দেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে ঐ সময় এক দৈববাণী শোনা যায় যা নবীর দেহকে নগ্ন করতে নিষেধ করে। উপরন্তু সেই দৈববাণী এও বলে যে, কেউ নবীর নগ্নতা দেখলে তার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হবে। পরদিন সকালে আবু বকর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, "এখন আমি তোমাদের প্রধান হয়েছি, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ন্যায় করি তবে তোমরা আমাকে সমর্থন করবে, আর যদি ভুল করি তবে ঠিক পথে নিয়ে আসবে। ....আমি আল্লা ও তাঁর রসুলকে অনুসরণ করবো এবং তোমরাও তাই আমাকে মান্য করবে। যদি কখনও আমি তাঁদের অমান্য করি তবে তোমরাও আমাকে মান্য করতে বাধ্য থাকবে না।" যেহেতু ফতেমা আলির স্ত্রী, তাই তিনি মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন যে নবীর মৃত্যুর পরে আলিই খলিফা হবেন। তাই আবু বকর খলিফা হওয়াতে তাঁর আশাভঙ্গ হয় এবং শোনা যায় যে, মারা যাবার আগে পর্যন্ত ফতেমা আবু বকরের অধীনতা মেনে নেননি।

ঐ দিন, অর্থাৎ ১৪ই রবি. এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে নবীর লাশ কোথায় সমাধিস্ত করা হবে। অনেকে বলল যে, যেই মিম্বারে বসে নবী খুৎবা দিতেন সেখানেই কবরস্থ করা উচিত। অনেকে মত দিল যে, যেখানে দাঁড়িয়ে তাদের প্রিয় নবী নামাজের ইমামতি করতেন সেখানে কবর দেওয়াই ঠিক কাজ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, যেখানে নবী দেহ রেখেছেন সেখানেই কবরস্থ করা উচিত হবে। কাজেই বিবি আয়েশার ঘরে যেখানে নবীর লাশ শায়িত ছিল সেখানেই কবর খোঁড়া হবে ঠিক হল। দুজন লোককে কবর খোঁড়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, একজন মক্কার অন্যজন মদিনার। মদিনার লোক আগে আসার ফলে মদিনার ঢঙে কবর খোঁড়া হল এবং সেই কারণে আজও সমস্ত মুসলীম জগৎ মদিনার ঢঙেই কবর খুঁড়ে থাকে।

ইতিমধ্যে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে। লাল রঙের যে আঙরাখাটা নবী পরতেন, সেটা প্রথমে কবরে পাতা হল। তারপর নবীর দেহ আস্তে আস্তে নামিয়ে তার উপর শুইয়ে দেওয়া হল। চারপাশে ও উপরে কাঁচা ইট সাজিয়ে কবরের Vault তৈরি করা হল। তারপর মাটি দিয়ে কবর ভর্তি করে দেওয়া হল। বিবি আয়েশা ঐ ঘরেই বাস করতে থাকলেন। কিছুদিন পরে একটা বেড়া দিয়ে তাঁর ঘর ও নবীর কবরস্থান আলাদা করে দেওয়া হল। এর পর আবু বকর মারা গেলে তাঁকেও নবীর পাশেই কবরস্থ করা হয়।

মহানবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মহানবীর শরীর সাধারণের থেকে সামান্য লম্বা ছিল। তাঁর চেহারার মধ্যে একটা মর্যাদার ভাব ফুটে উঠতো এবং একজন অপরিচিতের মনেও তা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলত। তাঁর কালো চোখ দুটি ছিল সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর প্রভাববিস্তারকারী মুখমণ্ডল প্রথম দর্শনেই আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। তাঁর অনুগামীদের মতে তিনি ছিলেন সমস্ত আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সুপুরুষ ও সদাশয় ব্যক্তি। কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে তাঁর চোখের দৃষ্টিতেই যে-কোন লোক ভীত হয়ে পড়ত। বয়স হলে তাঁর সুঠাম দেহ সামনে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। তাঁর দাঁত ছিল মুক্তার মত এবং সামনের দুটো দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। তাঁর হাঁটা-চলার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাড়াতাড়ির সময় তাঁর সঙ্গে হাঁটায় কেউ পেরে উঠত না। হাঁটার সময় তিনি কখনও পিছন ফিরে দেখতেন না, এমন কি কাঁটাগাছে জামা আটকে গেলেও না। উঁচু পাহাড় থেকে নামার সময় মানুষ যেমন হাঁটে তিনি ঠিক সেইভাবে হাঁটতেন। কোন কাজ শুরু করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি থামতেন না। কারো সাথে হাত মেলানোর বা করমর্দন করার সময় তিনি নিজে কখনও আগে হাত ছাড়িয়ে নিতেন না। ঠিক তেমনি কারো সাথে কথোপকথন কালে আগে তা বন্ধ করতেন না বা বিদায় নিতেন না।

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল। তিনি নিজের কাজ নিজে করে নিতেই ভালবাসতেন। বাড়ীতে গৃহকাজে তিনি স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। সাধারণত সূতীর সাদা জামাকাপড়ই তিনি বেশি ব্যবহার করতেন। খাবার সময় তিনি শুধু আঙুল দিয়ে খেতেন এবং খাওয়া শেষ হলে তা চেটে পরিষ্কার করে ফেলতেন। তিনি মিষ্টি বিশেষ করে মধু খেতে ভালবাসতেন। কুমড়োর তরকারি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। শশা ও তাজা খেজুর পছন্দ করতেন। জলে ভেজানো খেজুর ও রান্না করা খাবার তিনি একই সঙ্গে খেয়ে ফেলতেন। পিঁয়াজ ও রসুন দেওয়া খাবার নবী পছন্দ করতেন না, বলতেন যে জিব্রাইল পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ভালবাসেন না। বাদাম

(Almond)-এর ময়দা দিয়ে তৈরি খাবার তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন যে, তা হল অপব্যয়ীদের খাদ্য। বড় গো-সাপের মাংস তিনি গ্রহণ করতেন না কারণ তিনি মনে করতেন যে আল্লার অভিশাপে ইহুদীরা গোসাপে পরিণত হয়েছে। দুধ খেতে তিনি পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে দুধই হল একমাত্র খাদ্য যাতে পান ও আহার দু কাজই হয়। তিনটি জিনিস নবীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, ভাল খাবার, সুগন্ধি ও নারী।

আগেই বলা হয়েছে যে নবী সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন। মদিনায় মসজিদের সংলগ্ন স্থানে তাঁর পত্নীদের জন্য যে সারি সারি কুঁড়েঘর তৈরি করা হয় তাতেই তিনি পালা করে বাস করতেন। চারটি ঘরের দেওয়াল কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি ছিল আর উপরে ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। ঘরের চালা এত নিচু ছিল যে হাতদিয়ে তা ছোঁয়া যেত। কাপড় কিংবা চামড়ার পর্দা দিয়ে দরজা-জানালার কাজ চালনো হত। একমাত্র বিবি আয়েশার ঘরের দরজাই কাঠের তৈরি ছিল। বিবিদের কুঁড়েঘরগুলো খেজুরপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বাকী ঘরগুলির দেয়াল খেজুর পাতার বেড়ার উপর কাদা মাটি-মাখিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। নবী নতুন কোন পত্নী গ্রহণ করলে ঐ সারিতেই আর একখানা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে নেওয়া হত। হিজরীর ১০০ বছরে ওমর বিন আব্দুল আজিজ যখন মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন এই ঘরগুলি ভেঙে ফেলা হয়।

যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় নবীর সঙ্গে দেখা করতে পারত। তাই বলা হত যে, নদী থেকে যেমন যখন খুশি জল নেওয়া যায়, নবীর সঙ্গে দেখা করাও সেইরকম সহজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব বজায় রাখতেন। নবীকে সব সময় একটু নীচু স্বরে সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করতে হবে, এটাই রীতি ছিল। নবী স্পষ্ট ও পরিষ্কার উচ্চারণে কথা বলতেন এবং একবার যা বলতেন তার বিশেষ নড়চড় হতো না। তাঁর কথাই ছিল আইন। মদিনায় যখন বিভিন্ন দলপতির আসাযাওয়া শুরু হল নবী তখন তাদের সযত্নে আপ্যায়ন করতেন। এইসব কাজে অভিজ্ঞ শাসনকর্তার মতই ব্যবহার করতেন। অনুচরদের মধ্যে একান্ত তুচ্ছ ব্যক্তির সঙ্গেও তিনি সৌজন্য ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে বিনয়, কারুণ্য, ধৈর্য, স্বার্থহীনতা ও বদান্যতা এত বেশি থাকত যে আশেপাশের লোকেরা মুগ্ধ হত। কেউ তাঁকে কোন অনুরোধ করলে বা কিছু চাইলে তিনি না বলতে পারতেন না। যেখানে কোনমতেই হ্যাঁ বলা সম্ভব নয় সেখানে চুপ থাকতেন। কোন কারণে বিরক্ত হলে কোন কথা বলতেন না কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতো। কোন তুচ্ছ ব্যক্তিও তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি কখনই না বলতেন না। খুব সামান্য কারণেই লজ্জিত হতেন। আয়েশা বলতেন যে, তিনি

একজন কুমারী মেয়ের থেকেও বেশি লাজুক ছিলেন। শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন সদয় ও উদার।

বন্ধু হিসাবে নবী ছিলেন বিশ্বাসী ও উদার। আবু বকরকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতই ভালবাসতেন। আলির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল পিতার মত। খাদিজার ক্রীতদাস যায়েদকে তিনি এতখানি স্নেহ করতেন যে, সে তার নিজের বাবা-কাকার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে। যায়েদের ছেলে ওসামাকেও তিনি যায়েদের মতই স্নেহ করতেন। ওসমান ও ওমরের প্রতিও তাঁর অগাধ স্নেহ ও ভালবাসা ছিল।

তবে উপরিউক্ত সৎগুণগুলির বেশিরভাগই তাঁর অনুচর, গুণগ্রাহী ও ব্যাপক অর্থে তাঁর প্রচারিত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। বিধর্মী কাফের ও তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর ও ক্ষমাহীন ঘাতক। নবী শিশুদের প্রতি সদয় ও উদার ছিলেন বলতে প্রধানত মুসলমান শিশু বুঝতে হবে। কারণ কুরাইজা শিশুদের তিনি তাদের মায়ের সাথে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। বিধর্মী হলেও নবী জাতিগত (ethnic) দিক থেকে আরবদের প্রতি অতটা নির্মম ছিলেন না। তাই হুনাইনের যুদ্ধে বহু বিধর্মী আরব বন্দীকে তিনি মুক্ত করে দেন। কিন্তু ইহুদীরা জাতিগত দিক থেকে ইস্রাইলাইট এবং তদুপরি বিধর্মী হবার জন্য তাদের প্রতি নবীর ঘৃণা ও ক্রোধ ছিল অপরিসীম। তিনি কানুইকা ও নজিরদের মদিনা থেকে সমূলে উৎখাৎ করলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর তৃপ্তি হল না। যেই খয়বরে গিয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল সেই খয়বরে গিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করলেন। কিনানার উপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল অপরিসীম ঘৃণা না থাকলে কারও উপর ঐরকম নির্যাতন চালানো কখনই সম্ভব নয়। জনাব আব্দুল আজিজ আল আমান সাহেব তাঁর "কাবার পথে" গ্রন্থে নবীর জীবনের সমস্ত অধ্যায়গুলোই বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনিও নিরস্ত্র ৮০০ কুরাইজার ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং এই ঘটনাকে ইসলামের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম জীবনে নবী বিশ্বাসী (আল আমীন) খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা, বিশেষ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে, আর রাখতে পারেননি। তিনি বলতেন, "যুদ্ধ আর কিছুই নয়, প্রবঞ্চনার খেলা মাত্র।" অবশ্য তাঁর এই শঠতাকে আল্লা সর্বদা সমর্থন করে গেছেন। রজব ও রমজান মাসে যুদ্ধ ও লুঠ এর প্রধান উদাহরণ। নাখলায় নবীর অনুচরেরাই প্রথম শঠতার আশ্রয় নিয়ে রজব মাসে রক্তপাত ঘটায়।

নবীর গার্হস্থ্য জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে যৌবনে তিনি মোটামুটি

নিষ্পাপ ও ধার্মিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিয়ে করে বাকী ২৫ বছর একা তাঁকে নিয়েই ঘর করেছেন। বিবি খাদিজা মারা গেলে ৫০ বছর বয়সে বিবি সৌদাকে বিবাহ করলেন, কিন্তু ৫৪ বছর বয়সে বিবি আয়েশাকে বিবাহ করে বহুবিবাহের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। এর পর থেকেই তাঁর পত্নীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকল। ৫৬ বছর বয়সে হাফসাকে বিবাহ করলেন এবং পরের বছর ৫৭ বছর বয়সে ১ মাসের ব্যবধানে জয়নব বিন্ত খোজাইমা ও বিবি উম্মে সালামাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir লিখছেন, "Once the natural limits of restraint were overpassed, Mohammad fell a prey to his strong passion of sex." (op cit-p-515)। এরপর ঐ বছরই, জয়নব ও উম্মে সালামাকে নিকাহ্ করার কয়েক মাস পরেই, তিনি তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ'এর স্ত্রী জয়নবের প্রতি আসক্ত হলেন এবং বিবাহ করলেন। ঐ বছরই মুস্তালেক অভিযানের সময় তিনি জয়েরিয়াকে বিবাহ করলেন। এর পর হিজরীর সপ্তম বছরে, ৬০ বছর বয়সে উম্মে হাবিবা, সফিয়া ও মাইমুনাকে বিবাহ করেন এবং মিশরীয় ক্রীতদাসী মারিয়াকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন। এই কারণে আল আব্বাস বলেন, "নারীর প্রতি আসক্তিতে যিনি সকলের আগে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান (অর্থাৎ নবী মহম্মদ)" (op Cit, pp-515)। অচিরেই নবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসমানদের মধ্যে হারেম তৈরি করার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এই ব্যাপারে Sir W. Muir আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন তা হল, নবী যতদিন এক-পত্নী খাদিজাকে নিয়ে সংসার করেছেন ততদিন জান্নাত সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াৎ অবতীর্ণ হয় তাতে নারী হিসাবে স্বর্গীয় হুরীদেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নবী যখন বহু-পত্নীতে তাঁর হারেম পরিপূর্ণ করলেন, তখন সেই হুরীরা বৈধ পত্নীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে অনেক দেবদেবী ছিল কিন্তু মানুষ সব এক ছিল। কিন্তু ইসলামের ফলে অনেক দেবদেবীর স্থানে এক আল্লা হল কিন্তু মানুষ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী অথবা মুসলমান এবং অ-মুসলমান। নবী তাঁর জীবিতকালে, বিশেষ করে ইহুদীদের প্রতি নির্যাতনের মধ্য দিয়ে, অন্য ধর্মের প্রতি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও বিতাড়নের পথ দেখিয়ে গেছেন তা আজও সমানে চলছে। সেই ধারা অনুসরণ করেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ধারা অনুসরণ করার ফলেই কাশ্মীর থেকে হিন্দু কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাস্তুচ্যুত হয়ে জম্মুতে তাঁবুর মধ্যে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছে। কিন্তু নবী যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন ইসলামের মধ্যে এই অ-সহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়নি। নবীর মদিনা আসার পর থেকেই

এর উৎপত্তি হতে শুরু করে ও পরিণতি লাভ করে। তাই Sir W. Muir লিখছেন, "In its final evolution, Islam left far behind the toleration of early days when the men of Mecca were told that, there should be no force in religion' but that conscience alone must rule" (ibid, p-52) ।

আগেক্ষার বহু দেবদেবীর ধর্মকে পরিত্যাগ করে এবং ইসলামের একেশ্বর আল্লার ভজনার মধ্য দিয়ে ইসলাম আরব জাতিকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কতখানি উন্নত করতে পেরেছে বলা শক্ত। কিন্তু নবী প্রদর্শিত জিহাদ বা লুঠপাটের মধ্যে দিয়ে আরব জাতি পরবর্তীকালে যে যথেষ্ট বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অনেক দেশ জয় করে, সেখানে লুঠপাট চালিয়ে তারা অনেক সম্পদশালী হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নবী তাদের মধ্যে নৈতিক উন্নতির কোন আদর্শ রেখে না যাবার দরুন আজও তারা একটি অশিক্ষিত, অনুন্নত ও ধর্মান্ধ জাতি হিসাবেই পড়ে আছে। নবী মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তার প্রভুত্ব নিশ্ছিদ্র করার উপর জোর দিয়ে গেছেন এবং সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজ মুসলমান সমাজ মানুষের গুণগত দিকে নজর না দিয়ে শুধু সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নবী প্রবর্তিত কঠোর বিধিনিষেধ প্রচলন করে এবং সমালোচনাকে হত্যা করে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনুসরণ করার ফলেই আজকের মুসলমান সমাজে বাক স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তব্ধ করে রেখে শুধু অনুশাসনকে অনুসরণ করার, অন্যথায় জীবননাশের আশঙ্কা করার মধ্য দিয়ে যে মুসলমান সমাজ আজ চলছে, নবীই তার প্রবর্তন করে গেছেন। নবী প্রবর্তিত প্রথার ফলে হয়তো তাঁর হারেম সুরক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তার ফলশ্রুতি হিসাবে আজকের মুসলমান নারীসমাজ একটা অশিক্ষিত সন্তান জন্ম দেবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কাজেই নবী প্রবর্তিত উপরিউক্ত অনুশাসনগুলো মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগেই ধরে রাখতে চাইছে, সভ্যতায় অগ্রসর হবার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। তাই Sir W. Muir লিখছেন, "The sword of Mohammad, and the Koran, are the most stubborn enemies of Civilisation, Liberty, and Truth which the world has yet known." (ibid p-522) । কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন হল, সমস্ত মুসলমান সমাজ সভ্যতার আলোক পেলে, শিক্ষার আলোক পেলে ইসলাম কি টিকে থাকতে পারবে?

নবীর পত্নীদের তালিকা ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	পত্নীর নাম	বিবাহের সাল	বিবাহের সময় নবীর বয়স (বছর)	বিবাহের সময় পত্নীর বয়স (বছর)	মৃত্যুর সাল	মৃত্যুর বয়স (বছর)	সহবাসের দৈর্ঘ্য (বছর)	বর্ণিত হাদিশ সংখ্যা
১	খাদিজা (বিধবা)	৫৯৫ খ্রীঃ	২৫	৪০	৬২০ খ্রীঃ	৬৫	২৫	০
২	সৌদা (বিধবা)	৬২১ খ্রীঃ	৫০	৫০	৩৩ হিঃ	৭২	১৪	৫
৩	আয়েশা (কুমারী)	১ হিঃ	[illegible]	[illegible]	৫৭/৫৮ "	৬৬/৬৭	৯	১২১০
৪	হাফসা বিন্ত ওমর (বিধবা)	৩ হিঃ	৫৬	১৮/২২	৪৫ হিঃ	৬৩	৮	৬০
৫	জয়নব বিন্ত খোজাইমা (বিধবা)	৩ হিঃ	৫৬	৩০	৩হিঃ	৩০	১/৪	০
৬	উম্মে সালামা প্রকৃত নাম হিন্দ বিন্ত খুজাইফা (বিধবা)	৪ হিঃ	৫৭	২৯	৬১হিঃ	৮৪	৭	৩৭৮
৭	জয়নব বিন্ত জাশ (তালাক প্রাপ্তা)	৫ হিঃ	৫৮	৩৫	২০হিঃ	৫৩	৬	১১
৮	জয়েরিয়া বিনত হাবিস (ক্রীতদাসী)	৫ হিঃ	৫৮	২০	৫০ হিঃ	৬৫	৬	নগণ্য
৯	উম্মে হাবিবা প্রকৃত নাম রমলা বিন্ত আবু সাফিয়ান (বিধবা)	৭ হিঃ	৬০	৩৫	৪৪ হিঃ	৭২	৬	৬৫
১০	সাফিয় বিন্ত হুজায়া (বিধবা)	৭ হিঃ	৬০	১৭	৫০ হিঃ	৬০	৩	নগণ্য
১১	মাইমুনা বিন্ত হাবিস (বিধবা)	৭ হিঃ	৬০	৩৬	৫১ হিঃ	৮০	৩	৪৬
১২	মারিয়া মিশরীয় (ক্রীতদাসী)	৭ হিঃ	৬০	২০	—	—	—	—

(উৎস : Mohammad Encyclopaedia, Seerah Foundation, London, Vol-II, P-206)

(উৎস : The Life of Mahomet, Sir W. Muir, Voice of India, New Delhi, P-CX)

বিষয় সূচী

Muslim Magazine upholds Author's View

Indo-pak Friendship : Muslims' Psyche is Responsible

Dr. R. Brahmachari

I appreciate the noble efforts of the organisers of the "Pakistan-India People's Forum for peace and democracy (PIPFPD)" for holding its two-day convention on November 21-22, 1998, in Peshwar, Pakistan. There is no doubt that every peace-loving citizen of India and Pakistan would hail their endeavour to establish peace and amity between the people of these two neighbouring countries.The address of Mr. I.A. Rahaman, Chairman of the Pakistan chapter of the forum, on this occasion urging the two governments to put an end to further conduct of nuclear tests and consequent nuclear arms race, is also extreamly praiseworthy (Islamic Voice, Jan. 1999).

But I would like to draw your attention to the dark and gloomy side of the affair. The November 30, 1998 edition of time carries interviews with the Indian defence minister George Fernandes and the Pakistan nuclear scientist Abdul Quadeer Khan, which are worthmentioning in the present context. While commenting on the present Indo-Pak relation, Fernandes said, "I look at a Pakistani as the flesh of our flesh and the blood of our blood. We are two different nations but one people". But in his reply to a simillar question. Abdul Qadeer Khan said, "There are some similarities. But we are basically different. We are Muslims and they are Hindus. We eat cows. They worship cows. That we lived on the same land and spoke the same language does not make us the same people." While the comment of Fernandes reflects an attitude of tolerence, love and unification, frienship and peace, that of Khan reflects extreamly harmful, sinister and secessionist Muslim psycho-profile. The above comment of Abdul Quadeer Khan also shows to what extent the faith in Islam can distort the thought process of even a highly educated scientist like him.

There is no doubt that this secessionist Muslim mindset has given birth to the "Two Nation Theory" that culminated in the division of this great ancient country into three pieces through fratricidal blood-bath and the bitterness thus generated is now proceeding towards a nuclear conclusion. And the history of the forth-coming days will have no other alternative than to accuse the said secessionist Islamist tendency for all these grave consequences. So it appears that, unless the Pakistanis mend their thought process, all the noble efforts of PIPFPD is destined to be confined to rhetoric alone without yielding anything in practice. So long as the doctrine of hatred continues to guide the people of Pakistan, a real friendship and amity between the people of these two nations would remain a mirage. That is the reason for which the Pakistani delegate Dr. Abdul Karimn Naik quoted Upanishad and said that, only the message of the Upanishads are capable of removing discriminations among the human race created on the basis of religion and nationality. Only Upanishads consider the entire humanity as a family and every person living in this world as a member of the world family.

In this present context, it would be relevent to quote what the Pakistani Journalist Zafar Adeen says in this regard. He writes, "We have never been able to understand that, if 50 years were not sufficient to make Pakistan fit for receving a perfect Islamic system, then where was the need to create it all? If the Islamic system cannot be enforced, then why not we go back to the original system, the united India? There is still a heart-warming and soul-stirring call coming from across the borders devoid of any sectarian heat. The great land of India is a wonderful gift of God, made fertile and creatrive by nature in every respect. It is a cradle of a variety of religious and beliefs and a shinning example of unity in deversity which our Mumalkat-e-Khudad lacks" (organiser : 18.1.98). A real frienship and amity between the people of Pakistan and India would be establish only when the people of Pakistan gather under the banner of Zafar Adeem.

(The author is the Professor, Dept. of Applied Physics, University of Calcutta)

(Islamic voice, (Bangalore), March, 1999.)